FUAD

হরর কাহিনী

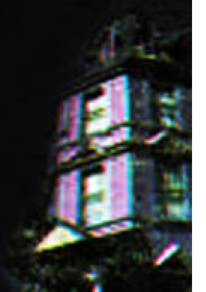
নরসিংহপুরের পিশাচ

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত



ANIK





হরর কাহিনী

নরসিংহপুরের পিশাচ

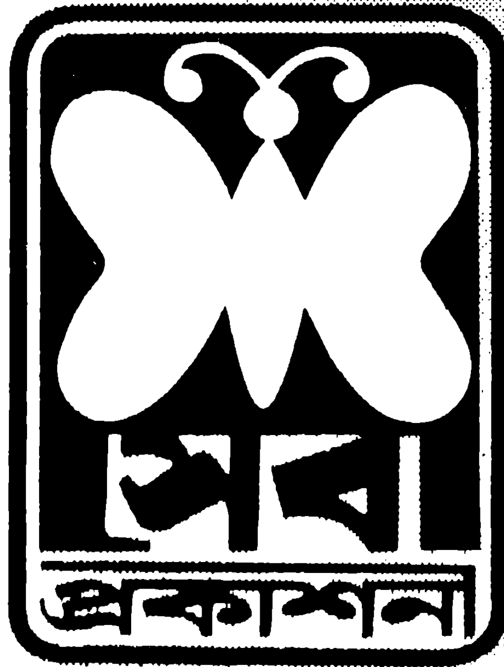
অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

পাঠক, কী ধরনের হরর গল্প আপনার পছন্দ?
অনুবাদ নাকি মৌলিক? গা ছমছমে ভৌতিক কাহিনী
অথবা কলজে চমকে দেওয়া পিশাচ গল্প?
সেবা ও রহস্যপত্রিকার শক্তিশালি কয়েকজন লেখকের
সব রকম স্বাদের, সব ধরনের গল্প পাবেন এ বইতে।
বইটি সম্পর্কে সম্পাদক বলছেন, 'পঞ্চাশটিরও বেশি গল্প
থেকে চালাই-বাছাই করে শেষতক এই ক' টি হরর কাহিনী
এ সংকলনের জন্য নির্বাচন করেছি। পড়ার সময় গল্পগুলো
আমাকে শিহরিত, রোমাঞ্চিত এবং আতঙ্কিত করে তুলেছিল
সম্পাদকের অনুভূতির অংশীদার হতে চাইলে বইটি নিয়ে বসে
যান—প্রবেশ করুন ভয় ও আতঙ্কের দুঃস্বপ্ন-রাজ্যে।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



চল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-0227-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

NARASHINGHAPURER PISHACH
Horror Stories
Edited by: Anish Das Apu

টিংকু ভাইকে

যাঁর অনুপ্রেরণা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া
এ বই সম্পাদনা করা সম্ভব হত না।

সূচি

ভূমিকা

সেবা'র সুলেখক ও রহস্যপত্রিকার সহকারী সম্পাদক কাজী শাহনূর হোসেন হরর ও পিশাচ কাহিনী পড়তে খুব পছন্দ করেন। আর এ বিষয়টির প্রতি আমার আগ্রহ কৈশোর থেকে। ফলে কাজী শাহনূরের সাথে বৈকালিক আড্ডায় মেতে উঠলে আলোচনার সিংহভাগ সময় দখল করে নেয় সাহিত্যের এ দিকটি সেদিন কী একটা কাজে রহস্যপত্রিকা অফিসে গেছি, শাহনূর একটা প্রস্তাব দিয়ে বসলেন আমাকে–১৯৮৪ থেকে (রহস্যপত্রিকার নব জন্মলগ্ন) ২০০৫ পর্যন্ত রহস্যপত্রিকায় যে সব লেখকের হরর ও পিশাচ কাহিনী ছাপা হয়েছে, সে সব থেকে বাছাই করে দু'টি বই প্রকাশ করলে কেমন হয়?

আমার মত হরর পিপাসু পাঠক ও লেখকের জন্য এরচেয়ে লোভনীয় প্রস্তাব আর হতে পারে না। রাজি হয়ে গেলাম সাথে সাথে শাহনূর জনান্তিকে জানালেন, সেবার এক স্বনামধন্য হরর লেখককেও তিনি নাকি প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন–দু'জনে মিলে কাজ করব। কিন্তু খাটাখাটনির ভয়ে তিনি সভয়ে পিছিয়ে গেছেন আমি মৃদু হাসলাম শুধু, কোনও মন্তব্য করলাম না। তারপর বিপুল উৎসাহে নেমে পড়লাম কাজে এবং আমার মুখের হাসি শুকিয়ে যেতে সময় লাগল না।

কাজী শাহনূর গল্প বাছাইয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন আমাকে। সিদ্ধান্ত নিলাম প্রথমে হরর গল্প সংকলনের জন্য গল্প বাছাই করব। এবং কাজটা যে কত দুরূহ হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। অপর হরর লেখক বুদ্ধিমান তাই আগেভাগেই সটকেছেন আমার ঘাম ছুটে গেল মনের মত হরর গল্প বাছাই করতে

ধারণা ছিল, রহস্যপত্রিকায় শুরু থেকেই হরর গল্পের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন লেখকরা। মাথায় বাজ পড়ল আশির দশকের রহস্যপত্রিকায়

পছন্দের তেমন গল্প খুঁজে না পেয়ে। দু'একটি যে একেবারে পছন্দ হয়নি তা নয়, কিন্তু কলেবর এত বড় যে ওই সাইজের দু'টো গল্প ডাবলেট বইটার অর্ধেকটা খেয়ে ফেলবে।

ক্রমে পছন্দের গল্প পেতে থাকলাম নব্বই দশকের পত্রিকাগুলো ঘেঁটে ২০০৫ সালের জুন পর্যন্ত এসে ঠেকলাম ইতিমধ্যে পঞ্চাশটিরও বেশি হরর গল্প পড়ে ফেলেছি আমি এরপর শুরু হলো সবচেয়ে কঠিন কাজ–এতগুলো গল্প থেকে ১৪টি সেরা গল্প বাছাই। অনেক ভেবেচিন্তে যে গল্পগুলো আমাকে আক্ষরিক অর্থেই আতঙ্কিত, শিহরিত ও রোমাঞ্চিত করে তুলেছে সেগুলোর ক্যাটাগরি ভাগ করলাম A+, A ও B+ হিসাবে পঞ্চাশটি থেকে বাদ গেল ত্রিশটি। চূড়ান্ত বাছাই পর্বে টিকল শুধু A+ আর A মার্কস পাওয়া গল্পগুলো। গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি নজর রেখেছি পাঠকের ভাললাগা, মন্দলাগার উপরে। আমি পরিচিত, অপরিচিত লেখকের দিকে তাকাইনি। এখানে সেসব গল্পই স্থান পেয়েছে যা পাঠকদের সত্যিকারের হরর গল্পের স্বাদ দেবে। তাহমিনা আখতারি খানমের 'চোর' পড়ে আমি আক্ষরিক অর্থেই স্তম্ভিত! কী চমৎকার ভাষা আর জমজমাট গল্পের বাঁধুনি। আফসোস, এই লেখিকা আর রহস্যপত্রিকায় লিখলেন না! একই বিশেষণে ভূষিত হওয়ার যোগ্য 'দূরের বাঁশি'র লেখক জাহিদুল সাঈদ। দারুণ একটি হরর গল্প এটি। 'চোর'-এর মত এ গল্পের শেষেও রয়েছে দুর্দান্ত চমক। যেমন ভয় ধরানো চমকের সৃষ্টি করেছেন টাইটেল গল্প 'নরসিংহপুরের পিশাচ'-এর লেখক এহসান চৌধুরী। ভদ্রলোক হরর গল্প লেখার কৌশলটা ভালই রপ্ত করেছেন। গায়ে কাঁটা দেয়, শরীরের রোমকূপ খাড়া করে দেওয়ার মত আরেকটি গল্প সরওয়ার পাঠানের 'সর্প মানব'। ইনি রহস্যপত্রিকায় শিকার কাহিনী লিখে পরিচিত তবে পিলে চমকে দেওয়া হরর গল্পেও যে কম যান না, 'সর্প মানব' তার প্রমাণ

রহস্যপত্রিকার আরেকজন সুলেখক শাহেদ ইকবাল। রহস্য সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত! তাঁর 'আলমারী বউ' পড়ুন এবং দেখুন বাড়িয়ে বলেছি কিনা।...কাজী সারওয়ার হোসেন লেখেন কম, তবে তাঁর হরর

গল্পগুলো বেশ সুখপাঠ্য। 'সেই মেয়েটি'র শেষে এমন একটা চমক দিয়েছেন...থাক্, বলে পড়ার মজা নষ্ট করতে চাই না। মিজানুর রহমান মিজানের হাতও সাবলীল। 'ঘৃণা' গল্পে একদল বিকলাঙ্গ মানুষের ভয়ঙ্কর রূপ এমন দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন, শিরশির করে ওঠে গা।

এগুলো সবই লেখকদের মৌলিক রচনা। এ বইতে চমৎকার কিছু অনুবাদ হরর গল্পও স্থান পেয়েছে। শুরুতেই ডেনিস হুইটলির 'সাপ'। মিজানুর রহমান কল্লোল খুব বেশি অনুবাদ করেন না। তবে 'সাপ' নিঃসন্দেহে মাস্টারপিস একটি হরর গল্প। কাজী শাহনূর হোসেন ড্যাফনে দু মরিয়ে'র অতি বিখ্যাত হরর গল্প 'দ্য আপেল ট্রী'র চমৎকার অনুবাদ করেছেন। এ গল্পের শেষে দারুণ একটি চমক আছে। চমক পাবেন সুলেখক শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়ার 'বিদ্বেষিণী', খসরু চৌধুরীর 'মিশ্র রক্ত', কাজী মায়মুর হোসেনের 'ভ্যাম্পায়ার', খুররম মমতাজের 'অশরীরী' ও (আশা করি) এ সম্পাদকের 'রুমমেট' গল্পেও।

মৌলিক কাহিনীর মত অনুবাদ হরর গল্পগুলোরও বিষয়-বৈচিত্র্য, আঙ্গিক একদম আলাদা। তবে পাঠকের রুচি পরিবর্তনশীল। আমার তীক্ষ্ণ নজর ছিল সেদিকে। Horror শব্দের আভিধানিক অর্থ, 'আতঙ্কজনিত কম্পন'। আমি এ বইয়ে নির্বাচিত বেশিরভাগ গল্প পড়ার সময় অজানা ভয়ে কেঁপেছি। এখন পাঠককেও যদি কাঁপাতে পারি (অন্তত একটি গল্প দিয়েও) সেটাই হবে আমার সার্থকতা, বুঝব আমার পরিশ্রম সফল। এবং উৎসাহ পাব আগামীতে পাঠককে রহস্যপত্রিকার লেখকদের লেখা পিশাচ কাহিনীর একটি সংকলন উপহার দিতে।

অনীশ দাস অপু
২৬৩, জাফরাবাদ, শঙ্কর
ঢাকা।

সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত পিশাচ কাহিনীসমূহ

ড্রাকুলা/রকিব হাসান: ট্রানসিলভেনিয়ার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের বিশাল এক প্রাচীন দুর্গের নীচে অন্ধকার কামরায়–কফিনের ভিতর ওর বাস। এবার খোদ লন্ডনে হাজির হলো সে এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।

অশুভ সংকেত (তিনখণ্ড একত্রে)/কাজি মাহবুব হোসেন: মার্কিন ডিপ্লোম্যাট রবার্ট থর্ন নিজের অজান্তে পা দিল পিশাচ-সাধকদের ফাঁদে। দত্তক নিল একটি সদ্যোজাত শিশুকে। বেচারা জানেন না, দত্তক নিয়েছেন তিনি আসলে পিশাচ পুত্র ডেমিয়েনকে। শুরু হলো এক ভয়ানক অশুভ কাহিনী।

আবার অশুভ সঙ্কেত+নেকড়ে মানবী/অনীশ দাস অপু–আবার অশুভ সঙ্কেত: শয়তান-পুত্র ডেমিয়েন, শেয়ালের পেটে যার জন্ম। পৈশাচিক ক্ষমতা অর্জন করে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল সে এবং তার অনুসারীরা। তাদের কুৎসিত চক্রান্তের শিকার হলো অসহায় এক তরুণী। তার গর্ভে জন্ম নিল ডেমিয়েনের উত্তরসুরি। এবার কি সত্যিই কেয়ামত নেমে আসবে পৃথিবীতে?

নেকড়ে মানবী: আপনি কি পছন্দ করেন গা ছমছমে রোমহর্ষক হরর গল্প? তা হলে নেকড়ে মানবীকে নিয়ে বসে যান, সুযোগ কিন্তু বারবার আসে না।

অশুভ ১৩/অনীশ দাস অপু: গল্পগুলো কোনওটি নির্জলা আতঙ্কের, কোনওটি স্রেফ ভয়ের। তবে প্রতিটি গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে অশুভ ইঙ্গিত নিয়ে।

অ্যামিটিভিলের আতঙ্ক+উত্তরাধিকার/কাজি মাহবুব হোসেন–অ্যামিটিভিলের আতঙ্ক: সুইমিং পুল সহ বিশাল তেতলা বাড়িটি সস্তায় কিনলেন জর্জ লুটস। ভূতে বিশ্বাস নেই ওঁর, কিন্তু ওই বাড়িতে বাস করতে গিয়েই আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটতে শুরু করল। আটাশ দিনের মাথায় মালপত্র ফেলে পালাতে বাধ্য হলেন।

উত্তরাধিকার: প্রায় চারশো বছর বেঁচে আছে পিশাচ-সাধক মাউন্টওলিভ। যোগ্য উত্তরাধিকারী না পেলে ক্ষমতা হস্তান্তর করে মরতে পারছে না। পৃথিবীর পাঁচজন সেরা পাষণ্ডকে শিষ্য হিসাবে নিয়েছে সে। ষষ্ঠজন তারই রক্তের মানব। একজনই কেবল পেতে পারে চরম ক্ষমতা।

পিশাচ দেবতা/অনীশ দাস অপু: এ বইয়ের গল্পগুলো পড়ে পাঠক কখনও আঁতকে উঠবেন ভয়ে, কখনও বা শিউরে উঠবেন।

পিশাচের পাল্লায়/অনীশ দাস অপু: পিশাচ কাহিনীর অনুরাগী পাঠকের জন্য এ বই। চমৎকার কিছু পিশাচ কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে বইটিতে। দারুণভাবে গল্পগুলো আপনাকে চমকিত করবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়!

দুঃস্বপ্নের রাত+প্রেতপুরী/অনীশ দাস অপু:

দুঃস্বপ্নের রাত: প্রচণ্ড এক দুর্যোগের রাতে হারিয়ে তরুণী লিন্ডা আশ্রয় নিল শহর থেকে দূরে পরিত্যক্ত এক মোটেলে সে রাতেই খুন হলো লিন্ডা। তারপর···

প্রেতপুরী: ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে তৈরি 'ড্রিম হাউস'টার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল রোজমেরী হাসান। ফ্ল্যাটের ভাড়াও খুব কম। কিন্তু জানত না সে এখানে চলছে ছদ্মবেশধারী একজন ভয়ঙ্কর পিশাচের গা হিম করা চক্রান্ত।

দূরের বাঁশি

নিতান্ত বাধ্য হয়েই এখানে থাকা। হোটেলটা তেমন সুবিধের না। কাঠের দোতলা বাড়ি। একদম জরাজীর্ণ না হলেও বেশ পুরনো। মাঝে মাঝে শ্যাওলা জমেছে দেয়াল কিংবা মেঝেতে। জানালা দরজার অবস্থাও তার চেয়ে ভাল বলা যাবে না। এক হাঁটু ধুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ডাকলাম ছোকরা বয়টাকে। কিন্তু সে ছোঁড়া ব্যাগগুলো নামিয়ে কোথায় যে উধাও হয়েছে তার আর কোন হদিস পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে নিজেই কিছুক্ষণ মাকড়সার ঝুল ঝাড়লাম। এক কোণায় রাখা ঝাড়ুটা নিয়ে মেঝেটাও একটু পরিষ্কার করে নিলাম। কষ্ট হলেও একটু পরে নিজের কাজে নিজেই সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। ঘরটাকে কিছুটা বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে এখন।

এই পাহাড়ী জায়গায় থাকবার এমন সংকট হবে চিন্তাও করিনি। যে ডাকবাংলোতে ওঠার কথা ছিল সেখানে একদল সরকারী হর্তাকর্তা আস্তানা গেড়েছেন। তাদের আরাম আয়েশের সুবিধার কারণে বুকিং বাতিল করা হয়েছে আমার। তাই এই মরচে ধরা অতি পুরনো বনবাণী রেস্ট হাউস ছাড়া আর কোন গতি নেই। মেজাজ ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে এই ভেবে প্রবোধ দিলাম, বেড়াতে এসে সবকিছুই হাতের কাছে তৈরি পাওয়া যায় না। কাজেই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়াই ভাল।

আমি ছাড়া গোটা হোটেলে বোর্ডার আর মাত্র চারজন। এক কেশো বুড়ো, মধ্যবয়স্ক এক দম্পতি, আর চতুর্থ লোকটির দেখা

এখনও পাইনি। তবে ভদ্রলোক থাকেন ঠিক আমার পাশের ঘরটাতেই। অন্যদের সাথে আলাপ করে তেমন সুবিধে হলো না। কাশির তোড়ে বুড়ো লোকটির কোন কথাই বোঝা যায় না। আর দম্পতি যুগল নিজেদের ঝগড়া বিবাদ নিয়েই ব্যস্ত।

প্রতিবেশীর সাথে আমার দেখা হলো সন্ধ্যায়। বিকেলের দিকে চারপাশটা দেখার জন্য একটু বেড়াতে বের হয়েছিলাম। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হাঁটাহাঁটি করে হোটেলে ফিরে দেখি বারান্দায় কেউ চেয়ার পেতে বসে আছে। বুঝলাম ইনিই সেই চতুর্থ ব্যক্তি। কীভাবে কথা শুরু করা যায় ভাবছিলাম, ভদ্রলোক নিজেই আমাকে রক্ষা করলেন।

'আজই এলেন বুঝি?' তীক্ষ্ণ, চিকন গলা তার।

'জ্বী, এই তো দুপুরের একটু আগে।'

'বেড়াতে নিশ্চয়ই।'

'তা বলতে পারেন। কাজে তো এখানে কেউ আসে না। তা ছাড়া এদিকটায় কখনও আসাও হয়নি। তাই ভাবলাম এবার একটু ঘুরেই দেখা যাক।'

'তা ঠিক। ভাল জায়গা। জল হাওয়া খুব সুন্দর। তা ছাড়া মাটিও বেশ ভাল। গর্তের জন্যে খুব সুবিধে।'

অবাক হলাম। ভাল জায়গার সাথে গর্ত বা মাটির কী সম্পর্ক ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে কিছু বললাম না। অন্ধকারে তার মুখ ভাল বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু চেয়ারটা সরিয়ে আমার দিকে ফিরে বসতেই বারান্দার এক ঝলক আলো তার মুখে এসে পড়ল। একটু সরু, লম্বাটে মুখ। হালকা তামাটে গায়ের রঙ। ছোট ছোট দু'চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কালচে ধূসর রঙের আলখাল্লা ধরনের একটা পোশাক পরনে। এক নজরে সাধারণ কোন মানুষ বলে মনে হবে না তাকে। লোকটার চেহারার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা মনে পড়তে চাইছিল আমার। কিন্তু ঠিক ধরতে পারছিলাম না সেটা।

'ক'দিন থাকবেন এখানে?'

'ধরুন দিন সাতেক। যদি ভাল লাগে তা হলে হয়তো আর ক'দিন বেশিও থাকতে পারি।'

'ভাল, ভাল। আর পাঁচদিন পর তো পূর্ণিমা। পূর্ণিমাটা পার করে দিয়ে যান না হয়। হ্রদের জলে জ্যোৎস্নার খেলা, সে এক অপূর্ব জিনিস পাহাড়ের মাথা থেকে বনভূমির উপর দিয়ে তাকিয়ে রইবেন চাঁদের পানে। একদম যাকে বলে চন্দ্রাহত। হা...হা...কী বলেন!' বলে হেসে উঠলেন জোরে। আলোতে তার দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠল। ছোট ছোট ঘন একসারি দাঁত। ঝকঝকে সাদা। ঠিক...এইবার মনে পড়ল আমার। হ্যাঁ, ইঁদুরের মত। লোকটার চেহারায়, সারা শরীরে কোথায় যেন মিল আছে ইঁদুরের সাথে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বড়সড় একটা ইঁদুরই যেন। পোশাক পরে বসে আছে মানুষের মত।

পরদিন বেশ সকালে ঘুম ভেঙে গেল আমার। নতুন জায়গা বলেই বোধহয়। সময়টা হেমন্তের শেষ। ভোরে মাঝে মাঝে হালকা কুয়াশা পড়ে। বেশ শীত শীত লাগছিল। তবু আলিস্যি কাটিয়ে উঠে পড়লাম। জামা কাপড় বদলে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। পাহাড়ী রাস্তা ধরে আনমনে হাঁটতে বেশ লাগছিল। হালকা শীতের আমেজে সবকিছুই যেন সুন্দর। দূরে পাহাড়ের গায়ে ধোঁয়ার মত মেঘ, তার পাশে ছোট ছোট ছবির মত ঘরবাড়ি। এইসব দেখতে দেখতে যখন শহরের মাঝখানে পৌঁছলাম তখন হলদে রোদ ছড়িয়ে আছে সদ্য ঘুমভাঙা ছোট ছোট রাস্তায়।

শহরটা ছোট হলেও বাজারটা বেশ জমজমাট। এর মধ্যেই মাঝারি রকমের ভিড় জমেছে দোকান পাটের সামনে। শেভিং ক্রীম, বিস্কিট, ফলমূল, এমনি টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র কিনে ফেরার পথেই চোখে পড়ল একটা বুকস্টল। নিতান্ত অভ্যাসবশেই ঢুকে গেলাম সেখানে। সাথে আনা ডিটেকটিভ বইটা শেষ। নতুন

কিছু পেলে তো ভালই। দোকানে ঢুকে অবাক হতে হলো। এই মফঃস্বল শহরেও ঝুলছে আগাথা ক্রিস্টি থেকে এডগার অ্যালান পো। আমাকে গোটা তিনেক রহস্য উপন্যাস কিনতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল সেলসম্যান।

'স্যার মনে হচ্ছে রহস্য উপন্যাসের ভক্ত।'

'ভক্ত না হলেও ভাল লাগে বলতে পারেন। সময়ও কাটে বেশ।'

'আপনাকে আগে দেখিনি কখনও।'

'বেড়াতে এসেছি,' বললাম আমি।

'উঠেছেন কোথায়? ডাকবাংলোয়?'

'ওখানেই থাকার কথা ছিল কিন্তু জায়গা পেলাম না শেষ পর্যন্ত। ওপরওয়ালারা হাজির হলেন। আছি বনবাণী রেস্ট হাউসে।'

'বনবাণীতে!' ছেলেটা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'স্যার দেখছি বেশ রহস্যময় জায়গাই বেছে নিয়েছেন।'

'রহস্য! কীসের রহস্য!' অবাক হলাম আমি।

'আমার কথায় কিছু মনে করবেন না, স্যার। তবে শহরের অনেকেই বলে জায়গাটা তেমন ভাল না। বিশেষ করে বছরের এ সময়টাতে বেশ অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপার ঘটে ওখানে। সবই অবশ্য শোনা কথা। কিন্তু এসব যাচাই করার জন্যে কেউ যদি আমাকে ওখানে থাকতে বলে, জীবনেও রাজি হব না।'

আমি একটু হাসলাম। 'তা রহস্য থাকতেও পারে। সবকিছুর মত ওরও তো একটা আশ্রয় দরকার। তবে বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে সবসময়ই বেশ একটা ফারাক থাকে।'

ছেলেটা একটু ম্লানভাবে হাসল। 'হয়তো বা।'

আমি ফিরছিলাম। পিছন থেকে সে হঠাৎই বলল, 'তবে, স্যার, পারলে হোটেলটা বদলে ফেলবেন।'

সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েই কাটালাম। ভাল কাটল সময়টা। তবে

মনে হচ্ছিল একজন সঙ্গী পেলে ভালই হত। পাশের রুমের সেই লোকটিকে কোথাও দেখলাম না। কোথায় গেছে কে জানে। দিন শেষে হোটেলে ফিরেও দেখলাম দরজায় তালা ঝুলছে। ঘরে ফিরে রাতের খাবার সেরে নতুন কেনা বইগুলোতে মনোনিবেশ করলাম। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি ঠিক খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কেন জানি। পাশের ঘরে বোধ হয় আলো জ্বলছে। কাঠের দেয়ালের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে হালকা আলোর রেখা আসছে। ভদ্রলোক ফিরেছেন তা হলে। দূরে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজল।

ক্লান্তিতে আবার চোখ বুজে এল। কিন্তু ভাল ঘুম হলো না। ইঁদুরের ভয়ঙ্কর উৎপাত। অবাক লাগল এত ইঁদুর এল কোথা থেকে। খুটখাট ছুটে বেড়াচ্ছে সারা ঘর জুড়ে। বিরক্ত হয়ে আলো জ্বালতেই ছুটে পালাল সব। খানিকক্ষণ এ কোণা ও কোণায় গিয়ে হুড়ো দিলাম। লাভ হলো না। আলো নিভতে আবার শুরু হলো হুটোপুটি। আবার আলো জ্বাললাম। সবগুলো পালালেও বড়সড় ধেড়ে একটা পালাল না। ঘরের এককোণায় বসে খুদে খুদে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল খুব। 'তবে রে, বেয়াদব,' বলে হাতের বইখানা ছুঁড়ে মারলাম বদমাশটার দিকে। এবার পালালেও কাঠের ফাঁকের ভিতর ঢুকে সেখান থেকে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। রীতিমত বিরক্তি লাগলেও আলো নিভিয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।

পরদিন ভোরে ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া গেল। লেকের উপর ছোট ব্রিজটার রেলিংয়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন লেকের পানির দিকে। আমাকে দেখে অত্যন্ত পরিচিতের ভঙ্গিতে হাসলেন। 'আরে আপনি। আসুন আসুন। রোজই ভোরে বেড়াতে বার হন নাকি?'

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, 'গতকাল আপনার দেখা

পেলাম না, কোথাও গিয়েছিলেন নাকি?'

'উঁ, কাজ ছিল একটা,' বলে ভদ্রলোক একটু নড়েচড়ে বসলেন।

ভাব দেখে বুঝলাম এ প্রসঙ্গে তিনি কথা বলতে চান না। প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বললাম, 'দেখুন, সেদিন আপনার নামটাই জানা হয়নি। আমি মাহমুদ—মাহমুদুর রহমান, আপনি...?'

ভদ্রলোক আবার একটু চুপ করে রইলেন। নামের কথা ওঠাতেই কিনা কে জানে। কিন্তু আমি তবুও তাকিয়ে আছি দেখে একটু বিরক্ত গলায় বললেন, 'নামে কী আসে যায় বলুন। তবু আপনি যখন জানতে চাইলেন তখন না হয় ইনুষ বলেই ডাকবেন।'

'জ্বী, ইউনুস?'

'না না, ইনুষ। ই-নু-ষ।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা কিন্তু একটু অদ্ভুত। এমন নাম আমি আগে কখনও শুনিনি।'

'তাই তো বলছিলাম, নামে কী আসে যায়। যেমন নামই হোক, আমি লোকটা কেমন, ভাল নিশ্চয়ই!'

'তা তো অবশ্যই!' আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম। মনে মনে বললাম; তবে একটু ছিটগ্রস্ত, এই যা।

আমার মনের কথা তিনি বুঝলেন কি না কে জানে। উদাস গলায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'মানুষ যা ভাবে তা সবসময়ই ঠিক না, বুঝলেন।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'কিছু বললেন?'

'না, কিছু না। চলেন ওই পাহাড়টার ওপাশ দিয়ে একটু ঘুরে আসি।' আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন তিনি।

আমরা হাঁটতে লাগলাম ঘাসে ছাওয়া সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে। দুপাশে হালকা জঙ্গল। কোথাও বন বিভাগের পাইন বা সেগুনের প্লানটেশন। মাঝে মধ্যে জারুল কিংবা গর্জন। ভোরের

শিশির টুপটাপ ঝরছিল আমাদের মাথায়। গাছের ডালে দেখছিলাম কখনও বাঁদর কখনও কাঠবিড়ালি।

ইনুষ সাহেব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব মিলিয়ে কেমন লাগছে জায়গাটা?'

'ভালই। তবে হোটেলটা তেমন সুবিধের না।'

'কেন?'

'ইঁদুরের বড় উপদ্রব। গতরাতে ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। এই হতচ্ছাড়া জীবগুলোকে আমি একদম দেখতে পারি না।'

ইনুষ সাহেব রীতিমত আহত ভঙ্গিতে তাকালেন আমার দিকে। 'কোন প্রাণীকেই হতচ্ছাড়া বলার অধিকার নেই আপনার। কারণ প্রত্যেকেই তাদের অধিকারের সীমার মধ্যে বসবাস করে। শুধু মানুষ ছাড়া।'

আমার বিরক্তি লাগল এবার। এমন উদ্ভট পাগল কে কবে দেখেছে। বললাম, 'মানুষ যদি তার বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে অধিকারের সীমানা প্রশস্ত করে তবে কার কী বলার আছে। ইঁদুর যদি আমায় বিরক্ত করে তবে তাকে হতচ্ছাড়া বলার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।'

'আপনি শুধু নিজের দিকটা দেখছেন। ইঁদুরের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখেছেন কী? তাদেরও তো জীবন আছে একটা। সে জীবনে চাওয়া, পাওয়া, ভাল লাগা না লাগাও আছে নিশ্চয়। কেমন হতে পারে সেটা চিন্তা করেছেন কখনও?'

'আমি একজন মানুষ। কাজেই মানুষ হিসাবেই আমি সব কিছু ভাবব। ইঁদুরের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে যাব কেন?'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনি কবিতা পড়েন?'

হঠাৎ এমন প্রশ্নে অবাক হলাম। তবু বললাম, 'পড়ি মাঝে মধ্যে।'

'জীবনানন্দ দাস পড়েছেন নিশ্চয়ই?'

'উনি আমার প্রিয় কবিদের একজন।'

'আচ্ছা।' উনি যেন একটু খুশি হলেন। 'তার সেই লাইনটি...। "যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের মানুষের সাথে তার হয় না কো দেখা।" তিনিও বলেছেন এদেরও জীবন আছে, বাঁচার প্রেরণা আছে। তিনি জানতেও চেয়েছেন সেই জীবনকে।'

আমি গোঁ ধরে বললাম, 'যাই বলেন, ফড়িঙ বা দোয়েলের কথা জীবনানন্দ বলতে পারেন–কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই কোন ইঁদুরের জীবনকে জানতে চাননি।' ভদ্রলোক থমকে গেলেন এ কথায়। ছোট ছোট দু চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আপনাকে দেখাব। দেখাব কেমন হতে পারে একটা ইঁদুরের জীবন।' তারপর উল্টোদিকে ফিরে হাঁটতে লাগলেন হনহন করে। কিছুক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন জঙ্গলের মাঝে।

এরপর থেকে ইনুষ সাহেব আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন বলে মনে হলো। অবশ্য তাঁর সাথে দেখা হত একদম কম। রোজ ভোরে কোথায় বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন সেই বারোটার দিকে। গভীর রাতে শুনতাম তার ঘর থেকে আসা খুটখাট ঠুকঠাক শব্দ। মাঝে মাঝে কৌতূহল জাগত উঁকি দিয়ে দেখার। কিন্তু নিজেকে দমন করতাম। সেটা মোটেই ভদ্রলোকের কাজ হবে না।

সেদিন পাহাড়ের মাথা থেকে দেখলাম তাকে ঢাল বেয়ে নেমে যেতে। সময়টা প্রায় সন্ধ্যা। হালকা অন্ধকারে কালো আলখাল্লায় তাকে মনে হচ্ছিল কোন বিশাল বাদুড়ের মত। অসম্ভব দ্রুতগতিতে তিনি নেমে গেলেন নীচে। সরু পথটা ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। পথটা শেষ হয়েছে খ্রিস্টান কবরখানার দরজায়। কৌতূহল চাপতে না পেরে আমিও নামলাম পাহাড় থেকে। খানিকটা উঁচু এক জায়গায়, ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগলাম তাঁকে। ইনুষ সাহেব কবরস্থানে ঢুকে কী এক ব্যস্ততায়

নির্জন ক্রসগুলোর ফাঁকে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। আমি নিবিষ্ট মনে তাকে খেয়াল করছিলাম। একটা উঁচু ঢিবির আড়ালে চলে যেতে তাঁকে আর দেখলাম না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে নেমে এলাম নীচে। ভয়ে ভয়ে পা রাখলাম কবরস্থানের মাঝে। ক্রসগুলো পেরিয়ে মাটির ঢিবির ওপাশে উঁকি দিতেই দেখলাম একটা বিশাল গর্ত। কালো অন্ধকার মুখ ব্যাদান করে আছে। প্রায়ান্ধকারে চোখে পড়ল মাটিতে আঁকা অদ্ভুত কিছু আঁকিবুঁকি। আমার গা কেমন ছম ছম করছিল। অনুসন্ধানে ইস্তফা দিয়ে ফিরে চললাম।

হোটেলে ফিরে রীতিমত অবাক হলাম। ইনুষ সাহেব ফিরেছেন। দিব্যি বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। আমাকে দেখে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। তবে সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা যেন খেলে গেল তাঁর মুখে। কিছু না বলে চুপচাপ ঘরে ফিরলাম। জানালার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলাম। হ্রদের ওপারের পাহাড়ের মাথা থেকে লালচে থালার মত গোল চাঁদ উঠছে। কিন্তু এখনও নিখুঁত হয়নি থালাটা। আর দুদিন পরেই পূর্ণিমা। একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেল। আজ সকালে হোটেলের বেয়ারা রহমতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ইনুষ সাহেবের ব্যাপারে। তার নাম শুনেই ভয় ও বিরক্তির একটা বিচিত্র ভঙ্গি মুখ করে বলল, ও-ব্যাপারে কিছু জানে না। পকেটে বিশটা টাকা গুঁজে দিতে একটু নরম হলো। তার কাছ থেকে শুনলাম ভদ্রলোক দুতিন বছর পর পর এখানে এসে হাজির হন এমনি সময়ে। তারপর হুট করে উধাও হয়ে যান কোন এক পূর্ণিমায়। আগামী পূর্ণিমাই কী তবে সেই দিন? জানতে হবে, ভাবলাম আমি। জানতে হবে ওই তীক্ষ্ণদন্তীদের সাথে তার সম্পর্ক কী। যেন আমার চিন্তার সাথে তাল রেখেই ফাঁক-ফোকর থেকে বেরিয়ে এল ইঁদুরগুলো। রোজকার মত হুল্লোড় শুরু করে দিল আবার।

পরদিন সকালবেলা দম্পতিযুগল হোটেল ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময় দেখা হয়েছিল আমার সাথে। হঠাৎ কেন হোটেল ছাড়ছেন জিজ্ঞাসা করায় ভদ্রলোক মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'আরও আগেই ছাড়া উচিত ছিল। নেহায়েত মনের জোরে এতদিন টিকে ছিলাম। শয়তানের দোসর এখানকার ইঁদুরগুলো। গজব পড়ুক ওদের উপর। কোথাও দেখেছেন ইঁদুর কখনও চেয়ে থাকে মানুষের দিকে? অভিশপ্ত জায়গা। আর ওই আলখাল্লা পরা লোকটা। সারাদিন কী করে খোদাই জানে। দেখলেই কেমন ভয় লাগে। মানুষের চেহারা এমন হয়! অন্ধকারে তার চোখ জ্বলে। খেয়াল করে দেখবেন।' এতগুলো কথা বলে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি মালপত্র নিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় আমাকেও উপদেশ দিলেন হোটেল ছাড়ার।

সন্ধ্যার দিকে হোটেলের কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে রাতের খাবারটা সারতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে দেখা হলো ইনুষ সাহেবের সাথে। আমি প্রায় এড়িয়েই যাচ্ছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক বেশ অমায়িক একটা হাসি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন ছিলেন এ কদিন?'

'ভাল,' সংক্ষিপ্ত উত্তরটা দিয়ে আমি আবার হাঁটতে লাগলাম।

কিন্তু তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'কী হলো, রাগ করে আছেন নাকি? আপনার সাথে কথা আছে আমার।'

'কী কথা?' হাসলাম আমি।

'আপনি সুকুমার রায় পড়েছেন?'

শুরু হলো পাগলামি, ভাবলাম আমি। বললাম, 'পড়েছি।'

'মনে আছে—হাঁস ছিল সজারু ব্যাকরণ মানি না।

হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না?'

আমি এবার হেসে ফেললাম। 'মনে থাকবে না কেন, অবশ্যই আছে। শুধু হাঁসজারু নয় বকচ্ছপ হাতিবি সবার কথাই মনে আছে।'

তিনি বেশ মুগ্ধভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'বেশ বেশ। আপনাকে যা ভেবেছিলাম, আপনি তারচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড। আপনাকে দিয়ে হবে।'

'কী হবে আমাকে দিয়ে?'

আমার কথায় কান না দিয়ে তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'চলুন, আগামীকাল একটা অ্যাডভেঞ্চারে বের হব।'

মনের উত্তেজনা গোপন করে বললাম, 'কী ব্যাপার, শিকার-টিকার নাকি?'

'আরে না। আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাব। দ্বিবাৎসরিক সম্মেলন। শুধু দেখবেন না, অনুভবও করবেন। চাইলে অংশগ্রহণও করতে পারেন। তখন বুঝবেন জীবনে অনেক কিছু দেখার বাকি ছিল। আগামীকাল রাত বারোটায়, কেমন?' বলে আমাকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই তিনি চলে গেলেন।

বেশ অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলাম। ভয়ঙ্কর একটা উত্তেজনা মনের মাঝে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল। কিছুটা ভয়ও লাগছিল তার সাথে। ঘড়ি দেখলাম, রাত সাড়ে দশটা। কী দেখাবেন ইনুষ সাহেব? নাকি সবই তাঁর পাগলামো? হয়তো গিয়ে দেখব কিছুই না, গোটা ব্যাপারটাই একটা ধাপ্পাবাজি।

রাত বারোটার কিছু আগে ইনুষ সাহেব আমার ঘরে এলেন। পরনে মেটে রঙের একটা আলখাল্লা। পায়ে অদ্ভুত বাঁকানো একজোড়া জুতো, মাথায় কানঢাকা গোল টুপি। তার পোশাক দেখে আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। আমায় বাধা দিয়ে বললেন, 'কোন কথা নয়। সময় নেই একদম। এক্ষুণি চলুন।' আমিও কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ তাঁর পিছু পিছু চললাম। বাইরে হেমন্তের আকাশে জ্বলজ্বল করছে পূর্ণিমার চাঁদ। ধূসর আলোয় প্লাবিত পাহাড়-হ্রদ-উপত্যকা। চারদিকে সুনসান

নীরবতা। কেবল দূরের জঙ্গল থেকে ডেকে উঠল একটা শেয়াল।

হোটেলের বাইরের পায়ে চলা পথ ধরে আমরা হাঁটছিলাম। একটু পর পাহাড়ের গা ঘেঁষে অপেক্ষাকৃত চওড়া একটা রাস্তায় পড়লাম। এই রাস্তাটাই শেষ হয়েছে ক্রিশ্চিয়ান কবরখানায়। এতক্ষণ পর হঠাৎ আমার গা ছম ছম করতে লাগল। ইচ্ছে হলো ফিরে যাই। একবার থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার ভিতর থেকে অজানা একটা কৌতূহল বা দুর্বোধ্য প্রেরণা আমাকে টেনে নিয়ে চলল।

শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছলাম। কবরখানার দরজায় আস্তে ঠেলা দিলেন ইনুষ সাহেব। হালকা একটা ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। ইঁট বিছানো পথ ধরে আমরা এগিয়ে গেলাম। দুদিকে সারি সারি কবর। কবরের উপর দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ ক্রসগুলো। কবরখানার একদম ভিতরে ফাঁকামত একটা জায়গায় আমরা দাঁড়ালাম। চারধারে জঙ্গলে ছাওয়া পাহাড়। মাথার উপরে শুধু জ্বলজ্বলে চাঁদ। তীব্র হাসিতে ফেটে পড়ে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। জ্যোৎস্নার আলো ঠিকরে পড়ছে বনভূমির গায়ে। কিন্তু ভিতরের কালো অন্ধকার নীরবে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

দূরের সামরিক ব্যারাকে ঢং ঢং করে বারোটার ঘণ্টা বাজল। প্রায় সাথে সাথে নিস্তব্ধতা ভেদ করে ডেকে উঠল একদল শেয়াল। তারা থেমে গেলে পরিপূর্ণ এক নিস্তব্ধতার মাঝে আকাশের দিকে দুহাত তুলে কিছু আওড়ালেন ইনুষ সাহেব। মাটিতে একটা বৃত্ত টানলেন। আঁকলেন কিছু অদ্ভুত নকশা। আলখাল্লার পকেট থেকে একমুঠো গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেন চারপাশে। গাঢ় অদ্ভুত একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। চাঁদের আলোয় এই গন্ধ ও এই পরিবেশ কেমন নেশাগ্রস্ত করে তুলল আমাকে।

একটু পর আলখাল্লার পকেট থেকে একটা বাঁশী বার করলেন

তিনি। হালকাভাবে একটু ফুঁ দিলেন। অস্পষ্ট মৃদু একটা সুর ছড়িয়ে গেল চারপাশে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে এল সেটা। অদ্ভুত করুণ একটানা সুর। জীবনের সব বিষাদকে তা যেন জাগিয়ে তোলে। আমার মনে পড়তে লাগল ছেলেবেলার কথা, কৈশোরের তারুণ্যের সব দুঃখভরা স্মৃতি। বুক ভারি হয়ে এল ব্যথায়। কিন্তু ক্রমেই বদলে গেল সেটা। একটানা দুঃখের পর মনের মাঝে যে নিঃস্পৃহভাব এসে ভর করে তেমনি একটি অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলল মনকে। নিরর্থক মনে হলো এ জীবন। বেঁচে থাকাকে মনে হলো দিনগত পাপক্ষয়। চারপাশের এই বাস্তবতাকেও মনে হলো অলীক কল্পনা।

আবারও বদলে গেল সুর। ধীর বিস্তারে প্রলম্বিত লয়ে বাজতে লাগল বাঁশী। মনে হলো কে যেন ডাকছে আমায়। এই পাহাড়, বনানী, আকাশ, মাটি, জীবন মৃত্যুর ওপার থেকে বুঝি ভেসে এল সেই ডাক। বুকের ভিতর স্ফীত হয়ে উঠল ধমনী, নেচে উঠল রক্ত কণিকারা, জানতে চাইল কে ডাকে।

ঠিক তখনই আমি শুনতে পেলাম শব্দটা। বাঁশীর সেই সুরের মাঝেও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সেটা। পায়ের শব্দ। হাজার হাজার লাখো লাখো ক্ষুদ্র পায়ের শব্দে কারা যেন এগিয়ে আসছে। একটু পরেই দেখলাম সেই অদৃশ্য অক্ষৌহিণীকে। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে পাহাড়ী পথ ধরে তারা এগিয়ে আসছিল। ইঁদুর...সহস্র...লক্ষ...। শ্রেণীবদ্ধ সেনাবাহিনীর মত কোন অমোঘ নির্দেশে তারা এগিয়ে এল। ঘিরে ধরল চারপাশ থেকে। তারপর চক্রাকারে আবর্তিত হতে লাগল। প্রতিবারেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসতে লাগল মাঝখানের বৃত্তটা।

কেমন অদ্ভুত একটা ইচ্ছা জাগছিল ভিতরে ভিতরে। মনে হচ্ছিল মিশে যাই ওই মূষিক বাহিনীতে। ধীরে ধীরে বুঝি বাড়ছিল ইচ্ছেটা। নিজেকে নিয়ে এই ব্যস্ততায় এতক্ষণ ইনুষ সাহেবের দিকে খেয়াল করিনি। হঠাৎ পাশে তাকাতেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা

খেলাম। শিউরে উঠল সারা গা। চাঁদের আলোয় দেখা গেল আলখাল্লার ভিতর থেকে বার হয়ে আসা হাত দুটো আর হাত নেই, হয়ে গেছে ইঁদুরের থাবা। টুপির পাশ থেকে বেরিয়ে পড়েছে ছোট দুটো চ্যাপ্টা কান। সারা গায়ে বাদামী পশম। অতিকায় এক ইঁদুর যেন। দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত বাঁশী বাজাচ্ছে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল ইঁদুরেরা। যেন তারাও কাউকে আহ্বান করছে। ধীর পায়ে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এল সেই অবয়বটি। বাঁশীর মোহন সুরকে সঙ্গে নিয়ে ইঁদুর অক্ষৌহিণীর সাথে মিশে গেল সে। তারপর তারা এগিয়ে চলল পাহাড়ী পথ ধরে দূর কোন অজানায়।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সেই শূন্য কবরস্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি একা। হঠাৎ সেই সুরকে ছাপিয়ে একটা আতঙ্ক ঘিরে ধরল আমাকে। তীব্র ভয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে লাগলাম দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে। গাছের ডাল, কাঁটা ঝোপে ছিঁড়ে গেল কাপড়, রক্ত ঝরতে লাগল শরীর থেকে। কিন্তু কোনকিছুই অনুভব করলাম না।

একটা ঘোরের মধ্যেই হোটেলে ফিরলাম। সবাই নিমগ্ন গভীর সুপ্তিতে। নিঃশব্দে উঠে গেলাম নিজের ঘরে। চুপচাপ বসে রইলাম নিজেকে শান্ত করার প্রচেষ্টায়। ধীরে ধীরে কমে এল আতঙ্ক। কিন্তু বাঁশীর সেই সুর তখনও ভাসছিল আমার কানে। কে যেন ডাকছিল ভিতর থেকে। তীব্র হয়ে উঠছিল সেই আহ্বান। নিজেকে প্রবোধ দেবার সেই মুহূর্তে আমার চোখ পড়ল আয়নার দিকে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেলাম। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হলো না। এ কার প্রতিচ্ছবি! লম্বা সরু মুখ, ছোট ছোট গোল চোখ, বাদামী পশমে ঢেকে এ কে দাঁড়িয়ে আছে আয়নার সামনে। নিজের হাতের দিকে তাকালাম, ছোট ছোট তিনটে আঙুলে সরু নখ। হাত কোথায়! ইঁদুরের থাবা! ওহ্, খোদা, আমি

একটা ইঁদুর হয়ে গেছি।

সুরটা তখনও ভেসে বেড়াচ্ছিল মাথার ভিতর। ধীরে ধীরে তা যেন আরও জোরাল হয়ে উঠল। নিজেকে মনে হলো অদৃশ্য কোন সুতোর টানে বাঁধা। শান্ত নিস্পৃহ একটা ভাব চলে এল নিজের ভিতরে। ভিতর থেকে কে যেন বলল, ডাক এসেছে, বেরিয়ে পড়ো। এই তো জীবন, এই তো রহস্য। ক্ষণে ক্ষণেই তার রূপ বদলায়। নিরুদ্বিগ্ন শান্ত চিত্তে আমি পা দিলাম ঘরের বাইরে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মায়াবী রাতে বিশাল কালো ছায়া ফেলে হাঁটতে লাগলাম সেই মোহন সুরের সন্ধানে।

জাহিদুস সাঈদ

নরসিংহপুরের পিশাচ

Ghoul ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পিশাচ। এই পিশাচ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানান কাহিনী প্রচলিত আছে। পিশাচ সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তাতে এরা মানুষের আকৃতিতে এক ধরনের প্রাণী। প্রধানত পুরাতন গোরস্থানে অথবা শ্মশানে দেখা যায় এদের। তাও যে সে শ্মশান নয়, লোকালয় থেকে বহু দূরের মহাশ্মশান এদের প্রিয় আবাসস্থল। মৃতদেহের মাংস এদের প্রধান খাদ্য।

শোনা যায় এইসব পিশাচ মানুষের আকৃতি ধারণ করে চলাফেরা করলেও, ইচ্ছানুযায়ী এরা নিজেদের রূপ বদল করতে পারে। অনেকক্ষেত্রে কিছু কিছু তান্ত্রিক বা শক্তির সাধকেরা পিশাচদের মত মৃতদেহ ভক্ষণ করে থাকে। সেক্ষেত্রে এরা যথার্থ পিশাচ না হলেও পিশাচের আকৃতি পেতে পারে। আদতে নরমাংসের স্বাদই সম্পূর্ণ আলাদা এবং অতি উপাদেয়। একবার এর স্বাদ পেলে মানুষ, পিশাচ বা জন্তুজানোয়ার সহজে তা ভুলতে পারে না। নরমাংস বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে মহামাংস হিসেবেও পরিচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে লুপ্ত সাধনার জন্য নরবলি দিয়ে মহামাংস ভক্ষণের রেওয়াজ পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। বড় ভয়ংকর এইসব তান্ত্রিক সাধনা। ভয়াবহ তার বিবরণ।

এক পিশাচকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী–বলা যায় লোমহর্ষক কাহিনী। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে আমি ঠিক

এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নই। তবে যাঁর সাক্ষাতে এই ঘটনা ঘটেছিল, সেই রঘুনন্দন মিশিরজীর মুখ থেকে এই কাহিনী শুনেছি। এবং আমি যা শুনেছি তার অবিকল একটা প্রতিলিপি দেবার চেষ্টা নিয়েছি। রঘুনন্দন মিশিরজীর সাথে হঠাৎ আমার পরিচয় মোঘলসরাই জংশনে। করেসপন্ডিং ট্রেন ধরার জন্যে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে অপেক্ষা করছিলাম আমরা দুজনেই। মোঘলসরাই কর্মব্যস্ত জংশন। অনবরত ট্রেন আসছে আর যাচ্ছে। এই ব্যস্ততা, হৈ চৈ ও যান্ত্রিক শব্দের কারণে খুব একটা স্বস্তি ছিল না। মনে মনে প্রত্যাশা করছিলাম, কখন আমার ট্রেন আসবে। ট্রেন লেট্ থাকায় আমার পাশে বসা পাকাচুল ভদ্রলোকের সঙ্গে এটা ওটা আলাপ চালিয়ে সময় কাটাচ্ছিলাম। শেষপর্যন্ত ভদ্রলোকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার এক ভয়ংকর পিশাচ কাহিনী আমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখল সারাটা সময়। ভদ্রলোকই রঘুনন্দন মিশিরজী। তাঁর নিজের জবানীতে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি।

...আমি তখন দক্ষিণ বিহারের নরসিংহপুর জমিদারী স্টেটের সহকারী নায়েব। বয়স কম। ডাকসাইটে জোয়ান। গায়ে অসুরের শক্তি। লাঠি হাতে নিলে একাই চার-পাঁচজন লাঠিয়ালের মহড়া নিতে পারতাম। রোজ ভোরে উঠে আমার প্রধান কাজ ছিল জমিদারীর বাছাবাছা লাঠিয়ালদের সাথে হাত মকশো করা। জমিদারবাবু নিজেও খুব ভাল লাঠিয়াল ছিলেন। তিনিও আসতেন মাঝে মাঝে আমাদের সাথে লাঠি ধরতে। কাজেই উৎসাহ বাড়ত সকলের।

ইংরেজ রাজত্ব তখন। জমিদারদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। জমিদারের ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। কাউকে ধরে আনতে বললে পাইক বরকান্দাজরা বেঁধে আনত। টুঁ করার সাহস ছিল না কারও। এমনই শাহী দিন ছিল তখন। খাজনা দিতে

অক্ষম প্রজাদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালানো হত তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মারধর ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। বেয়াড়া প্রজাদের নির্যাতন করার জন্যে কাছারিঘরের নিচে ভূগর্ভের বন্দীশালায় আটক রাখা হত মাসের পর মাস। বন্দীশালাটা এমনই এক জঘন্য স্থান, কিছুদিন সেখানে আটক থাকলে যে কেউ পাগল হয়ে যেত।

সহকারী নায়েব হিসাবে সেই বন্দীশালা দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। ভূগর্ভে পাথর দিয়ে তৈরি অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠগুলো দুই ধারে দুই সারিতে সাজানো। মাঝখানে দিয়ে অপ্রশস্ত করিড়র–যেখান দিয়ে এমাথা থেকে ও মাথায় যাওয়া যেত। বছরের পর বছর জমে থাকা ময়লা আবর্জনায় স্থানটা পুঁতিগন্ধময়। মশামাছির কথা বাদই দিলাম; সাপ, বিছা, পোকামাকড় কি নেই সেখানে! বন্দীশালার পিছন দিয়ে ঘাঘী নদী প্রবাহিত। নদীতে খুব বেশিরকম জল বাড়লে বন্দীশালার মেঝে ডুবে যেত। দাঁড়িয়ে থাকতে হত বন্দীদের। এমনই এক জঘন্য পরিবেশে মানুষকে আটকে রেখে তার উপর চলত বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। কেউ কেউ দু'চার দিনের মধ্যে মারা যেত, কেউবা টিকত দু'একমাস। আবার কেউ কেউ পাগল হয়ে চিৎকার করত সেই বন্দীশালার মধ্যে। পাথরে পাথরে তার আর্তনাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই অন্ধকার বন্দীশালা শিহরিত হয়ে উঠত নিত্যদিন। আমরা, যারা ওদিকে কালেভদ্রে যেতাম, শুনতাম সেই রক্তহিম করা ভয়ংকর আর্তনাদ। মাঝে মাঝে যে খারাপ লাগত না, তা নয়। কিন্তু কি করা, যার নিমক খেয়েছি, তার সঙ্গে তো নিমকহারামী করতে পারি না। সুতরাং মুখ বুজে সব সহ্য করতাম।

জমিদারবাবু ছিলেন শক্ত সম্প্রদায়ের লোক। দারুণ কালীভক্ত। গভীর রাতে কালীমন্দিরে একা একা পূজাঅর্চনা করতেন। সে সময় তাঁর রূপ অতি ভয়ংকর। পরনে লাল চেলী,

কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অতিরিক্ত কারণবারি সেবন করায় চোখ থাকত জবা ফুলের মত লাল। কথা বলতেন, যেন ধমক দিতেন। আমরা সবাই তটস্থ থাকতাম তাঁর ভয়ে। শুনেছিলাম সেই মন্দিরের তলা থেকে মাটির নিচের এক সুড়ঙ্গ পথ এসে পৌঁচেছে কাছারিবাড়ির নিচের বন্দীশালায়। দূরত্ব প্রায় চারশো গজ হবে। জমিদারবাবু মাঝে মধ্যে সেই সুড়ঙ্গপথ ধরে বন্দীশালায় যাওয়া-আসা করতেন।

কাছারিবাড়ির একধারে ছোট্ট একটা ঘর দেয়া হয়েছিল আমাকে। একা মানুষ, দিব্বি্য চলে যেত আমার। সেই ঘরের ধার দিয়েই ভূগর্ভের বন্দীশালায় নামার সিঁড়ি। সিঁড়ি ধরে নামলে প্রথমে পড়বে একটা লোহার গেট। গেটে ভোজপুরি দারোয়ান মোটু সিং সব সময় বন্দুক হাতে পাহারায় থাকত। লোহার গেট পার হলে লম্বা সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের মাথায় বন্দীশালা। বন্দীশালার মাঝ দিয়ে লম্বা করিডর। দুপাশে সার সার ঘর। দেওয়ালে জ্বলত মশাল। সেই করিডর গিয়ে শেষ হয়েছে বাঁক নিয়ে। বাঁকের মাথায় লোহার গেট। গেটে সব সময় ঝুলত ভারী তালা। গেটের পর অন্ধকারে বাঁক নিয়ে টানেলটা হারিয়ে গেছে। রাতে বন্দীশালায় ঢোকা সম্পূর্ণ নিষেধ। কোন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া বা নতুন কোন বন্দীকে কারাকক্ষে ঢোকানোর কাজ সাধারণত দিনের বেলায় করা হত। অবশ্য সেখানে দিন বা রাতের কোন প্রভেদ ছিল না। সব সময় মিট্‌মিট করে মশাল জ্বলত। তবে এটাই ছিল জমিদার বাবুর হুকুম, আর এই হুকুম অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ছিল না কারও।

ইতিমধ্যে এই বন্দীশালা সম্বন্ধে অনেক গুজব শুনেছি। শুনেছিলাম রাতে সেখানে প্রেতশক্তিদের আনাগোনা ঘটে। মৃত বন্দীদের লাশ টানেলের মাথার লোহার গেট খুলে ওদিকে ফেলে দেওয়া হয় পিশাচদের কাছে। আর এসব কাজ খোদ জমিদার বাবুর তদারকিতে সম্পন্ন হয়। কারণ ওদিকের তালার চাবি

শুধুমাত্র তাঁর কাছেই থাকে। ওই গেটের ওপারে কি আছে না আছে, সে খবর কারও জানা ছিল না। জমাট অন্ধকারে ঠাহর হত না কিছুই। তবে জল্পনা-কল্পনা চলত যে ওদিকে বাঘজাতীয় কোন মাংসাশী জানোয়ার বা পিশাচ-টিশাচ থাকতে পারে। কারণ গেটে তালা দিয়ে আসার পর পর শোনা যায় কোন ক্রুদ্ধ প্রাণীর গররর আওয়াজ। মাংস ও হাড় কামড়ানোর শব্দ। তবে সেই হিংস্র প্রাণীটি কি, তা দু'একজন ছাড়া অন্য কারও জানা ছিল না।

আগেই বলেছি আমি খুব শক্তিশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলাম। সেকারণে জমিদারবাবু আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তাঁর আদেশে আমি বহুবার বন্দীশালার ভিতরে যাওয়া-আসা করেছি। যখনই গেট পার হয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকতাম, সেসময় দু'জন মশালধারী আমার পাশেপাশে থাকত। তাদের মশালের আলোয় সারাটা বন্দীশালা ঘুরে ঘুরে দেখতাম। তবে ওমাথার লোহার গেট পর্যন্তই ছিল আমার সীমানা। সেই তালাবন্ধ গেট খুলে ওদিকে যাওয়ার কোন এখতিয়ার ছিল না কারও—আমারও নয়। মশালের স্বল্প আলোয় গেটের ওপাশে তেমন কিছু নজরে পড়েনি আমার। তবে মনে মনে একটা অনুমান করেছিলাম। জানতাম পিছন দিকে নদী আছে। সুতরাং সুড়ঙ্গপথ বেয়ে হয়তো কুমীর এসে বন্দীদের মৃতদেহ খেয়ে যায়।

যাই হোক, আমি একদিন এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে এক কৌশল অবলম্বন করলাম। ওই দিন বিকেলে একজন বন্দীকে নিয়ে বন্দীশালায় রেখে আমি আর উপরে গেলাম না। একটা মশাল নিয়ে সারাটা বন্দীশালা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। যে দু'চারজন বন্দী আটক ছিল, তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। অর্ধোন্মাদ অবস্থায় তারা পড়ে আছে নিজ নিজ ঘরের কোনায়। প্রতিটি ঘরের সামনে লোহার শিক দেওয়া একটি করে দরজা। সবগুলো দরজা আলাদা আলাদা ভাবে তালাবন্ধ। বন্দীরা আমাকে

মশাল হাতে ঘুরতে দেখে তেমন কৌতূহলী হলো না। তবে যে বন্দীকে নতুন করে আটক করেছিলাম, সে আমাকে গালি দিয়ে ও শাপশাপান্ত করে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ল। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ পারা যায়? শেষ পর্যন্ত একসময় নিস্তেজ হয়ে বসে পড়ল ঘরের কোনায়। আমিও বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে টানেলের শেষ প্রান্তে তালাবন্ধ লোহার গেটে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করলাম।

চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। একমাত্র মশালের মিটমিটে আলোয় সামান্য স্থান আলোকিত। তখন বিকেল না সন্ধ্যা বোঝা মুশকিল। বন্দীশালা নিস্তব্ধ। শুধু কোথায় জানি প্রাচীন এক তক্ষকের তক্‌খ তক্‌খ ডাক শোনা যাচ্ছে। এমন পরিবেশে মনটা দুর্বল হয়ে যায়। আমিও কেমন জানি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। হঠাৎ করে টানেলের নদীর প্রান্ত থেকে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ ভেসে এল। কে যেন পানিকাদা ভেঙে এগিয়ে আসছে গেটের দিকে। সঙ্গে চাপা গররর শব্দ, যেন কোন হিংস্র জন্তুর ক্রুদ্ধ গর্জন।

এবারই প্রথম ভয় পেলাম আমি। একটু পিছিয়ে এলাম গেটটা ছেড়ে। মশালটা উঁচু করে ধরে গেটের ওধার থেকে কে আসছে দেখার চেষ্টা করলাম লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে। ছপ্‌ ছপ্‌ ছপ্‌–শব্দটা ক্রমেই কাছিয়ে আসছে। সেই সাথে চাপা গর্জনটা আরও কর্কশ ও আরও উগ্র হয়ে কানে লাগছে। আমি তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছি অসীম কৌতূহল নিয়ে। কি আসছে, কে জানে। মনে মনে ভয় পেলেও ভরসা ছিল যে লোহার গেটটা ভিতর থেকে তালাবন্ধ। কোন জন্তুজানোয়ারের পক্ষে ভাঙা সম্ভব নয়।

টানেলের বাঁকা অন্ধকার জায়গাটা পার হয়ে আসতেই মশালের স্বল্প আলোয় দেখা গেল তাকে। আবছা অন্ধকারে একটা জমাট অন্ধকার। মানুষের মূর্তির মত দেখতে। হেলে দুলে এদিকে আসছে মূর্তিটা। আমাকে দেখে ক্রুদ্ধ কর্কশ স্বরে আওয়াজ তুলে

প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে লোহার দরজায় আঘাত করল। সেই আঘাতে ঝনঝন করে কেঁপে উঠল পুরনো দরজাটা। আমি ভয় পেয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেলাম এবং স্তব্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করলাম মূর্তিটাকে। মশালের আলোয় বেশ ভালভাবেই দেখা যাচ্ছিল তাকে। ভয়ংকর, বীভৎস এক নরপশু। মানুষের দেহধারী হলেও তার সারা মুখে, বুকে, পিঠে ঘন পশম। জটার মত ঝাঁকড়া চুল। হাতদুটো লোমশ এবং গরাদের মধ্য দিয়ে তা বাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে ধরার জন্যে। হাতের আঙুলে লম্বা লম্বা তীক্ষ্ণধার নখ। চোখদুটো অন্ধকারে বিড়ালের মত জ্বলছে। বড় বড় ধারাল দাঁত-ঝক্ঝক্ করছে। মূর্তিটা প্রচণ্ড রাগে তীক্ষ্ণ গর্জন তুলে কাঁপিয়ে দিচ্ছে বন্দী শালা। ভয়ংকর, বড় ভয়াবহ সেই দৃশ্য।

এক মুহূর্তে বুঝলাম এ মানুষ নয়-পিশাচ। যেভাবে প্রচণ্ড শক্তিতে সে লোহার গেট ধরে টানছে তাতে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। পুরনো গেট, যে কোন মুহূর্তে খসে পড়তে পারে। তারপর সেই ভয়ংকর দানবের সাথে মোকাবেলা করা অসম্ভব ব্যাপার। আমি দ্রুত টানেলের অপরপ্রান্তে ছুটে গেলাম, যেখানে দারোয়ান মোটু সিং পাহারা দেয়। লোহার গেটের ওপাশে বসেছিল সে। আমাকে এভাবে ভিতরে দৌড়ে আসতে দেখে অবাক হলো প্রথমে। ইতিমধ্যে পিশাচটার গর্জন ভেসে এসেছিল তার কানে। কিন্তু তাতে তেমন কোন ভাবান্তর দেখা গেল না তার। শুধু বলল-পিশাচটাকে খেপিয়ে ভাল করোনি মিশিরজী। আজ ওকে খাবার না দিলে ঝামেলা বাধাবে। বলেই মিশিরজী গেট খুলে আমাকে বাইরে বের করে এনে গেটে আবার তালা লাগিয়ে দিল। আমিও সরাসরি ফিরে গেলাম নিজের ঘরে।

এর পরের ঘটনাটা অপর একজন বন্দীর কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম। বড় মর্মান্তিক সে ঘটনা। আমি পালিয়ে যাওয়ার পর পিশাচটা আরও খেপে যায় ও ঘন ঘন লোহার গেটটা ঝাঁকাতে থাকে। এক পর্যায়ে ঝন ঝন করে ভেঙে পড়ে গেট। ভিতরে

প্রবেশ করে দানবটা। মশালের সেই আবছা আলো-অন্ধকারে, ভয়ংকর মূর্তিটা সেই বন্দীকে ধরার জন্যে লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়। বন্দী সতর্ক ছিল। তার থাবা এড়িয়ে ঘরের কোণে সরে গিয়ে থরথর করে কাঁপছিল সে তখন। আর ব্যর্থ দানবটা হুঙ্কার দিয়ে কাঁপিয়ে তুলছিল বন্দীশালা।

এ অবস্থা যে কতক্ষণ ধরে চলত বলা যায় না। এক সময় প্রধান দরজা খুলে জমিদারবাবু ও দুজন দারোয়ান মশাল হাতে ঢুকল বন্দীশালায়। পিশাচটা তাদের দেখে পিছিয়ে গেল এবার। জমিদারবাবু ধমক দিতে থাকলেন, যাহ্, যাহ্ ভাগ এখান থেকে। ওদিকে যা, তোকে খেতে দেব, যা। এভাবে ধমক দিয়ে সেই পিশাচটাকে আবার পিছনের টানেলে তাড়ালেন জমিদারবাবু। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে তখনও গর্জন করছিল। শেষ পর্যন্ত জমিদারবাবুর নির্দেশে দারোয়ান দু'জন একটা ঘর থেকে মুমূর্ষু একজন বন্দীকে বের করে এনে সুড়ঙ্গের মধ্যে ফেলে দিয়ে এল পিশাচটার কাছে।

সাথে সাথে শোনা গেল পিশাচটার পৈশাচিক উল্লাস ও গর্জন। সেইসঙ্গে ভেসে এল হতভাগ্য বন্দীর মরণ আর্তনাদ। একসময় সেই গর্জন ও আর্তনাদ দূরে মিলিয়ে গেল। সেই রাতেই রাজমিস্ত্রি এল। গেটটাও নতুন করে গাঁথা হয়ে গেল আবার। সবকিছু যেমন ছিল, তেমনই রইল। যেন কোথাও কিছু ঘটেনি।

এ পর্যন্ত বলেই দ্রুত উঠে গেলেন মিশিরজী। ট্রেন ইন্ করছে প্লাটফর্মে। আমি ব্যাগটা কাঁধে ফেলে হাজির হলাম নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে। ওখানেই আমাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি। কাহিনীরও সেখানেই শেষ। তবে এখনও গভীর রাতে নির্জনে হাঁটতে হাঁটতে মিশিরজীর ঘটনাটা মনে পড়লে শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

এহসান চৌধুরী

সাপ

কার্সটেয়ার্সকে আমি ভালমত চিনতাম না, যদিও আমার নিকটতম প্রতিবেশী ছিল সে। হঠাৎ মাঝেমধ্যে দেখা হয়ে গেলে আমাকে তার বাড়িতে আড্ডা দেবার জন্যে যেতে বলেছে। সেবার উইকএন্ডে জ্যাকসন নামে আমার এক সঙ্গীকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, ভাবলাম যাই একবার।

জ্যাকসন একজন ইঞ্জিনিয়ার। আমার ফার্মের আমন্ত্রণে একটা খনির উপর রিপোর্ট তৈরি করতে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এসেছে। আমাদের মিল খুব কম, তাই কথাবার্তাও ফুরিয়ে আসছিল।

আমাদের দেখে খুব খুশি হলো কার্সটেয়ার্স। চাকরবাকর নিয়ে এখানে একা থাকে সে। এরকম বিশাল বাড়ি তার কী জন্যে দরকার হলো ভেবে পেলাম না। অবশ্য এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল সে, গল্প করার জন্যে আরাম করে আমরা চেয়ারে বসলাম।

আমি জানতাম কার্সটেয়ার্স টাকা করেছে খনির ব্যবসা করে, কিন্তু কখন বা কোথায় তা জানতাম না। যা হোক, সে তরুণ জ্যাকসনের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়িই জমিয়ে ফেলল, আলোচনা করতে লাগল খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে। এ ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ ছিল না, তাদেরকে কথা বলতে দিয়ে আমি চুপচাপ ড্রিংক করতে লাগলাম। ওদের কথা অস্পষ্টভাবে কানে আসছিল। বাগানের গাছে বসে মিষ্টি সুরে ডাকছিল ছোট ছোট পাখিরা।

ঘটনার সূত্রপাত ঘটাল একটা বাদুড়। আপনারা জানেন, গ্রীষ্মের রাতে জানালা খোলা পেলে ওরা নিঃশব্দে ভেতরে উড়ে আসে। ওরা নোংরা বটে, তবে ক্ষতিকর নয়। কিন্তু কার্সটেয়ার্সের মত বিশালদেহী লোকটা এত ভয় পেল, জীবনে এমন ভয় পেতে আর কাউকে দেখিনি।

'ওটাকে বের করে দিন!' চিৎকার করে বলল সে। 'ওকে তাড়ান।' এই বলে সোফার কুশনের ভেতর তার টাক মাথাটা ঢুকিয়ে দিল।

হেসে ফেললাম আমি। বললাম, এটা নিয়ে অযথা অস্থির হবার কিছু নেই। তারপর আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

বাদুড়টা ঘরের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে একবার কি দুবার আঁকাবাঁকাভাবে উড়ল, তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি চুপচাপ খোলা জানালা পথে বেরিয়ে গেল।

কার্সটেয়ার্স যখন কুশনের নিচ থেকে মাথাটা তুলল, তার প্রকাণ্ড লাল মুখটা পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে। 'ওটা চলে গেছে?' আতঙ্কিত গলায় ফিসফিস করে বলল সে।

'হ্যাঁ, চলে গেছে,' তাকে আশ্বস্ত করলাম আমি। 'যে কাণ্ড ঘটালেন, তাতে মনে হচ্ছিল ওটা যেন এক শয়তান।'

'সম্ভবত তাই,' গম্ভীরভাবে বলল সে। উঠে বসতেই দেখলাম তার বড় বড় সাদা চোখ দুটোর নীল মণি চকচক করছে। তাকে এরকম প্রচণ্ড ভয় পেতে না দেখলে আমি হয়তো হেসেই ফেলতাম।

'জানালাগুলো বন্ধ করুন,' চড়া গলায় বলল সে। সরে গিয়ে হুইস্কি নিয়ে ঢক ঢক করে গিলে ফেলল। এমন রাতে এই ঘটনা যদিও খুব খারাপ লাগছিল, কিন্তু এটা ওর বাড়ি। তাই জ্যাকসনও তাকে অনুসরণ করল।

এমন সীন ক্রিয়েট করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল কার্সটেয়ার্স। আমরা আবার আরাম করে বসলাম।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচনা স্বাভাবিক ভাবেই ডাকিনী বিদ্যা এবং ভৌতিক বিষয়ের দিকে এগোল।

জ্যাকসন বলল ব্রাজিলের জঙ্গলে এরকম কিছু কিছু অদ্ভুত গল্প সে শুনেছে। তবে তার কথা শুনে প্রভাবিত হলাম না। কারণ নামটা ইংরেজের হলেও তাকে দেখতে আধা পর্তুগিজের মত লাগে, আর পর্তুগিজরা সব সময় এরকম আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস করে।

কিন্তু কার্সটেয়ার্সের কথা ভিন্ন; সে একজন ব্রিটিশ, এবং সে যখন আমাকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল আমি ব্ল্যাক ম্যাজিকে বিশ্বাস করি কিনা–হাসলাম না, তার মতই গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, বিশ্বাস করি না।

'তাহলে আপনি ভুল করছেন,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে। 'আমি বলছি, এই ব্ল্যাক ম্যাজিক যদি না থাকত তা হলে এই জায়গায় আমি বসে থাকতে পারতাম না।'

'আপনি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নন,' আপত্তি জানালাম আমি।

'অবশ্যই সিরিয়াস,' বলল সে। 'তেরো বছর ধরে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছি, সেদিন আমি ছিলাম এক হতভাগ্য শ্বেতাঙ্গ। শব্দটার মানে আশা করি জানেন। যদি না জানেন–বেশ, এটা হলো পৃথিবীতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করা। একটার পর একটা পচা চাকরি করেছি, যে বেতন পেয়েছি তাতে শরীরে কোনমতে প্রাণ ধরে রাখা যেত। হাতে কিছুই থাকত না। একটু মদ কিংবা খাবারের জন্যে ওদেশের কালোমানুষদের সাথে বন্ধুর মত মিশতাম। দুনিয়ায় মাথা তুলে দাঁড়াবার মত সামর্থ্য আমার ছিল না, কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ সবাই আমাকে অবজ্ঞা করত। হয়তো এভাবেই আমার বাকি জীবনটা কাটত, কিন্তু তার পরেই আমি ব্ল্যাক আর্টের সংস্পর্শে আসি। ওটা আমাকে প্রচুর টাকা এনে দেয়। সেই টাকা দিয়ে আমি ব্যবসা শুরু করি। সেটা বাইশ বছর আগের কথা–এখন আমি একজন ধনী মানুষ, তাই

বাকি জীবনটা বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে কাটাতে চাই।'

কার্পেন্টার্সের প্রতিটা কথা ছিল স্পষ্ট। স্বীকার করছি খুব হতবাক হয়ে পড়েছিলাম আমি। তারমধ্যে স্নায়ু বৈকল্যের কোন লক্ষণ নেই। সে একজন বলিষ্ঠ, নীরস, ইংরেজ বংশোদ্ভুত। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আপনি এধরনের লোকই পছন্দ করবেন। তাই একটা বাদুড় দেখে তার প্রচণ্ড ভয় পাওয়াতে আমি বিস্মিত হলাম।

'আমার এতে বিশ্বাস নেই,' বললাম আমি। 'এর কারণ হয়তো আমি কখনও ব্ল্যাক আর্ট সংক্রান্ত কোন ঘটনা ঘটতে দেখিনি। আপনি কি এ সম্পর্কে আরও কিছু বলবেন আমাদের?'

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কার্পেন্টার্স। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'ইচ্ছে করলে আরেক পেগ নিতে পারেন আপনারা।'

আমরা আমাদের গ্লাস ভর্তি করে নিলাম, আর সে বলতে শুরু করল: ''আমি যখন বলেছিলাম, বাদুড়টা শয়তান হতে পারে, আমি পুরোপুরি তা বোঝাতে চাইনি। হতে পারে কিছুলোক শয়তানকে রাগিয়ে তুলতে পারে—আমি জানি না, নিজের চোখে কখনও দেখিনি। কিন্তু জগতে শয়তানের অশুভ শক্তি বিচরণ করে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়। কিছু কিছু প্রাণী এই অশুভ শক্তিকে ধারণ করতে পারে। বিড়ালের কথাই ধরুন—ওরা অসামান্য প্রাণী, অন্ধকারে দেখতে পায়, সব কিছু করতে পারে; দিনের বেলা আমরা যা দেখতে পাই না তাও ওরা অন্ধকারে দেখে। হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, ওরা ঘরের মধ্যে কোন এক অদৃশ্য বস্তুকে ঘিরে ঘুরতে থাকে।

এই জন্তুগুলো ক্ষতিকর নয়, কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন অশুভ মানুষের ইচ্ছা শক্তিতে পরিচালিত হয়ে ওরা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। যাহোক, যেকথা বলছিলাম। আপনাদের বলেছিলাম তেরো বছর ধরে আমি ঘুরেছি। ডারবান থেকে ডামারাল্যান্ড,

অরেঞ্জ রিভার থেকে মাটাবের। ফলবিক্রেতা, খনি-শ্রমিক, সেলসম্যান, মালগাড়ির খালাসী, কেরানী—যখন যে কাজ পেয়েছি করেছি। একসময় আমি সোয়াজিল্যান্ডে পৌঁছলাম। জায়গাটা লরেনকো মারকুয়েস এবং ডেলাগোয়া উপসাগরের কাছে পর্তুগিজের পুব সীমান্তে অবস্থিত। মনোরম সৌন্দর্য। বর্তমানে ওটা আদিবাসীদের জন্যে সংরক্ষিত এলাকা হলেও সে সময়ে কিছু ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ বিক্ষিপ্তভাবে বাস করত।

যাহোক, সেসময়ে এম্ব্যাবেন-এ একটা সেলুন ছিল। ওখানে গিয়ে বুড়ো বেনি আইজ্যাকসনের সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে একটা চাকরির প্রস্তাব দিল সে। যদিও তার মত ভয়ঙ্কর লোক আমি জীবনে দেখিনি, তবু তখন বেকার ও কপর্দকহীন ছিলাম বলে চাকরিটা নিলাম। বিরাট আকৃতির লোক ছিল সে। মাথায় তেল চপচপে কোঁকড়ানো কালো চুল, বড়শির মত বাঁকানো বিশাল নাক। মুখটা তুর্কি মোরগের মত লাল, তার ধূর্ত কালো চোখদুটোতে কুটিলতা। সে বলল, তার স্টোরকীপার হঠাৎ করে মারা গেছে। কথাটি এমনভাবে বলল, আমার সন্দেহ হলো। কিন্তু তখন আমার সামনে দুটো পথ—হয় বেনির চাকরিটা গ্রহণ করা, নয়তো ঘরে ঘরে ভিক্ষে করা। সুতরাং আমি তার সাথেই গেলাম।

কয়েক মাইল পথ হাঁটিয়ে আমাকে তার গুদামে নিয়ে গেল সে। সব মিলিয়ে ওখানে দু'টিন সার্ডিন ছিল, আর ছিল একটা মরা ইঁদুর। তার মনে সন্দেহ ঢুকতে পারে, এমন কোন কৌতূহল দেখলাম না। কারণ আমি শুধু এটুকু জেনেছি যে আমার পূর্বসুরি মারা গেছে এবং সম্ভবত কৌতূহল প্রকাশ করার জন্যেই।

কিছুদিনের মধ্যেই তার আস্থাভাজন হয়ে উঠলাম। তার ব্যবসার কিছু কিছু গোপন কথা আমাকে বলতে শুরু করল সে। পর্তুগিজ সীমান্তের ওপারে সে অবৈধ অস্ত্র আর মদের চোরাকারবার করে। খদ্দেররা সবাই কৃষ্ণাঙ্গ। ওখানে শ্বেতাঙ্গ

পলাতে কেবল একজনই ছিল, সে হলো রেবেকা–বেনির স্ত্রী।

আমি তার হিসেবপত্র দেখাশোনা করতাম–যদিও সবই ছিল ভুয়া। ব্রাউনসুগার বলতে বোঝাত পাঁচটার মধ্যে দুটো ডামি বুলেট, হোয়াইট বলতে বোঝাত তিনটে। এই ডামিগুলো ছিল কার্ডবোর্ডে আঁকা, দেখতে অবিকল আসল কার্তুজের মত। এভাবে লাভ করত সে। যাহোক, বেনি তার খতিয়ান বইয়ের সাংকেতিক ভাষা ভালই বুঝত।

সে কখনও আমার সাথে দুর্ব্যবহার করত না। তবে গ্রীষ্মের এক রাতে তার সাথে একটু কথা কাটাকাটি হলো। আমাকে বিশাল লাল মুঠির এক ঘুসিতে শুইয়ে ফেলল সে। এরপর থেকে যখনই বুঝতাম যে আমার মেজাজ চড়ে যাচ্ছে–বিশেষ করে যখন দেখতাম নিগ্রোগুলোর সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে, তখন নিজেকে সামলাতে বেশ খানিকটা হাঁটাহাঁটি করতাম। এর মানে এই নয় যে আমি অল্পে কাতর হই, কিন্তু তার আচরণে যে কারও মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে।

যখন আমি ওর ব্যবসার মধ্যে পুরোপুরি ঢুকে পড়লাম, দেখলাম ওর ব্যবসা শুধু অস্ত্র ও মদ নিয়েই নয়। বেনি একজন মহাজন। নিজের এই অভিষ্ট সাধনের জন্যে ব্ল্যাক আর্টের মুখোমুখি হয়েছিল সে।

আদিবাসী জাদুকর উমটঙ্গার সাথে বেনির লেনদেনের শুরু হয়েছিল কিভাবে, আমি তার কিছুই জানি না। বুড়ো শয়তানটা মাঝে-মধ্যে আমাদের কাছে আসত ঝিনুকের কড়ি আর চিতাবাঘের দাঁতের মালা পরে। বেনি সব সময় তাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা দিত। উমটঙ্গা মাতাল হয়ে অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে মদ খেত ওরা, তারপর উমটঙ্গাকে তার নিজের লোকেরা বয়ে নিয়ে যেত। এই বুড়ো পাপিষ্ঠ তার গোত্রের অবশিষ্ট কুমারী মেয়েদের ধরে এনে বেনির কাছে বেচে দিত, আর বেনি তাদেরকে চালান করে দিত পর্তুগিজের পুব অঞ্চলে। এছাড়া

যেসব দুর্ভাগা লোক বেনির হাতের মুঠোয় ছিল এবং যারা দেনা শোধ করতে পারত না, বেনি তাদের স্ত্রীদেরও চালান করে দিত।

আমি ওখানে স্থায়ী হবার প্রায় ন'মাস পর ঝামেলাটা শুরু হলো। বুড়ো উমটঙ্গা ছিল খরুচে স্বভাবের। গোত্রের মধ্যে কুমারী মেয়ের সংখ্যা কমতে লাগল। ফলে বেনির কাছ থেকে টাকা ধার নেয়া শুরু করল সে, কিন্তু তারপর ধার আর শোধ করতে পারত না। এরপর থেকে দুজনের সাক্ষাৎটা আর আগের মত মধুর রইল না–শান্তভাবে চলে যেত উমটঙ্গা, যাবার সময় দোলাতে থাকত তার হাতের বড় কালো লাঠিটা।

এতে উদ্বিগ্নবোধ করত না বেনি। আগের লোকেরা তাকে হুমকি দেয়া শুরু করলে উমটঙ্গাকে সে জানিয়ে দিল যদি সে পর্যাপ্ত কুমারী মেয়ে জোগাড় করতে না পারে তাহলে তার নিজের স্ত্রীদেরকে যেন বিক্রি করে দেনা শোধ করে। আমি কখনও তাদের আলোচনায় উপস্থিত থাকতাম না, কিন্তু বেনি যখন মাঝেমাঝে জোর গলায় কথা বলত তা আমার কানে আসত।

একদিন উমটঙ্গা তিনজন মহিলাকে নিয়ে এল। এটা তার মূল দেনার সমান হয় বটে, কিন্তু বেনি এক বিশেষ পদ্ধতিতে টাকা ধার দিত। তার কাছে আসলটাই সব নয়–ধার শোধ করতে দেরি হলে সুদের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। ত্রিশজন মহিলা চাইল বেনি, তার মতে ত্রিশজন মহিলা পেলে উমটঙ্গার সব দেনা শোধ হয়ে যাবে।

বুড়ো জাদুকর শান্ত ও স্থির থাকল। বাইরে দেখে তার ভেতরটা বোঝা গেল না। সন্ধ্যার দিকে এসেছিল সে, কুড়ি মিনিটের বেশি ছিল না। দেয়ালটা পাতলা ছিল, তাই সব কথাই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। সে বেনিকে তিনজন মহিলা, অথবা সকালের আগেই মৃত্যুবরণের প্রস্তাব দিল।

বেনি বুদ্ধিমান হলে এই প্রস্তাব মেনে নিত। উমটঙ্গাকে

আস্তানাগ্রামে যেতে বলল সে। এবং উমটঙ্গা আর কিছু না বলে চলে গেল।

বাইরে তার লোকেরা অপেক্ষা করছিল, প্রায় এক ডজন। জাদুর খেলা দেখাতে এগোল সে। ওরা তার হাতে একটা জ্যান্ত কালো মোরগ ও একটা সাদামোরগ দিল। উঠনে বসে পড়ল উমটঙ্গা, তারপর অদ্ভুত ভাবে মোরগ দুটোকে মেরে ফেলল।

সযত্নে ওদের কলিজাগুলো পরীক্ষা করল সে, তারপর নিতম্বের ওপর বসে পেছনে ও সামনে দুলতে শুরু করল। এবং ভাঙা গলায় অদ্ভুত, একটানা সুরে মন্ত্র পড়ে চলল। অন্যরা মাটিতে শুয়ে পড়ল, তারপর একের পর এক উপুড় হয়ে উমটঙ্গাকে ঘিরে ধরে মোচড় খেতে লাগল। এভাবে আধঘণ্টা থাকল, তারপর বুড়ো জাদুকর নাচতে শুরু করল। দেখলাম তার লাফ দেয়া ও ঘুরে ওঠার সাথে সাথে বানরের লেজের তৈরি বেল্টটা ওর চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। কেউ চিন্তাও করতে পারবে না যে এই রোগা বুড়ো জংলীটার গায়ে এমন নাচের শক্তি রয়েছে।

তারপর হঠাৎ করে তার খিঁচুনি শুরু হলো—পুরোপুরি শক্ত হয়ে গেল সে, এরপর সোজা মাটিতে পড়ল মুখ থুবড়ে। যখন লোকজন তাকে চিৎ করে শোয়াল, দেখলাম মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। ওরা তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ততক্ষণে চারপাশটা গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।

এসব জায়গায় বেশিরভাগ লোক প্রাকৃতিক ঘড়ি অনুসারে কাজকর্ম করে। তাই সন্ধে হবার সাথে সাথে রেবেকা, বেনি ও আমি রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। বেনিকে কিছুটা চিন্তিত মনে হলো, অবশ্য সেই পরিস্থিতিতে আমি যতটা হলাম তার চেয়ে বেশি নয়। খাওয়া শেষ হলে সারাদিনের ব্যবসার হিসাবপত্র দেখতে অফিস ঘরে ঢুকল সে। প্রত্যেকদিনই সে এটা করে। আর

আমিও শুতে চলে গেলাম।

রাত প্রায় দুটোর দিকে বুড়ি মহিলাটা আমাকে ঘুম থেকে ওঠাল। ব্যাপারটা হলো–সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘুম ভাঙার পর দেখে বেনি বিছানায় ঘুমোতে আসেনি, তাই আমাকে ডাকতে এসেছে। বেনিকে খুঁজতে যেতে হবে।

আমরা চালাঘরের মধ্য দিয়ে এগোলাম। দেখতে পেলাম অফিসের চেয়ারে বসে আছে বেনি, বিস্ফারিত চোখ দুটো স্থির, দু'হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে ধরা। মনে হচ্ছে কিছু একটা দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল সে। দেখতে কখনোই সুন্দর ছিল না বেনি, আর এখন তার কালো মুখটা আরও ভয়ঙ্কর লাগছে। মনে হলো কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেছে সে।

রেবেকা তার স্কার্টটা মাথা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলল, তারপর চিৎকার করে কেঁদে সারা বাড়ি তোলপাড় করে তুলল। ওকে ঘরের বাইরে এনে আবার ভেতরে ঢুকলাম আমি অনুসন্ধান করতে–কে বেনি আইজ্যাকসনকে খুন করতে পারে? সেদিন ঠিক আপনাদের মতই একমুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করতে পারিনি যে দাঁতহীন বুড়ো হাবড়া উমটঙ্গার দূর থেকে কাউকে খুন করার ক্ষমতা রয়েছে।

তন্নতন্ন করে রুমটা পরীক্ষা করলাম আমি। কিন্তু কোন মানুষের জোরে করে ঢোকা কিংবা উপস্থিত থাকার চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। খুব ভাল করে বেনির মুখটা দেখলাম, মনে হলো হঠাৎ আতঙ্কের ফলে ওর হৃৎক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কারণটা কী? সে নিশ্চয় এমন কিছু দেখেছিল যা সত্যিই ভয়ঙ্কর। তখনও আমি জানতাম না যে এর দু'এক সপ্তাহের মধ্যে আমি নিজেই ওই জিনিসটা দেখব।

পরদিন বেনিকে কবর দেয়া হলো। ওখানকার প্রথা অনুযায়ী মহিলারা চিৎকার করে চলল আর পুরুষদের দেয়া হলো অঢেল মদ। দেখে মনে হলো আফ্রিকার অর্ধেক মানুষই ওখানে হাজির

হয়েছে। আপনারা জানেন, কালো মানুষের দেশে রহস্যজনক খবরগুলো খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে।

উমটঙ্গাকে দেখা গেল। তার চেহারায় অনুতাপ কিংবা আনন্দের কোন ছাপ ছিল না। সে তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টিতে। জানি না এ কাজ সে কিভাবে ঘটাল। তার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ হলো, আগের রাতে সে দুর্বোধ্য আচার অনুষ্ঠান করেছে। কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কের কোন ইউরোপিয়ান এটাকে মৃত্যুর প্রমাণ হিসাবে গণনা করবে না। মনকে বোঝালাম পুরো ব্যাপারটা আশ্চর্যজনকভাবে কাকতালীয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হবার পর আমার কাছে এল সে। তার লাঠিটা ফেরত চাইল। বলল, ওটা সে গতরাতে বেনির অফিসে ফেলে গেছে।

সবসময় তার কাছ থেকে দূরে থাকতাম আমি। কিন্তু তার লাঠিটাকে আমি ভালমত চিনি। তাই ওটা আনতে ভেতরে গেলাম।

মেঝের উপর পড়েছিল ওটা। চারফুট লম্বা সাপ লাঠি। এরকম লাঠি আপনারা দেখেছেন, তবে এটা ছোট আকৃতির। এসব লাঠি ভারী কাঠ খোদাই করে তৈরি, সাপের মত আকৃতি। সাপের মাথাটা হাতল, আর লেজটা দণ্ড। গায়ে আঁশের মত নকশা করা থাকে। উমটঙ্গারটা ছিল আরও সুন্দর। দেখতে চিকন হলেও সীসার মত ভারী। লাঠিটা কালো, মনে হলো আবলুস কাঠ খোদাই করে তৈরি করা। ওটা যে একটা চমৎকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারত তাতে সন্দেহ ছিল না। আমি ওটা তুলে নিলাম, তারপর একটি কথাও না বলে দিয়ে দিলাম ওকে।

প্রায় দশদিন ওকে দেখলাম না। রেবেকাও তার কান্না থামিয়ে ব্যবসায় মন দিয়েছে। মনে হয় বেনি তাকে ব্যবসার বিষয়ে সবকিছুই বলত, কারণ দেখতে পেলাম সে ব্যবসার সব কিছুই জানে। ঠিক হলো আমি তার ম্যানেজার হিসেবে কাজ করব।

কিছুদিন পর আমাদের মধ্যে উমটঙ্গার প্রসঙ্গ উঠল। আমি পরামর্শ দিলাম, লোকটার সুদের পরিমাণ খুব বেশি, আর একারণে লোকটা সত্যিকার অর্থে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই ওর সাথে মিটমাট করে ফেলা ভাল নয় কি? কিন্তু রেবেকা রাজি হলো না। মনে হলো ওকে আমি সুদ ছেড়ে দেবার পরামর্শ দেয়ায় যেন ওর চোখ ও দাঁত উপড়ে নেয়ার চেষ্টা করছি! সে ক্রুদ্ধভাবে আমার দিকে তাকাল।

'এতে তোমার কি?' চিৎকার করে বলল সে। 'আমার টাকার দরকার। আমার একটা ভবিষ্যৎ আছে—তার কথা ভাবতে হবে। একটা ছেলে পাঠিয়ে খবর দাও যে তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও। আর ও যখন আসবে, ওকে বলবে দেনা শোধ করে দিতে।'

এক্ষেত্রে আমার রাজি হওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না। দজ্জাল বুড়িটা কোন কোন ব্যাপারে বেনির চেয়েও খারাপ। পরদিন সকালে একটা ছেলেকে পাঠালাম এবং তার পরের দিন উমটঙ্গা এসে হাজির হলো।

আমি বেনির অফিসে ওর সঙ্গে কথা বললাম, ওর সঙ্গীটি বাইরে অপেক্ষা করছিল। আমি বসেছিলাম বেনির চেয়ারে—যেটাতে বেনি মারা গিয়েছিল—আমি দেরি না করে কথাটা পাড়লাম।

ও বসে কয়েক মিনিট স্রেফ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর কোঁচকানো মুখটা শুকনো পচা ফলের মত দেখাচ্ছিল। চোখ দুটোতে হিংস্র আগুন। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি খুব সাহসী।'

'না,' বললাম আমি। 'শুধু ব্যবসার খাতিরে...'

'তুমি জানো তোমার বুড়ো মনিবের কি ঘটেছে। সে মরেছে। তুমিও কি মহান শয়তানের কাছে যেতে চাও?'

ওর স্থির চাউনির মধ্যে অশুভ কী যেন ছিল বীভৎস,

বিব্রতকর। কিন্তু পাত্তা দিলাম না। বললাম, হয় তাকে পাওনা টাকা ফেরত দিতে হবে অথবা তার সমমূল্যের অন্য কোন জিনিস দিতে হবে।

'তুমি উমটঙ্গার সাথে ব্যবসা করার কথা ভুলে যাও,' আমাকে পরামর্শ দিল সে। 'তুমি অন্যলোকদের সাথে ব্যবসা করো। ভুলে যেও না, উমটঙ্গা খারাপ জাদু জানে। তুমি মরবে।'

কথা হলো, ব্যবসাটা আমার ছিল না–ছিল ওই বুড়িটার। তাই আমি চাইলেও ওকে ছেড়ে দিতে পারি না। অতএব ওর কথার সেই একই উত্তর দিলাম, যে উত্তর সে বেনির কাছ থেকেও পেয়েছিল।

তাকে আমি বেনির বন্দুকটা দেখালাম। বললাম, কোন নোংরা চালাকি করতে দেখলেই গুলি করব। আমার কথার উত্তরে শুধু হাসল সে। অমন শয়তানের হাসি আমি আজ পর্যন্ত কোন মানুষের মুখে দেখিনি। তারপর বেরিয়ে গেল সে। বাইরের দেহরক্ষীর সঙ্গে যোগ দিল।

এরপর সেই একই দুর্বোধ্য ভেলকি বাজির পুনরাবৃত্তি হলো। দুটো কালো ও সাদা মোরগকে মারা হলো। লোকগুলো উপুড় হয়ে মোচড় খেলো। আবার সেই অচেতন হওয়া পর্যন্ত উমটঙ্গা নেচে চলল। তারপর তারা তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকার নেমে এল। অস্বস্তিবোধ করছিলাম আমি। বেনির সেই রক্তবর্ণ মুখ আর বিস্ফারিত চাউনির কথা মনে পড়ছিল।

বুড়ি ডাইনীটার সাথে রাতের খাবার খেলাম, তারপর ঢুকলাম বেনির ঘরে। এসময়ে সামান্য মদ খাই আমি, কিন্তু সেদিন সতর্ক হলাম–মদ নিলাম না। স্থির করলাম, সারারাত সজাগ থাকব। আমার ধারণা হয়েছিল যে উমটঙ্গার লোকদের কেউ একজন বেনিকে মারার জন্যে কিছু একটা করেছিল–সম্ভবত বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল তার মদে।

ঘরে ঢুকে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলাম। ঘরে এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে একটা ছোট বানর পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারে। তারপর সতর্কতার সাথে জানালাগুলো বন্ধ করলাম, প্রত্যেকটার গায়ে একটা করে চেয়ার ঠেস দিয়ে রাখলাম, যাতে ওগুলো নিচে না ফেলে কেউ জানালা খুলতে পারে। যদি আমার ঘুমও আসে তাহলে চেয়ার পড়ার শব্দে জেগে উঠব। আলোটা নিভিয়ে দিলাম যাতে আমাকে লক্ষ্য করে বর্শা বা তীর ছুঁড়তে না পারে। তারপর বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমি জীবনে এরকম দীর্ঘ আরেকটা রাত আর কখনোই চাই না। আপনারা জানেন, অন্ধকারে অদ্ভুত সব কল্পনা মনে আসে। ওই রাতে আমি যে কী কল্পনা করিনি তাই বলতে পারব না।

তৃণভূমি থেকে সামান্য শব্দ শুনলেই মনে হচ্ছিল এই বুঝি শত্রু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। সব সময় আমি সতর্ক ছিলাম। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যখনই ছায়ার মত কিছু দেখতে পেলাম অমনি গুলি চালালাম।

রাত প্রায় এগারোটার দিকে চাঁদ উঠল। চাঁদের আলো পরিবেশটাকে আরও অস্বাভাবিক করে তুলল। শুনেছি চাঁদের আলোয় অস্বাভাবিক শক্তিরা জেগে ওঠে। গরাদের ফাঁক দিয়ে মেঝের উপর ফালিফালি আলো এসে পড়ছিল। বারবার ফালিগুলোকে আমি গুনে যাচ্ছিলাম। মনে হলো ওই ঠাণ্ডা, রহস্যময় আলো সম্মোহিত করে তুলছে আমাকে। তাই এক ঝটকায় সিঁধে হয়ে বসলাম।

তারপরেই লক্ষ করলাম আমার সামনের টেবিলের উপর কিছু একটা পরিবর্তন ঘটেছে। বুঝতে পারলাম না কী সেটা—তবে বুঝলাম যে এখানে মাত্র কিছুক্ষণ আগে একটা কিছু ছিল যা এখন নেই।

হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম ওটা কি ছিল, আর তখন আমার

দু'হাতের তালু ঘামে ভিজে চটচটে হয়ে উঠল। উমটঙ্গা তার লাঠিটা আবার ফেলে গিয়েছিল–ঘরটা পরীক্ষা করার সময় ওটাকে আমি মেঝে থেকে তুলে টেবিলের উপর হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। আবছা অন্ধকারে শেষ তিনঘণ্টা ধরে ওটা আমার চোখের সামনেই ছিল–খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল–কিন্তু এখন ওটা নেই।

লাঠিটা পড়ে যায়নি, কারণ তাহলে আমি শব্দ শুনতে পেতাম–আমার চোখদুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। আমি উপলব্ধি করলাম, যেটাকে লাঠি ভেবেছিলাম সেটা লাঠি নয়।

আর তখন চাঁদের আলোয় ওটাকে দেখতে পেলাম। জিনিসটা সোজা হয়ে শুয়ে আছে, দেহে আট থেকে দশটা কুঞ্চিত রেখা নিয়ে, যেগুলোকে আমি এর আগে বহুবার দেখেছি। নিজেকে বোকা বলে মনে হলো, দেখলাম ওটা মোচড় খাচ্ছে।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম ওটার দিকে। নিজের চোখদুটোকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলাম। চাঁদের আলোতে দেখলাম মেঝের উপর ধীরে ধীরে ফণা তুলছে ওটা। একবার মনে হলো আমার চোখ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এক মুহূর্ত বন্ধ করলাম চোখ দুটো। যখন চোখ খুললাম, আতঙ্কের সাথে দেখলাম সাপটা তার মাথা তুলে রেখেছে।

আমার মুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়ল। এখন বুঝতে পারলাম বুড়ো বেনির কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল–এও বুঝলাম কেন তার মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল। উমটঙ্গার লাঠিটা মোটেই লাঠি নয়, ওটা আফ্রিকার সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ–এই সাপ বিদ্যুৎ গতিতে ছুটতে পারে এবং দ্রুতগতিতে ছুটে চলা ঘোড়াকে তাড়া করে তার আরোহীকে মেরে ফেলতে পারে। এই সাপ এমনই মারাত্মক যে ছোবল দেবার চারমিনিটের মধ্যেই আপনি মরে কাঠ

হয়ে যাবেন। আমার সামনে আফ্রিকার সেই কালো রঙের বিষধর সাপ—মামবা।

আমার হাতে রিভলভারটা ধরা ছিল, কিন্তু ওই অবস্থায় ওটাকে অপ্রয়োজনীয় খেলনা বলে মনে হলো—একশোবার গুলি করেও ওটাকে মারার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষেত্রে একমাত্র শটগানই কার্যকর, ওটা দিয়ে আমি সাপটার মাথা উড়িয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু বেনির ঘরে কোন বন্দুক থাকত না। তা ছাড়া, বোকার মত দরজা বন্ধ করে নিজেকে ওখানে আটকে রেখেছিলাম।

শয়তানটা আমার চোখের সামনে আবার নড়ে উঠল। লেজটা সোজা হয়ে টলতে টলতে গড়িয়ে যাচ্ছিল। এখন আর আমার কোন সন্দেহ রইল না যে উমটঙ্গা একজন দারুণ ওঝা—সাপ বশ করে। আর এই কুকর্মগুলোও করে জাদুর মাধ্যমে।

আমি ভয়ে নির্জীব হয়ে বসে রইলাম। হতভাগা বেনিও নিশ্চয় এভাবেই বসেছিল। মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম কিভাবে নিজেকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু আমার মাথা কোন কাজ করল না।

ঠিক এসময়ে একটা দুর্ঘটনা আমাকে রক্ষা করল। সাপটা যখন আমাকে ছোবল মারতে গেল, আমি লাফ দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেলাম। আমার পায়ে লেগে বেনির অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখার বেতের ঝুড়িটা ছিটকে পড়ল। শয়তানটা আমাকে ছেড়ে ওটার দিকে তেড়ে গেল। ওদের ছোবল মারার গতি ভয়ানক—হাতুড়ির বাড়ির মত কিংবা খচ্চরের লাথির মত। সাপের মাথাটা পরিষ্কার ভাবে ঝুড়িটার একপাশ দিয়ে ঢুকে গেল এবং আটকে গেল সেখানে; মাথাটা আর সে বের করতে পারল না।

আমার ভাগ্যটা ভাল ছিল। সেদিন আমি বেনির ড্রয়ারের কাগজপত্রগুলো পরিষ্কার করতে গিয়ে অনেক অপ্রয়োজনীয় কাগজ

ঝাঁড়ির মধ্যে ফেলেছিলাম, ফলে বেশ ভারী হয়ে উঠেছিল ওটা। যদিও উল্টে পড়ার সময় অল্পকিছু কাগজ ছিটকে পড়েছে, কিন্তু অবশিষ্ট যা ছিল তা মাম্বাকে আটকে রাখার জন্যে যথেষ্ট।

বিশাল চাবুকের মত সাপটা আছড়াতে লাগল, কিন্তু মাথাটাকে ছাড়িয়ে আনতে পারল না। একটা সেকেন্ডও নষ্ট করলাম না আমি, ওর লেজের উপর ভারী ভারী খতিয়ান বই চাপা দিতে লাগলাম। বাদুড়টাকে তাড়াতে আপনার যে সময় লেগেছে তার অর্ধেক সময়ের মধ্যেই আমি সাপটাকে কাবু করে ফেললাম। তারপর পিস্তলটা তুলে নিলাম। 'এইবার, সুন্দরী,' মনে মনে বললাম, 'তোমাকে বাগে পেয়েছি। এখনই তোমার মুণ্ডুটা আমি পুরোপুরি উড়িয়ে দেব—আর তোমার চামড়া দিয়ে সুন্দর একজোড়া জুতো বানাব।'

হাঁটু গেড়ে বসে রিভলভারটা তাক করলাম। সাপটা প্রাণপণে দু'বার আমার দিকে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু আমার এক ফুটের মধ্যেও আসতে পারল না—শুধু ঝুড়িটা নাড়াতে পারল।

আমি পিস্তলের নলটা ওর মাথার আঠারো ইঞ্চি দূরে এনে তাক করলাম। আর তখনই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমি ব্ল্যাক ম্যাজিকের পরিচয় পেলাম।

চন্দ্রালোকিত রুমটা অন্ধকারে ঢেকে গেল। অশুভ আলোটা ধীরে ধীরে বিলীন হলো আমার চোখের সামনে থেকে—সাপের মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল—ঘরের দেয়ালগুলো প্রসারিত হতে লাগল, আর সেইসাথে আমার নাকে এল আদিবাসীটার গায়ের অস্বাভাবিক কটু গন্ধ।

আমার মনে হলো আমি উমটঙ্গার কুটিরে দাঁড়িয়ে আছি। একমুহূর্ত আগে যেখানে সাপটা ছিল, দেখলাম সেখানে উমটঙ্গা ঘুমিয়ে আছে কিংবা বলতে পারেন অচেতন হয়ে পড়ে আছে। ওই দেশের প্রথা অনুযায়ী সে তার এক স্ত্রীর পেটের উপর মাথা রেখে শুয়েছিল। আমি তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম।

মনে হলো ওখানে কিছু নেই, আমি অন্যকিছু স্পর্শ করলাম–আর তারপরেই প্রচণ্ড আতঙ্কের সাথে উপলব্ধি করলাম যে আমার বাঁ হাতটা সেই ঝুড়িটা ধরে আছে, যার ভেতর সাপের মাথাটা আটকা পড়ে আছে।

আমার মাথার ভেতরে খচখচ অনুভূতি হলো। চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। সারা শরীরে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। ইচ্ছেশক্তি বলে এক ঝটকায় হাতটা পেছনে সরিয়ে নিলাম। উমটঙ্গা তার অচেতন অবস্থার মধ্যে থরথর করে কেঁপে উঠল। ধপ করে শব্দ হলো একটা। তাকিয়ে দেখলাম, এক মুহূর্ত আগে যে জায়গাটায় আমার হাত ছিল ওখানে সাপটা ছোবল মেরেছে।

ভয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। দাঁতের সাথে দাঁত লেগে ঠকঠক করতে লাগল। হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল আমার উপর দিয়ে। প্রচণ্ড শীতে কেঁপে উঠলাম–যদিও রাতটা ছিল গ্রীষ্মের। দেখলাম ঠাণ্ডা বাতাসটা আসছে ঘুমন্ত উমটঙ্গার নাকের ছিদ্র দিয়ে। আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছিল। বুঝতে পারছিলাম একটু পরে আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাপটার উপরে পড়ে যাব।

সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্রিত করে আমার পিস্তল ধরা হাতটা তুললাম। সাপটাকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু আমার চোখ দুটো মনে হলো উমটঙ্গার কপালে স্থির হলো। যদি আমার জমে যাওয়া আঙুল ট্রিগারটা টানতে পারত! আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করলাম। আর তখনই খুব অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল।

উমটঙ্গা তার ঘুমের মধ্যে আমার সাথে কথা বলতে শুরু করল। শব্দে প্রকাশ করে নয়, বুঝতে পারছেন? আত্মা যেভাবে আত্মার সাথে কথা বলে, সে রকম। সে শুয়ে থাকা অবস্থায় শরীরটাকে এপাশ ওপাশ মোচড় দিল, গোঙাতে লাগল। তার কপাল থেকে ভয়াবহ ঘাম ঝরে চর্মসার গলা বেয়ে পড়তে লাগল। আমি স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম যেমন এখন আপনাদের

দেখাতে পাচ্ছি। কাকুতি মিনতি করতে লাগল সে, যাতে তাকে হত্যা না করি। নিস্তব্ধ সেই রাতে যেখানে মহাজগত ও সময় মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, সেখানে আমি উপলব্ধি করলাম উমটঙ্গা আর সাপটা একই।

যদি আমি সাপটাকে হত্যা করি, উমটঙ্গাও খুন হবে। সে কোন এক অদ্ভুত উপায়ে অশুভ শক্তিকে প্ররোচিত করতে পারে, আর তাই মন্ত্র পড়া শেষে যখন সে অচেতন হয়ে পড়ে তখন তার অশুভ আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে তার পরিচিত ভয়ঙ্কর জিনিসের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

আমার মনে হলো সাপ এবং উমটঙ্গা দুটোকেই আমার হত্যা করা উচিত। কিন্তু আমি তা করলাম না। একজন ডুবন্ত মানুষ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার অতীত জীবনের সমস্ত দৃশ্য দেখতে পায়–আমিও তাই দেখলাম। আমার তেরো বছরের হতাশা ও ব্যর্থতার দৃশ্যগুলো একের পর এক আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু আমি তার চেয়েও বেশি কিছু দেখলাম।

আমি দেখলাম জোহান্সবার্গে একটা পরিষ্কার, সাজানো গোছানো অফিস, সেখানে মানানসই পোশাক পরে আমি বসে আছি। এই বাড়িটাকেও আমি দেখলাম ঠিক আপনারা যেমন সামনের রাস্তা থেকে এটাকে দেখেন–অথচ এর আগে জীবনেও কোনদিন এই বাড়িটাকে আমি দেখিনি–এ ছাড়া আরও অনেক কিছু আমি দেখতে পেলাম।

ওই মুহূর্তে উমটঙ্গাকে আমি আমার শক্তির মধ্যে পেয়েছিলাম। সে স্পষ্টভাবে বলে চলছিল–'এসব কিছুই আমি তোমাকে দেব–যদি শুধু আমার জীবনটা তুমি রক্ষা করো।'

এরপর উমটঙ্গার চেহারা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। আবার চাঁদের আলো জানালার ফাঁক গলে বুড়ো বেনির অফিসে এসে পড়ল–আর সেই আলোয় দেখতে পেলাম মাম্‌বার মাথাটা!

পিস্তলটা পকেটে পুরলাম। খুলে ফেললাম দরজাটা। বাইরে এসে তালা লাগালাম ওটায়, তারপর শুতে গেলাম বিছানায়।

এতটা ক্লান্ত ছিলাম যে শোবার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ঘুম থেকে উঠলাম দেরি করে, কিন্তু গতরাতের ঘটনাগুলো পরিষ্কার আমার মনে ছিল–আমি নিশ্চিত ছিলাম ওটা কোন স্বপ্ন ছিল না। আমি একটা শটগানে গুলি ভরে সোজা বেনির অফিসে গেলাম।

সাপটা টেবিলের পাশে একইভাবে পড়েছিল–তার মাথাটা ঝুড়ির মধ্যে ঢোকানো, দেহটা ভারী ভারী খতিয়ান বই দিয়ে চাপা দেয়া। দেখে মনে হলো ওটা সোজা হয়ে তার স্বাভাবিক গড়নে ফিরে গেছে। বন্দুকের নলটা দিয়ে হালকা খোঁচা মেরে বুঝলাম ওটা এখন একেবারে শক্ত। এখন ওটাকে চকচকে পালিশ করা কাঠের লাঠির চেয়ে বেশি কিছু ভাবা গেল না, যদিও জানতাম ওর ভেতর অতি কুৎসিত এক জীবন লুকিয়ে আছে। লাঠিটা রেখে সতর্কতার সাথে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

একটু পরেই উমটঙ্গা এল। জানতাম সে আসবে। ওকে আরও বুড়ো দেখাল। বেশিক্ষণ থাকল না সে। নিজে ওর ঋণের কথা তুলল, বলল, যদি আমি ওটার কিছু অংশ ছেড়ে না দিই তাহলে ওকে পুরোটাই শোধ করতে হবে, আর এতে তাকে সর্বস্বান্ত হতে হবে। স্ত্রীদেরকে বিক্রি করতে হলে সে তার গোত্রের উপর কর্তৃত্ব হারাবে।

আমি বুঝিয়ে বললাম যে এটা আমার ব্যাপার নয়, রেবেকার ব্যাপার। বেনি মারা যাবার কারণে সেই এখন সব কিছুর মালিক।

একথা শুনে উমটঙ্গা আশ্চর্য হলো। আদিবাসীদের মধ্যে মহিলারা সম্পত্তির মালিক হয় না। সে বলল, সে ভেবেছিল ব্যবসাটা এখন আমার এবং আমার কর্তব্য রেবেকার মৃত্যু পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।

এরপর উমটঙ্গা জানতে চাইল ঘটনা সেরকম হলে আমি

তাকে সাহায্য করব কিনা। উত্তরে বললাম কারও কাছ থেকে জোর করে পাওনা আদায় করা আমার স্বভাব নয়। এ কথায় তাকে সন্তুষ্ট মনে হলো। সে তার ভয়ঙ্কর লাঠিটা মেঝে থেকে তুলে নিল, তারপর একটি কথাও না বলে চলে গেল গটগট করে।

পরের সপ্তাহে দোকানের কাজে আমাকে এমব্যাবেন-এ যেতে হলো। দু'রাত সেখানে ছিলাম। ফিরে এসে শুনলাম রেবেকা মারা গেছে এবং তাকে কবর দেয়া হয়েছে। এ ঘটনা আমি শুনেছিলাম চাকরদের কাছ থেকে। যেদিন আমি রওনা হলাম সেদিন সন্ধ্যায় উমটঙ্গা রেবেকার সাথে দেখা করতে আসে। উঠনে বসে আগের মত জাদুর খেলা দেখায়। পরদিন সকালে ওরা রেবেকাকে মৃত অবস্থায় পায়। রেবেকার সমস্ত শরীর কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি শুধু জানতে চাইলাম, উমটঙ্গা তার লাঠিটা ফেলে গিয়েছিল কিনা। যদিও উত্তরটা কি হবে তা আমি আগেই জানতাম।

'হ্যাঁ, পরদিন ওটা নেবার জন্যে সে এসেছিল।'

আমি বেনির ব্যবসা গোছগাছ করতে শুরু করলাম, ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনলাম তা। ব্যাংকের প্রতি বেনির কোন আস্থা ছিল না, জানতাম সঞ্চিত অর্থ কোথাও লুকানো আছে। তিন সপ্তাহ লাগল সেটা খুঁজে পেতে। সবকিছু মিলিয়ে দশ হাজার পেলাম। ওটা খাটিয়ে আমি শত হাজার করলাম। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, সবকিছু ব্ল্যাক আর্টের মাধ্যমেই ঘটেছিল আর ওটার কারণে আজ আমি এখানে।"

কার্সটেয়ার্স যখন তার গল্পের শেষ দিকে এসে গেল তখন কী এক কারণে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল জ্যাকসনের উপর। দেখলাম বয়স্ক লোকটার দিকে সে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হিংস্র আগুনে জ্বলজ্বল করছে কালো চোখ দুটো।

'তোমার নাম কার্সটেয়ার্স নয়,' হঠাৎ কর্কশ গলায় চিৎকার করে বলে উঠল সে। 'তুমি থম্পসন—আর আমার নাম আইজ্যাকসন। যখন তুমি জোর করে সম্পদ দখল করে পালালে

তখন আমি ছোট ছিলাম।'

ঘটনাটা আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারার আগেই জ্যাকসন উঠে দাঁড়াল–কার্সটেয়ার্সের বুকে ছোরাটা ঢুকে যাবার সময় এক ঝলক ওটা দেখেছিলাম। চিৎকার করে সে বলল, 'তুমি সেই বদমাশ–আমার মাকে খুন করার জন্যে ওই শয়তানটাকে টাকা দিয়েছিলে।'

মূল: ডেনিস হুইটলির 'দ্য স্নেক'
রূপান্তর: মিজানুর রহমান কল্লোল

সেই আপেল গাছটি

জ মারা গেছে তিন মাস হলো, এসময় প্রথম আপেল গাছটা লক্ষ করল লোকটা।

আগেও ছিল গাছটা, বাড়ির সামনের বাগানে। বসন্তের শুরু। চমৎকার এক সকাল। খোলা জানালার পাশে মুখ ধুচ্ছিল লোকটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ময়দানের দিক থেকে বয়ে আসা শীতল বাতাস বুক ভরে টেনে নিল। মুখে তখনও সাবান মাখা।

গাছটার দিকে বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল ও: সহসাই কেমন চেনা-চেনা ঠেকল ওটাকে। শুকনো লিকলিকে; অন্য গাছগুলোর মত নয়। অল্প কিছু ডাল-পালা ওটার, লম্বা, শীর্ণ দেহ থেকে নেমে আসা বাহুর মতন দেখাচ্ছে। মগডালটা নুয়ে পড়েছে, ক্লান্ত মাথার মত।

মিজকে প্রায়ই ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে লক্ষ করেছে সে। ক্লান্ত আর অসুখী, মাথাটা নোয়ানো।

‘তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, মিজ,’ প্রায়ই বলত ও। ‘একটু শান্ত হয়ে বসো না, বিশ্রাম নাও।’

‘আমি বসে থাকলে কাজ করবে কে?’ জবাব দিত মিজ।

বেশির ভাগই ফালতু কাজ। শরীরটা টেনে টেনে বাড়িময় ঘুরে বেড়ানো। প্রতি দিন, সারাদিন; সারা বছর।

তীক্ষ্ণ চোখে গাছটার দিকে চেয়ে রইল লোকটা। ভারাক্রান্ত, নুয়ে পড়া মাথা। ক্লান্ত ডাল-পালা, ধুঁকছে। সকালের বাতাসে কেঁপে কেঁপে যাওয়া কিছু শুকনো পাতা: অবিকল পাতলা চুলের মত দেখায়।

ওটা চিৎকার করে যেন বলছেঃ 'সব দোষ তোমার। তুমি আমার যত্ন নাও না বলে আমার এই দশা।'

জানালা থেকে সরে এসে মুখ ধুতে লাগল লোকটা। তারপর পোশাক পরে তৈরি হয়ে নেমে এল নীচে। টেবিলে 'দ্য টাইমস' অপেক্ষা করছিল। অনাঘ্রাত কাগজের তরতাজা সুবাস। মিজ বেঁচে থাকতে সে-ই আগে পড়ত। কিছু কিছু অংশ জোরে জোরে পড়ত। জন্ম সংবাদ পড়ে কখনও সন্তুষ্ট হতে দেখা যায়নি ওকে।

'ওদের আবার মেয়ে হয়েছে। নিশ্চয়ই খুশি হয়নি ওরা।' 'কিংবা ছেলে হয়েছে। ওহ, ছেলে মানুষ করা মুখের কথা!'

কোন কিছুতেই খুশি হত না সে। 'এ বছর সবচাইতে বেশি লোক বেড়াতে গেছে। আশা করি বেড়িয়ে মজা পাবে তারা।' কিন্তু তার কণ্ঠে কারও জন্য বিন্দুমাত্র আশাবাদ ফুটত না।

নাস্তার পর, ওর দীর্ঘ-শীর্ণ পিঠ যন্ত্রণার ভঙ্গিতে নুয়ে পড়ত, ডিশগুলো যখন তুলত। ও রান্নাঘরে সশব্দে যখন ধোয়াধুয়ি করত, ওর স্বামী তখন তার চেয়ারে ফিরে আসত। পত্রিকার ভিতরের কাগজগুলো সবসময় ইতস্তত পড়ে থাকত, ওতে লেগে থাকত মাখন। নিজেকে প্রশ্ন করত লোকটা, 'কী করেছি আমি?'

কখনও রাগ করত না মিজ, ঝগড়া করত না। কিন্তু কখনও সুখী মনে করত না নিজেকে, আর সেজন্য দায়ী ভাবত স্বামীকে।

একদিন বৃষ্টি পড়ছে, বই হাতে আরামদায়ক এক চেয়ারে বসে আছে লোকটা। রেইনকোট গায়ে ঘরে এসে ঢুকল মিজ।

'শহরে যাবে না?'

'কেন?' প্রশ্ন করল লোকটা। 'কিছু চাই?'

'ডিনারের জন্যে মাছ লাগবে। অসুবিধে নেই। তুমি ব্যস্ত থাকলে না হয় আমিই যাব।'

এবং পরমুহূর্তে রওনাও দিল।

'আমি যাব তো,' চেঁচাল লোকটা। 'গাড়ি নিয়ে এখুনি বেরোচ্ছি।'

অনুসরণ করল লোকটা। সদর দরজায় পৌঁছে গেছে মহিলা, হাতে লম্বা, চ্যাপ্টা মত এক ঝুড়ি।

'তোমার আসা লাগবে না,' বলল। 'ফুলগুলোর কি দশা দেখেছ? আগে বাগানটার একটু যত্ন নিয়ে নিই। তারপর মাছ কিনতে যাব।'

দরজা লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ও।

বসন্তের সুন্দর এক দিনে, লোকটা হাঁটছিল বাগানে। পকেটে দু'হাত ভরা, পিঠে রোদের আরামদায়ক উষ্ণতা। ওর দৃষ্টি গাছ-পালা, মাঠ-ময়দান আর ধীরে বহমান নদীটা পেরিয়ে ওপারে চলে গেছে। ওপরতলায় বেডরুম ঝাড় দিচ্ছে মিজ, শব্দ পাওয়া যায়। আওয়াজ থেমে যেতে ওর ডাক পড়ল।

'তোমার হাতে কি কোন কাজ আছে?'

'না, এত সুন্দর দিনে কে কাজ করে? কেন?'

'না,' বলল মিজ। 'রান্নাঘরের কলটা ট্রাবল দিচ্ছে। বিকেলে দেখি ঠিক করতে পারি কিনা।'

অবসন্ন একটা হাত ধীরে ধীরে পেছনে ঠেলে দিল চুল। দুঃখী মুখখানা জানালা ত্যাগ করল, এবং পরমুহূর্তে, কাজের হল্লা শুরু হলো আবারও। যেন বলতে চাইছে: 'আমিও যদি কোন কাজ না করে, তোমার মত গায়ে রোদ মাখতে পারতাম!'

'এত কাজ করো কেন?' একদিন প্রশ্ন করল লোকটা। 'করাটা কি খুবই জরুরী?'

'ঘর-দোর ময়লা থাকলে তো তোমার সহ্য হয় না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসো তুমি। কি, ঠিক না?'

কাজেই যার যার আলাদা জগতে বাস করছিল ওরা। পঁচিশ বছরের সংসার ওদের। কিন্তু একই ছাদের নীচে বাস করলেও মনের কোন মিল ছিল না।

এরপর আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ে মিজ। তার পরের ঘটনা অতি দ্রুত আর সহজ। কীভাবে ঘটেছে ঘটনাটা জানত না

লোকটা। ডিসেম্বরের হাড় কাঁপানো এক দিনে, লন্ডনে যায় সে। সেদিন বিকেলে, গোপন এক আনন্দ উপভোগ করে ও–সিনেমা হলের উষ্ণতায় উড়ে চলে যায় সময়টুকু। রাত করে বাড়ি ফেরে সে, ওর স্ত্রী তখন ছিল তলকুঠুরিতে। ফার্নেসের আগুন নিয়ে ব্যস্ত। মুখখানা ক্লান্ত আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল, আড়াআড়ি কালো এক দাগ ছিল ওতে।

'মিজ!' বলে লোকটা। 'সেলারে কী করছিলে তুমি?'

'ফার্নেসটা সারাদিন কাজ করছে না। তাই মেরামতের চেষ্টা করছিলাম। কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতেই হবে। চেষ্টা করলাম, হলো না।'

কাশতে শুরু করল ও।

'ফার্নেসের গুলি মারো,' বলল লোকটা। 'তোমার শুয়ে থাকা উচিত ছিল।'

ধীর পায়ে সেলারের সিঁড়ি ভাঙল মহিলা। পিঠ বাঁকা ওর, চোখ বুজে এসেছে।

'সাপারের ব্যবস্থা করছি,' বলল। 'আমি অবশ্য কিছু খেতে পারব না।'

'তুমি শুয়ে থাকোগে যাও,' বলল ওর স্বামী। 'আমার সাপার লাগবে না। তোমার জন্যে হট ড্রিঙ্ক করে আনি।'

'আমার কিছু লাগবে না।'

আবারও কেশে উঠে; শরীরটা টেনে সিঁড়ি বাইতে লাগল।

পরদিন সকালে মিজের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটল। সেদিনটি ছিল মঙ্গলবার। শনিবার ভোরের দিকে মারা যায় ও।

পুরো একটা হপ্তা আর কিছু ভাবতে পারল না লোকটা। তারপর ভুলে গেল ওকে। সে এখন স্বাধীন। ফাঁকা বাড়িটা এবং শুষ্ক শীতকালটা এখন ওর। মিজের কথা আর কোনদিন মাথায় ঠাঁই পায়নি।

এবং আজ, হঠাৎই, মনে পড়ে গেল, আপেল গাছটিকে লক্ষ

করতে গিয়ে।

সেদিন বিকেলে, বাগানের চারপাশে ঘোরাফেরা করল ও, গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। কোন বিশেষত্ব নেই এটার; আর দশটা আপেল গাছের মত এটাও একটা।

'আধমরা গাছ,' ভাবল ও। 'কাল কেটে ফেলব। ভাল এক্সারসাইজ হবে। লাকড়ি বানিয়ে পোড়াব। সুন্দর গন্ধ দেয় আপেল কাঠ।'

কিন্তু বৃষ্টি এল, থাকল টানা সাতদিন। গাছটাকে চোখের সামনে থেকে দূর করতে পারল না ও। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বিষণ্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল ওটা। বাগানের আর একটা গাছও ওটার মত নয়। ওর পাশে নবীন এক গাছ সিধে দাঁড়িয়ে শক্তিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে। আকাশপানে ডাল তুলে দিয়ে বরং বৃষ্টি উপভোগ করছে ওটা।

মুচকি হাসল লোকটা। ওই মেয়েটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল কেন? যুদ্ধের সময় ফার্মে কাজ করত সে। ফার্মটা বাড়ির কাছে বলে শনি-রবিবারের দিনগুলোয় ওদের সাহায্য করতে যেত ও। মেয়েটা সর্বক্ষণ থাকত ওখানে: সুন্দরী, উচ্ছল, সদা হাস্যমুখ। মাত্র উনিশ বছরের তরুণী, ওকে দু'চোখ ভরে দেখত লোকটা।

কীভাবে ঘটে গেল ব্যাপারটা জানে না সে, খুবই তুচ্ছ এক ঘটনা। ট্র্যাক্টরের কাছে কী যেন একটা করছিল ও। মেয়েটি ছিল ওর পাশে। হাসাহাসি করছিল ওরা। লোকটা ঘুরে দাঁড়াতে, হঠাৎই মেয়েটি ধরা দেয় ওর বুকে, এবং সে চুমু খেতে থাকে তরুণীটিকে।

এরপর আবার ট্র্যাক্টরের কাজে মন দেয় লোকটা। ছোট্ট অথচ গোপন এক ঘটনার অংশীদার হয়ে পড়ে দু'জনে। কাজ সেরে কথাবার্তা বলে ওরা, হাসাহাসি করে। মেয়েটির বাহুতে হাত রাখে ও।

ঠিক তখনই মিজকে ওখানে দাঁড়ানো দেখতে পায়।

বরফশীতল মুখের অভিব্যক্তি, একদৃষ্টে চেয়ে মেয়েটির দিকে। লজ্জায় কান কাটা যাওয়ার দশা লোকটার। মেয়েটি মিজের উদ্দেশে স্মিত হেসে কুশল জানতে চায়। তারপর হেঁটে চলে যায় নিজের কাজে।

মিজ বলে, 'গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না। তোমাকে অনেকবার ডেকেছি আমি। কিন্তু তুমি শুনতে পাওনি।'

স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ির কাছে আসে লোকটা। এবং শীঘ্রিই চালু হয় এঞ্জিন। ওকে ধন্যবাদ জানায় মিজ, কিন্তু ওর গলায় বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা প্রকাশ পায়নি। স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছিল না ও। সোজা বাড়িতে গিয়ে পালিয়ে বাঁচে।

এ ব্যাপারে কোনদিনই কিছু বলা হয়নি ওকে। এর পরের সপ্তায় বাড়ি যায় মেয়েটি, অসুস্থ মাকে দেখতে; আর ফেরেনি।

এতদিন পর হঠাৎ ওর কথা মনে পড়ল কেন? আপেল গাছে বৃষ্টি পড়ছে লক্ষ করছিল ও। ছোট গাছটিকে রোদ মাখার সুযোগ দেবে ঠিক করল ও, কেটে ফেলবে আধমরা গাছটাকে।

শুক্রবার বিকেলে, বাগানে কাজ করছিল উইলিস। হপ্তায় তিন দিন কাজ করে সে।

'বুড়ো গাছটাকে দেখুন, স্যার,' বলল ও। 'কত বছর ফল ধরে না। এমনকী ফুলও দেখি না। কিন্তু এবারে দেখুন। অদ্ভুত না?'

একটা শাখা টেনে নামাল লোকটা। মুকুলিত ওটা; গোটা ডালে ছোট ছোট ফুল। তবে কলিগুলো খুদে আর বাদামী।

'এগুলো মরাটে ফুল, উইলিস। দেখছ না কেমন ধুলোটে আর শুকনো?'

হাত দুটো পকেটে পুরল ও। স্পর্শ করবে না ওগুলোকে।

'বাচ্চা গাছটার কাছ থেকে আলো শুষে নিচ্ছে এটা,' বলল। 'বুড়ো হয়ে গেছে, কেটে ফেলা উচিত।'

'আরেকটু দেখি, স্যার,' বলে ওঠে উইলিস। 'জ্যান্ত আছে গাছটা, বেশ ভালভাবেই বেঁচে আছে। আর কিছু দিন অপেক্ষা

করুন, স্যার। ফল না ধরলে আগামী শীতে কেটে নামিয়ে দেব।'

'বেশ,' বলে বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়াল লোকটা।

সে রাতে, বেডরুমের জানালা খুলল ও, একদৃষ্টে চেয়ে রইল নবীন গাছটির দিকে চাঁদের আলোয়, সাহসী আর পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছে ওটাকে। আবারও ওই মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল। কোথায় এখন সে? বিয়ে করেছে? বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সংসার করছে?

সহসা বুড়ো গাছটা থেকে একটা ডাল খসে পড়ল মাটিতে। খুদে খুদে, বাদামী ফুলসমৃদ্ধ সেই ডালটা, ও যেটাকে স্পর্শ করতে চায়নি।

নবীন গাছটার ছায়ায় আড়াআড়ি পড়ে রইল ডালটা, অভিযোগের আঙুল তুলে যেন।

পরদিন, বাসায় অচেনা এক ঘ্রাণ পাওয়া গেল; জোরাল আর মিষ্টি-মিষ্টি। কাজের মহিলা তখন রান্নাঘরে।

চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'অদ্ভুত এক গন্ধ পাচ্ছি এখানে। কিছু পোড়াচ্ছ নাকি তুমি?'

'লাকড়ির গন্ধ, স্যার,' মহিলা জবাব দেয়। 'উইলিস একটা ডাল কেটে লাকড়ি করেছে সকালে। আপেল কাঠ তো, চমৎকার গন্ধ ছড়ায়।'

চুলোর দিকে চাইল লোকটা। খড়ি দেওয়া হয়েছে ওখানে। চিকন, সবুজ ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

'খড়িগুলো শুকোয়নি এখনও,' বলল লোকটা। 'ও দিয়ে কাজ হবে না।'

'আমার কাছে তো গন্ধটা ভালই লাগছে,' বলল মহিলা।

'কে জানে,' বলল লোকটা। 'আমার ভুলও হতে পারে। শিগ্গিরই হয়তো পুড়তে শুরু করবে।'

চুলো থেকে মিহি, সবুজ ধোঁয়ার আরেকটি কুণ্ডলী পাক খেয়ে

শূন্যে উঠল, এবং তার এমনই মিষ্টি সুঘ্রাণ, অসুস্থ বোধ করতে লাগল লোকটা। ভেজা কাঠ! কিন্তু লাকড়ি থেকে যা বেরোচ্ছে সেটা পানি নয়। ঘন দুধের মত কী যেন এক তরল গলগল করে বেরিয়ে আসছে কাঠের বুক চিরে। মিষ্টি গন্ধে ভরাট হয়ে গেছে কামরাটা, লোকটা বেরিয়ে এল বাগানে।

ফিরে যখন এল, চুলো নিভে গেছে। একটা বালতি খুঁজে নিয়ে তার ভিতর সব কটা লাকড়ি আর ছাই ভরে দিল সে। সেলারে বয়ে নিয়ে গেল বালতিটা, এবং ওটা উপুড় করে ছুঁড়ে দিল ফার্নেসে। এবার তেল ছড়িয়ে আগুন জ্বেলে দিল। তারপর ফার্নেস ডোর বন্ধ করে সেলার ত্যাগ করল।

বিশ মিনিট বাদে, বই পড়ছে এমনসময় সশব্দে বাড়ি খেল একটি দরজা। বইটা নামিয়ে রেখে কান পাতল ও। প্রথমটায় চুপচাপ। তারপর, হ্যাঁ, ওই যে আবার।

সটান উঠে দাঁড়িয়ে দরজা লাগাতে গেল সে। সেলারের সিঁড়ির মাথার দরজাটা শব্দ করছে। লাগাতে যাবে, এসময় ধক করে নাকে এসে লাগল গন্ধটা। আপেল কাঠের তীব্র, মিষ্টি ঘ্রাণ। উঠে আসছে সেলার থেকে।

হঠাৎই, কোন যুক্তি ছাড়াই, আপাদমস্তক শিউরে উঠল ওর। বীভৎস ভয়। কুৎসিত সব চিন্তা এসে ভিড় জমাল মাথায়।

'রাতের বেলায় কি গন্ধে ভরে যাবে পুরো বাড়ি? ঘুমাচ্ছি এসময় যদি বেডরুমে উঠে আসে? শ্বাস বন্ধ হয়ে মরি যদি?'

তরতর করে ধাপ বেয়ে সেলারে নেমে গেল ও। ফার্নেস কোন শব্দ করছে না, কিন্তু সবুজ ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে পাক খেয়ে। ফার্নেস ডোর মেলল লোকটা। কাগজ যা ছিল সবই পুড়ে ছাই। কিন্তু লাকড়ি, আপেল কাঠের লাকড়ি, যেমনকে তেমনি আছে; আগুনের স্পর্শও লাগেনি ওতে। কালো, কুৎসিত জিনিসগুলো পড়ে আছে ওখানে; আগুনে পোড়া মৃতদেহের মত।

মাথা ঝিমঝিম করে উঠল আবারও ওর। নাকে-মুখে কাপড়

চাপা দিল। এবার একটা বালতিতে কাঠের টুকরোগুলো বোঝাই দিল। সেলারের ধাপ ভেঙে উঠে, বেরিয়ে এল বাগানে।

চাঁদ নেই আজ, বৃষ্টি পড়ছে। গ্যারাজের পেছনের মাঠে, ঘন হয়ে জন্মেছে লম্বা লম্বা দুর্বা ঘাস। বেড়ার ওপাশে টুকরো কাঠগুলো ছুঁড়ে দিল ও। ওখানে মাটির সাথে মিশে যাবে, মনে মনে বলল।

বাসায় ফিরে এল ও। গন্ধটা আর নেই।

পরদিন সকালে শরীরটা কেমন জানি ঠেকল ওর। অসুস্থতা থাকল ক'দিন, পড়ে থাকতে হলো বিছানায়।

চমৎকার উষ্ণ এক সকালে শরীর ভাল হলো ওর। নাস্তা খাচ্ছে, এসময় দরজায় এসে দাঁড়াল উইলিস। অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে।

'স্যার,' বলল। 'খড়িগুলোর জন্যে মিস্টার জ্যাকসন আমাকে খুব বকেছেন।'

'তোমাকে বকেছেন? কেন?'

'বললেন আমি নাকি তাঁর জমিতে কাঠ ফেলেছি। তাঁর বাচ্চা ঘোড়াটা ওতে হোঁচট খেয়ে পায়ে চোট পেয়েছে। ভয়ানক রাগ করেছেন উনি।'

'কিন্তু কথাটা তো সত্যি নয়। তাঁকে বলোনি তুমি?'

'বলেছি, স্যার। কিন্তু কে যেন ফেন্সের ওপাশে কাঠ ফেলেছে। উনি দেখালেন ডেকে নিয়ে। গ্যারাজের পেছনটায়। কে ফেলেছে কে জানে।'

'আমি ফেলেছি, উইলিস। তুমি কাঠ এনেছিলে বাড়িতে মনে নেই? ওদিয়ে আগুন ধরে না, খালি ধোঁয়া হয়। তাই রাগ করে ফেলে দিয়ে এসেছি। জ্যাকসনকে বোলো আমি দুঃখিত। ঘোড়ার পা সারাতে যা খরচ হবে আমি দেব। কিন্তু ওই জিনিস আর বাসায় এনো না, কেমন?'

'না, স্যার,' বলল উইলিস। চলে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াল।

'আজ সকালে বুড়ো গাছটা লক্ষ করেছেন, স্যার?'

'না তো।'

'ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। কাল সারাদিন রোদ পেয়েছে, রাতেও বৃষ্টি হয়নি। একবার দেখে আসবেন, স্যার।'

তখুনি উইলিসের সাথে বাগানে চলে এল ও। উইলিস ঠিকই বলেছে। খুদে বাদামী অঙ্কুর মুকুলিত হয়েছে: এক ঝাঁক সাদা ফুল। কিন্তু বড়ই ছোট আর দুর্বল। সংখ্যায় প্রচুর। শুকনো গাছটা ভার সইতে পারবে কি না সন্দেহ।

'সুন্দর না, স্যার?'

'দুঃখিত। আমার চোখে সুন্দর লাগছে না। ফুলগুলো বেশি মোটা। অন্যান্য গাছের মত ছোট আর পাতলা হলে ভাল হত। তোমার বউয়ের জন্যে বাসায় নিয়ে যেয়ো। যত খুশি নিতে পারো, কোন আপত্তি নেই।'

উইলিস মাথা নাড়ল। যুগপৎ বিস্মিত আর ব্যথিত হয়েছে সে।

'লাগবে না, স্যার। আমি ফল ধরা পর্যন্ত দেখতে চাই।'

'বেশ, তোমার খুশি।'

উইলিসকে রেখে বাসায় ফিরে গেল সে। বাগানের দিকে চাইতে, নবীন গাছটিকে চোখেই পড়ল না তার। আধমরা ফুলের মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

কোনমতেই বুড়ো গাছটার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না সে। ওটা ওখানে নিথর দাঁড়িয়ে ওর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছে। এবং ও সন্তুষ্ট হচ্ছে না বলে দোষারোপ করছে।

সেবারের গরমে লম্বা ছুটি নিল ও। আগস্টের শেষাংশ আর পুরো সেপ্টেম্বর কাটাল সুইটজারল্যান্ড আর ইতালিতে।

গাড়ি ছিল সঙ্গে, ফলে যেখানে খুশি বেড়াতে পেরেছে। সাঁঝের ম্লান আলোয়, কোন না কোন মফস্বল শহরে, আরামদায়ক হোটেল খুঁজে নিত ও। কখনও কখনও দু'তিন দিন কিছুই করত না। স্রেফ রোদে এক গ্লাস ওয়াইন নিয়ে বসে বসে মানুষজন দেখত। চারপাশে লোকে ব্যস্ত আলোচনা করছে শুনে মজা পেত।

লোকে হাসত ওর উদ্দেশে। মিজকে সাথে করে যখনই কোথাও গেছে এমনটা ঘটেনি। মফস্বল শহরের উজ্জ্বল আলো আর গান-বাজনা মন কেড়ে নেয় ওর।

এক রাতে, গে হ্যাট পরিহিতা এক যুবতীর দিকে চেয়ে মুচকি হাসি দিল ও, বলল, 'আমার সাথে নাচতে আপত্তি আছে?' নাচে মোটেও পটু নয় লোকটা, কিন্তু তাতে কী? বাজনা থামতে সে কী খিলখিল হাসি মেয়েটির, এক দৌড়ে ওর প্রাণোচ্ছল বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে ফিরে গেল।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি, বাসার কাজের মহিলাকে টেলিগ্রাম পাঠাল সে, এবং তারপর ফিরে এল। ভ্রমণ সেরে ফেরামাত্র সারা বাড়ি ছোটাছুটি করতে লেগে যেত মিজ। কোথায় কী ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গেছে তাই খুঁজে বেড়াত। কিন্তু এখনকার কথা ভিন্ন।

'কেমন আছেন, স্যার?' দায়সারা প্রশ্ন করল মহিলা। 'খাবার দেব, স্যার?'

তারপর নিস্তব্ধতা।

টেবিলে একটা প্লেটে কিছু আপেল রাখা ছিল। ডিনারের পর, ওগুলো তুলে নিল লোকটা। ফলগুলো ছোট, শুকনো আর বাদামী। একটায় কামড় বসাল। এহ্! জঘন্য স্বাদ। আরেকটা পরখ করল। ওই একই অবস্থা। ভিতরটা নরম আর হলদেটে।

'আপেলগুলো যা তা,' বলল সে।

'আমি জানতাম না, স্যার। দুঃখিত। উইলিস নিয়ে এসেছে।'

'ঠিক আছে। কাল ভাল দেখে নিয়ে আসব আমি।' বিছানায় গেছে, তখনও বিশ্রী স্বাদটা লেগে রয়েছে মুখে। ইতালির স্বপ্ন দেখল ও ঘুমের মধ্যে। ওর কানে বাজল গান, নাচছে সে। কিন্তু তরুণীটির চেহারা মনে পড়ল না। সকালে আবারও চেষ্টা করল মনে করতে, পারল না।

বাগানে যখন বেরিয়ে এল, একটা চমক অপেক্ষা করছিল ওর জন্য।

আপেলগুলো কোথা থেকে এসেছে এখন জানে ও। ফলে ফলে নুয়ে পড়েছে গাছটা। প্রতিটি ডালে খুদে খুদে, বাদামী ফল ধরেছে। নীচের দিকের ডালগুলো মাটি ছুঁই ছুঁই করছে, ঘাসে বিছিয়ে পড়ে রয়েছে আপেল। বেশ কয়েকটা দেখা গেল ফেটে গেছে, ভিতরে পোকা কিলবিল করছে। এত ফল আর কোন গাছে কখনও ধরতে দেখেনি ও। কিন্তু কোনটাই মুখে তোলার যোগ্য নয়। এদের হাত থেকে মুক্তি নেই ওর। বাগানে হাঁটতে গিয়ে ফাটা আপেল চটকে গেল ওর জুতোর তলায়। ঘাসে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হলো ওকে।

কিন্তু নবীন গাছটির কথা আলাদা। এটার আপেলগুলো চমৎকার আকৃতির, আর সূর্যের মত লাল টুকটুকে। একটা পেড়ে নিয়ে কামড় দিল ও। আহ, তাজা মিষ্টি রসে ভরে গেল মুখ।

বাসায় এসে ঢুকল ও। কিন্তু বুড়ো গাছটার হাত থেকে রেহাই মিলল না সেখানেও। প্রতিটা জানালা থেকে দেখা যায় ওটাকে। ওহ, কী ঘৃণাই না করে সে গাছটাকে!

'উইলিস,' ডাকল ও। 'ওই আপেলগুলো বাগান থেকে সরাও। বিক্রি করে টাকাটা নিতে পারো। কিংবা তোমার বাসাতেও নিয়ে যেতে পারো। যা করার করো। আমার চোখের সামনে থেকে দূর করো ওগুলোকে।'

ক'দিনের মধ্যেই, সব আপেল বিদায় হলো। ভারি বোঝা নেমে গেছে, অথচ আগের চাইতেও অসুখী দেখাতে লাগল এখন গাছটিকে। ডালগুলো ঝুঁকে রয়েছে তখনও, শরতের হিম সন্ধেয়, শুকনো পাতায় কাঁপুনি উঠল।

'তোমাকে সারাজীবন কত সেবা করেছি, ভুলে গেছ,' অনুযোগ করতে চায় যেন ওটা, 'কীভাবে পারলে এমন করতে?'

দ্রুত শীতকাল আসছে। আসছে ছোট, ধূসর দিন।

শরৎকাল কোনদিনই ভাল লাগত না লোকটার। শরৎ মানেই তো

লম্বা, অন্ধকার সন্ধে আর মিজের শূন্যগর্ভ কথা-বার্তা।

'জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে আবারও,' কিংবা 'দক্ষিণ আফ্রিকায় আরও গোলমাল বেধে গেছে,' অথবা 'অনেক লোক অসুখে পড়ছে। ডাক্তাররা করছেটা কী?'

গ্রীন ম্যানে—পাবলিক হাউজটিতে—আসা-যাওয়া আরম্ভ করল লোকটা। রাস্তার ধারে পুরানো এক সার বাড়ি থেকে বড়জোর সিকি মাইল।

পাবে ওর কথা বলার দরকার পড়ে না। ড্রিঙ্ক বিক্রি করে যে মহিলা, তার নাম মিসেস হিল। মহিলার কুশল জানতে চায় ও, তারপর একটা ড্রিঙ্ক কিনে, এক কোণে বসে থাকে চুপ করে।

লোকজন পান করছে, গল্প করছে, হাসাহাসি করছে। অনেকটা যেন সেই ছুটি কাটানোর দিনগুলোর মত। এখানে এলে মনটা ভাল হয়ে যায় ওর; শীতের কালো-কালো সন্ধেগুলো, বেশ চমৎকার কেটে যায়।

বাসায় তো চারদিক নিস্তব্ধ; সব একঘেয়ে। এক রাতে ডিনারে মাছ পড়ল ওর পাতে। শুকনো আর বিস্বাদ। কাজের মহিলা এরপর ফলের তৈরি একটি পদ এনে টেবিলে রাখল। পেটে খিদে ছিল, বড় একটুকরো কেটে নিয়ে কামড় বসাল ও। এক কামড়ই যথেষ্ট।

কাশতে কাশতে জান যায়, গর্জে উঠল সে, 'কী দিয়েছ এটার মধ্যে?'

'ফল, স্যার।'

'কী ফল?'

'আপেল, স্যার।'

'হুঁ। ওই গাছটার আপেল নিশ্চয়ই? তুমি জানো না আমি ও আপেল খাই না?'

'উইলিস দিয়েছে, স্যার। আমি নিজেও তো একটা টার্ট বানিয়েছি। ভারি চমৎকার স্বাদ।'

'আমি তো মুখে দিতে পারছি না। এ জিনিস আর আমার সামনে এনো না।'

'স্যার?'

'বলো?'

'একটা কথা...আমার মনে হয় চলে যাওয়া উচিত।'

'চলে যাবে? কেন? তোমার টার্ট খেতে পারিনি বলে?'

'জ্বী না, স্যার। বিবি সাহেব আমাকে খুব পছন্দ করতেন। আমার কাজে খুশি ছিলেন। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। যত পরিশ্রমই করি, কোন ফল হয় না। আপনি কোন মন্তব্য করেন না। এখানে আমার আর মন বসছে না, স্যার।'

'সেজন্যে আমি দুঃখিত। থাকবে না যাবে নিজে ভেবে দেখো। আচ্ছা ঠিক আছে—এখন যাও।'

ঘর ত্যাগ করল মহিলা। কোট আর পুরানো ক্যাপটা পরে নিয়ে পাবের উদ্দেশে রওনা হলো লোকটা।

বিশ মিনিট লাগল গ্রীন ম্যানে পৌঁছতে। মিসেস হিল ওর গ্লাস ভরে দিল, এবং নিজের কোণটিতে চলে গেল লোকটা। লোকে ওর দিকে চেয়ে হাসল, টুকটাক কথা বলল।

'ঠাণ্ডা খুব, তাই না, স্যার?' 'গা গরম না করে উপায় নেই।' 'শীতকাল এলেই এই এক সমস্যা'—এমনি সব কথা-বার্তা।

বন্ধুবৎসল লোকজন সব।

'আরেক গ্লাস দেবেন, মিসেস হিল?'

সিগারেটের ধোঁয়া, সুখী কণ্ঠস্বর, আন্তরিক হাসি।

'...লাকড়ি পাওয়া খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে,' বলছিল মিসেস হিল। 'যা দাম! হু-হু করে বাড়ছে।'

সামনে ঝুঁকে এল লোকটা, নিজের কানেই গলার আওয়াজটা দূরাগত শোনাল।

'আমি আপনাকে কিছু কাঠের ব্যবস্থা করে দিতে পারি,' বলল ও।

অন্য একজনের সাথে কথা বলছিল মহিলা, ঘুরে দাঁড়াল।

'কিছু বললেন?' জানতে চাইল।

'বলছিলাম যে কিছু কাঠ জোগাড় করে দিতে পারি আপনাকে,' বলল লোকটা। 'বাসায় পুরানো এক গাছ আছে আমার। কাল কেটে নিয়ে আসব।' মৃদু হাসল।

'না, না,' বলে ওঠে মহিলা। 'অত ঝামেলা করতে যাবেন কেন?'

'ঝামেলা কীসের। বরং বেশ একটা এক্সারসাইজ হয়ে যাবে। আপেল গাছ, চলবে তো?'

'কাঠ হলেই হয়,' বলল মহিলা। 'কিন্তু আমাকে দেবেন যে, আপনার লাগবে না?'

মাথা নাড়ল ও, গোপন হাসি হাসল।

'ট্রেইলারে করে নিয়ে আসব,' বলল। 'কাল রাতে পেয়ে যাবেন।'

হিমশীতল, শুষ্ক রাতে হেঁটে বাড়ি ফিরল লোকটা, নিজের অজান্তেই হাসি এসে যাচ্ছে বারবার। পরদিন, আকাশের মুখ গোমড়া, রাতে তুষারপাত হয়েছে। করাত আর কুঠারটা নিয়ে বাগানে চলে এল ও।

গাছটা বাঁকা, সব পাতা খুইয়ে ন্যাড়া। কুৎসিত। প্রাণের লেশমাত্র থাকার কথা নয়। কোট খুলে ফেলল লোকটা, গাছের তলায় এক ফুট তফাতে করাতটা রাখল। এবার শুরু হলো কাজ।

টানা হেঁচড়া...টানা হেঁচড়া...

কাঠে কামড় বসাল করাত। একটু পরে, থেমে গেল করাত। নড়ছে না। সজোরে টানাটানি করল ও, কিন্তু গাছে শক্ত হয়ে এঁটে বসে রয়েছে ওটা। রেগে কাঁই হয়ে গেল লোকটা। কুঠারটা তুলে নিয়ে সাঁই করে নামিয়ে আনল।

ওর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল কাঠের টুকরো-টাকরা। ভারি কুঠারটা ওঠা-নামা করে চিরে দিচ্ছে গাছটাকে। এই-ই ভাল

হয়েছে। কাটো। ফাড়ো। এই যে, একপাশে কেতরে গেছে গাছটা। মাথা নত করছে। লাথি মারো বেটীকে, হ্যাঁ, জোরসে মারো। আরও জোরে...না পড়ে যাবি কই...পড়ে যাচ্ছে...পড়ছে...গেছে... এই তো পড়ে গেছে...আরেকটু...দড়াম করে আছড়ে পড়ল।

পিছে সরে দাঁড়াল লোকটা, মুখখানা ঘামে ভিজে একাকার। গাছটার অবশিষ্টাংশটুকু দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর পায়ের কাছে–গুঁড়িটা। সাদাটে, কাটা গুঁড়িটা ফুট খানেক উঁচু।

তুষার পড়তে শুরু করল এসময়।

গাড়ি আর ট্রেইলর বাগানের গেটে নিয়ে এল ও। তারপর ডালগুলো কেটে নামিয়ে, বেঁধে বোঝা বানাল। বড় বড় ডাল ছোট ছোট টুকরো হয়ে গেল। মুখে মিহি বরফের ফুলের ছোঁয়া দিচ্ছে যেন তুষার। আলগোছে নেমে যাচ্ছে গলা বেয়ে। কাটা ডালগুলো ছেয়ে ফেলল তুষার, কঠিন করে তুলল লোকটার কাজ। কুঠারটা ভিজে গেছে, ঠিকভাবে ধরা যাচ্ছে না।

আঙুলগুলো কেমন অসাড় ঠেকছে ওর, ভাঁজ করতে কষ্ট হচ্ছে। খিল ধরে গেছে দেহে, হৃৎপিণ্ডের নীচে ব্যথা-ব্যথা ভাব। কাঠের বোঝা কি শেষ হবে না? সাড়ে চারটে বেজে গেছে, আঁধার ঘন হচ্ছে, এমন সময় ট্রেইলরে সব ডাল বোঝাই দেওয়া গেল।

গাছটাকে তিন ভাগে ভাগ করল ও, তারপর হিঁচড়ে নিয়ে ট্রেইলরে তুলল। নড়ার সাধ্য নেই আর। ধীরলয়ে শ্বাস বইছে, চিনচিন করছে বুকটা। ওর চোখে-মুখে তুষারকণার স্পর্শ।

ট্রেইলর পেছনে নিয়ে, পাহাড়ী ঢাল বেয়ে সাবধানে গাড়ি ড্রাইভ করল ও। পাবের উদ্ভাসিত আলো উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল ওকে।

দরজায় দাঁড়িয়ে বলল ও, 'কাঠ নিয়ে এসেছি।'

দু'একজন লোক ঘুরে চাইল বিস্ময়মাখা চোখে, হাঁ হয়ে গেল মিসেস হিলের মুখ। নিজের মন পছন্দ কোণে চলে গেল এবার লোকটা। পরক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে এল পাবের পরিবেশ।

মিসেস হিল একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আজ রাতে ফ্রী ড্রিঙ্ক আপনার।'

'না, না,' বলে উঠল ও। 'আমি সবাইকে খাওয়াব। কই, এসো তোমরা।'

সবার সাথে এই প্রথম খোলাখুলি মিশে গেল লোকটা। আন্তরিক পরিবেশে সবাই যোগ দিল ওর আমন্ত্রণে। এ সময় ফার্মের কর্মী, পরিচিত এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। লোকটার কাঁধে হাত রাখল ও।

'ওই মেয়েটার কী খবর?' জানতে চাইল।

'কোন্ মেয়েটা?' গ্লাস নামিয়ে রাখে ফার্মের লোকটা।

'ওই যে, যুদ্ধের সময় তোমাদের ফার্মে কাজ করত। সুন্দরী মেয়েটা। কালো চুল।'

'ও, শোনেননি আপনি? ও তো রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। চার বছর আগে।'

'জানতাম না,' বলল লোকটা। 'সরি।'

আবারও নিজের কোণে একাকী হয়ে গেল লোকটা। মারা গেছে সুন্দরী মেয়েটা। খতম।

পাব ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। তারা ঝিকমিক করছে, রাস্তায় পুরু বরফ। ট্রেইলরের বাঁধন খুলে রেখে দিল লোকটা। কাল খালাস করা যাবে কাঠ।

পাহাড়ী চড়াই বেয়ে, জাহাজের মত দুলতে দুলতে উঠছে ওর গাড়ি। হঠাৎই ডান পাশের চাকা দুটো খসে পড়তে, এক পাশে বসে পড়ল গাড়িটা। গভীর তুষারে দেবে গেছে, সাহায্য ছাড়া নড়ানোর সাধ্য নেই কারও। থাক পড়ে। আজ রাতে কেউ আর এ রাস্তা মাড়াবে না।

ঢাল বেয়ে হেঁটে বাসায় পৌঁছল সে। আঁধার আর শীতকাতুরে দেখাচ্ছে বাসাটাকে। তুষার মাড়িয়ে সন্তর্পণে আপেল গাছটার দিকে এগোল ও।

নবীন গাছটা এখন একাকী, কেউ ওকে আর গ্রাস করবে না। নক্ষত্রের দিকে উদ্বাহু ওটার ডাল-পালা। গায়ে তুষার চিকচিক করছে, রহস্যময়ী আর কামনামদির দেখাচ্ছে ওটাকে। স্পর্শ করতে মন চাইল লোকটার।

হাত বাড়াতে গেছে, পড়ে গেল এসময়। পায়ের পাতা মুচড়ে আটকে গেছে কীসে যেন। তুষারের নীচ থেকে কিছু একটা আঁকড়ে ধরেছে ওর পা। নড়তে চেষ্টা করল ও, কিন্তু সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ব্যথা।

বুড়ো গাছটির গুঁড়িতে, গভীর এক ফাটলে আটকে গেছে ওর পা। কাটা গুঁড়িটা সর্বশক্তিতে যেন চেপে ধরেছে ওকে। পা ছেঁচড়ে যতই সরে যেতে চেষ্টা করে, আরও চাপ বাড়িয়ে দেয় ওটা। সাহায্যের আশায় বুকফাটা চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। কিন্তু শুনবে কে, বাসায় কেউ থাকলে তো।

কোন আশা নেই, বাঁচার রাস্তা নেই। সকালে হয়তো কারও চোখে পড়বে সে, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন। তুষার ওকে ছেয়ে ফেলবে, প্রাণে মেরে ফেলবে।

প্রাণপণ চিৎকার করে, পা ছাড়ানোর চেষ্টা করল আবার লোকটা। বৃথা। এক বিন্দু নড়ল না ওর পাটা। দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল ও। তুষারের গভীর থেকে গভীরে চলে যাচ্ছে দেহটা।

একটা কাটা গুঁড়ি মাটির তলা থেকে উঠে এসে যখন ওর মুখ স্পর্শ করল, ঠাণ্ডা আর ভেজা, মনে হলো একটা হাত বুঝি ওটা; দ্বিধান্বিত আর আধো-আতঙ্কিত।

অন্ধকার রাতে, ওকে পুরু তুষারের নীচে টেনে নামানোর জন্য হাত বাড়িয়েছে ওটা।

মূলঃ ড্যাফনে দু মরিয়ের 'দ্য অ্যাপ্‌ল্ ট্রী'
রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

আলমারী বউ

নওফেল সূর্যের সাথে পাল্লা দিয়ে হাঁটছে। সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই। শীতের দিন দেখতে দেখতে মিলিয়ে যাচ্ছে। মরে আসছে রোদ। বাতাসে একটু একটু কুয়াশাও ভাসছে। সূর্য এখনও দিগন্তের উপরে, কিন্তু আর কতক্ষণ থাকবে সে নিজেও জানে না। যে কোন সময় তলিয়ে যাবে। নওফেল হাঁটার গতি আরও বাড়াল।

মতিমিস্ত্রীর দোকান থেকে বেরিয়েছে সেই চারটায়। পথে কোথাও থামেনি। সোজা চলেছে বাসায়। বাসাও বেশি দূরে নয়। গোপীবাগ থেকে বাসাবো। কিন্তু মুশকিল হয়ে গেছে অন্য জায়গায়। বলা নেই, কওয়া নেই, গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। কি হয়েছে কেউ বলতে পারছে না। কেউ বলছে, ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। কেউ বলছে, গোলমাল হয়েছে। নওফেল পড়ে গেছে বেকায়দায়। রাস্তায় রিকশা-টিকশা নেই। শাপলা চত্বর পেরিয়ে এসেও কিছু পাওয়া গেল না।

নওফেলের বাড়ি দিনাজপুর। বিয়ে করেছে ঢাকায়। নতুন বিয়ে। এক সপ্তাহও হয়নি। নতুন বিয়ের বর সকাল সকাল বাসায় ফিরবে, গাড়ি না পেলে বিরক্ত হবে, সারাক্ষণ পালাই-পালাই ভাব থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। নওফেলও তাই করছে। অফিস ছুটির পর এক সেকেন্ডও দাঁড়াচ্ছে না। কখনও কখনও আগেই বেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি পেতে দেরি হলে হেঁটেই রওনা হচ্ছে। সবই ঠিক আছে। আবার কিছুই ঠিক নেই। এর মধ্যেই অন্য একটা ব্যাপার

আছে।

নওফেল তাড়াহুড়া করছে অন্য কারণে। কারণটা এমন যা কাউকে বলা যায় না। বললে লোকে পাগল ঠাউরাবে। ভাববে মাথা খারাপ হয়েছে। পুলিশে-টুলিশেও দিতে পারে। নওফেল নিজেও প্রথমে সেরকম ভেবেছে। ভেবেছে ওর মাথায় সমস্যা হয়েছে। চিকিৎসা করলে সেরে যাবে। পরে ধারণা বদলেছে। বুঝতে পেরেছে, সমস্যা ওর মাথায় নয়, অন্য কোথাও।

নওফেলের সমস্যার সাথে সূর্যের সম্পর্ক আছে। সম্পর্ক আছে একটা কাঠের আলমারীর সাথেও। তবে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক ফাইজার সাথে। ফাইজা মানে ফাইজা কবীর। চৌধুরী এন্ড কোং-এর মালিক লুৎফুল কবীর চৌধুরীর মেয়ে। এ ধরনের মেয়ের অনেক আজগুবি বাতিক থাকে। সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়ে থাকাও তাদের জন্যে বিচিত্র নয়। তার উপর স্বামী যদি হয় ওই কোম্পানীর সেলস ম্যানেজার, তবে তো কথাই নেই। বউকে ঘুম থেকে জাগানোর দায়িত্ব তার থাকতেই পারে। কিন্তু নওফেলের ব্যাপারটা সেরকম নয়, একটু অন্যরকম।

প্রথম রাতে কিছুই টের পাওয়া যায়নি। বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে সন্ধ্যাবেলায়। কাজী বিদায় করে, খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে বাসরঘরে থিতু হয়ে বসতে বসতে বেজে গেছে রাত একটা। চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে গড়াগড়ি করছে। জানালা গলিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। সে আলোয় নওফেল ফাইজাকে দেখেছে। ফাইজা বিছানার এক কোনায় জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। মাথার ঘোমটা সরে গেছে। অনিন্দ্য সুন্দর মুখে রাত জাগার ক্লান্তি। কপালের টিপ আলগা হয়ে গেছে। চোখের কাজল লেগে আছে এখানে ওখানে। তারপরও কত সুন্দর!

না, ওদের প্রেমের বিয়ে নয়। আগে থেকে জানাশোনাও ছিল না। মা'র পছন্দের মেয়ে কবুল করেছে, তা-ও নয়। কবুল করতে

হয়েছে মালিকের ইচ্ছে। মালিক শর্ত দিয়ে চাকরি দিয়েছেন। শর্ত আর কিছু নয়, বড় মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। সে প্রথমে বিশ্বাস করেনি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল অফিসের ক্যাশিয়ার মকবুল। মকবুল রাগ করেনি। বাধাও দেয়নি। নওফেলকে যত খুশি হাসতে দিয়েছে। তারপর বলেছে, 'আপনার হাসি শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, শেষ হয়েছে,' নওফেল বলেছে। 'কি বলছিলেন, আবার বলুন।'

মকবুল আবার বলেছে। নওফেল আবারও হেসেছে। হাসতে হাসতেই জানতে চেয়েছে, 'আমাকে স্যারের পছন্দ হওয়ার কারণ কি?'

'কারণ-টারণ নেই। হুজুরের মর্জি।'

'মেয়ে দেখতে কেমন?'

'চমৎকার।'

'আপনি দেখেছেন?'

'দেখিনি। শুনেছি।'

'স্যারের ছেলেমেয়ে ক'জন?'

'তিনজন। তিনটেই মেয়ে।'

'অন্যদের বিয়ে হয়েছে?'

'একজনের।'

'ইনি কয় নম্বর?'

'সবার বড়।'

নওফেলের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েছে। এটাই কি তাহলে কারণ? কোন সমস্যা আছে নাকি?

'কোন রোগ-টোগ আছে?'

'জানি না।'

নওফেল নিজে নিজেই জানার চেষ্টা করেছে। মেয়ে দেখতে কুৎসিত কি-না, তা-ও খোঁজখবর নিয়েছে। অসুখ-বিসুখের কথা

জানতে পারেনি। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে, মেয়ে কুৎসিত নয়। নওফেলের ভাবনা তাতে আরও বেড়েছে। মেয়ে সুন্দর কি অসুন্দর, এটা নিয়ে ওর সমস্যা ছিল না। ওর দরকার ছিল চাকরি। আগের চাকরিতে চলছিল না। বেতন কম। কাঁধের উপর অসুস্থ মা, ছোট দুই ভাই। একটা চাকরির জন্যে যা যা দরকার সবই সে করতে রাজি ছিল। এ ধরনের বড়লোক সুযোগের সন্ধানে থাকে, ওর মত পাত্র পেলেই বিয়ের নামে বাতিল মাল গছিয়ে দেয়—এটা ওর জানা ছিল। ভেবেও রেখেছিল সেরকম। ঘর-সংসার গুছিয়ে নিয়ে, কিছু পয়সাকড়ি কামিয়ে আলাদা হয়ে যাও, মানা করছে কে? কিন্তু মেয়ে রূপবতী শুনে নওফেল একরকম ভয়ই পেয়ে গেল।

এবারেও ওকে বাঁচাতে এল মকবুল। পান খাওয়া দাঁত বের করে বলল, 'এটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন? এটা কোন সমস্যা হলো?'

নওফেল পাল্টা প্রশ্ন করেছে, 'এটা সমস্যা নয়?'

'আপনার কাজের সুনাম আছে, আছে না?'

'আছে।'

'আপনার ব্যবহারের সুনাম আছে, এটাও কি মিথ্যে?'

'না।'

'আপনার পূর্বপুরুষ জমিদার ছিল—স্যার তা-ও জানেন।'

নওফেল কথা বাড়ায়নি। আরও দুদিন ভেবে রাজি হয়ে গেছে। লুৎফুল কবীর সাহেবও দেরি করেননি। সাতদিনেই আয়োজন সেরে ফেলেছেন। ঢাকায় নওফেলের আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই। দিনাজপুরে এক খালু আছে, পক্ষাঘাতের রোগী। কাউকে দাওয়াত করার ঝামেলায় ওকে যেতে হলো না। জনাকয়েক সহকর্মী, দু'চারজন বন্ধুবান্ধব—ব্যস, বরযাত্রীর তালিকা শেষ। বিয়ের অনুষ্ঠান হলো কাকরাইলের এক কমিউনিটি সেন্টারে। সহজ, স্বাভাবিক অনুষ্ঠান। হৈ চৈ নেই, জাঁকজমক

নেই। মেয়ের ব্যবহারের কিছু জিনিস চলে এল মেয়ের সাথে। তার মধ্যে ছিল একটা আলমারী। সাধারণ কাঠের আলমারী।

নওফেল থাকে মধ্য বাসাবোর এক ভাড়া বাড়িতে। সে বাড়িতে ফাইজাকে নিয়ে আসা হলো। এ যেন এক রূপকথার রাত। কথাও শেষ হয় না, দেখাও শেষ হয় না। একসময় রাত ফুরিয়ে এল। আকাশের তারাগুলো হয়ে এল ফ্যাকাসে। ওরা বুকের ভেতর কথা জমা রেখে ঘুমুতে গেল। দেয়ালঘড়িতে তখন বাজে সাড়ে পাঁচটা।

চোখে ঘুম লেগে আসবে, এসময় কেউ ওকে ডাকল। শুধু ডাকল না, কাঁধে হাত রেখে ধাক্কাও দিল। নওফেল ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ফাইজা।

'কিছু বলবে?' নওফেল অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'আমার সময় হয়েছে।' ফাইজা আস্তে আস্তে বলল।

'সময়? কিসের সময়?' নওফেল আকাশ থেকে পড়ল।

নওফেলের চেয়েও অবাক হলো ফাইজা। আয়ত চোখে বিস্ময় নিয়ে বলল, 'তুমি জানো না?'

'কি জানি না?'

'বাবা বলেনি?'

'কি বলবে?'

ফাইজা আলতো পায়ে বিছানা থেকে নামল। অবিন্যস্ত শাড়ি ঠিক করল। আয়নায় দেখল নিজেকে। তারপর নওফেলের কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুমি আসলেই জানো না?'

নওফেল না-বোধক মাথা নাড়ল।

'অথচ,' ফাইজা বলল, 'বাবা বলেছিল, তোমাকে সব বলবে। তাই রাজি হয়েছিলাম।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

‘বুঝতে হবে না। আমার সাথে এসো।’

‘কোথায়?’

‘পাশের ঘরে।’

নওফেলের ঘুম ঘুম ভাব যাচ্ছে না। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। আবার ফাইজার সাথে যেতেও ইচ্ছে করছে। দুটো ইচ্ছে একসাথে পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ফাইজার পেছনে পেছনে চলল। যেন নিশিতে পাওয়া কুকুর।

রাত তখনও ভোর হয়নি। আঁধারও কাটেনি। রাস্তায় জ্বলছে নিয়নবাতির আলো। সে আলোয় নওফেল দেখল ফাইজা একটা কাঠের আলমারীর সামনে থামল। আঁচল থেকে চাবি বের করল। ডালা খুলল।

তারপর?

তারপর থেকে নওফেলের সব এলোমেলো হয়ে গেছে। সমস্ত চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেছে। যুক্তি এলোমেলো হয়ে গেছে। রুটিনও এলোমেলো হয়ে গেছে। দিনগুলো হয়ে গেছে রাত, রাতগুলো দিন। আগে ওর কড়াকড়ি ছিল অফিসে। এখন কড়াকড়ি হয়েছে বাসায়। লোকে ভাবছে নতুন বিয়ে, তাই কড়াকড়ি। হায়রে নতুন বিয়ে!

নওফেল বিয়ে করেছিল চাকরির জন্যে। সেই চাকরি বাদ্ দিয়ে সে খুঁজতে লাগল অন্য জিনিস। অন্য জিনিস মানে একজন মিস্ত্রী। যেমন তেমন মিস্ত্রী নয়, কাঠমিস্ত্রী। মিস্ত্রীর নাম মতি মিয়া। ওবায়দুর রহমান বলেছে মতি মিয়াকে পাওয়া গেলে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। ওবায়দুর রহমান লুৎফুল কবীর সাহেবের বাসার দারোয়ান। পুরানো লোক। বেহুদা কথা বলার লোক না। যা বলেছে, নিশ্চয়ই জেনেশুনে বলেছে।

নওফেল মতি মিয়াকে খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে শরীরের ওজন কমতে লাগল। বয়সও বাড়তে লাগল। কিন্তু আশা ছাড়ল না। একদিন খবর পাওয়া গেল মতি মিয়াকে নর্থসাউথ

রোডে দেখা গেছে। নওফেল ছুটল নর্থসাউথ রোডে। গিয়ে দেখল, খবর ভুয়া। মতি মিয়া নাকি আছে পীরজঙ্গী মাজারে।

শেষ পর্যন্ত এই পীরজঙ্গী মাজারেই মতি মিয়াকে পাওয়া গেল। পাওয়া গেল একটা ওষুধের দোকানে। না, ওষুধ কিনছে না, দোকানের ফার্নিচার মেরামত করছে। কারও সাথেই কথা বলছে না। কথা বলার সময় নাকি নেই। নওফেলকে দেখেও না দেখার ভান করল। নওফেল পড়ে গেল দুশ্চিন্তায়। ওবায়দুর রহমান বলেছে কাজ না হলে তার কথা বলতে। নওফেল ওবায়দুর রহমানের কথাও বলল। লাভ হলো না। মতি মিয়া ওবায়দুর রহমানকে চিনতেই পারল না।

নওফেল অন্য রাস্তা ধরল। মতি মিয়াকে চা-টা খাওয়াল। মাল ডেলিভারী নেয়ার লোভও দেখাল। তারপর মতি মিয়া মুখ খুলল। কিন্তু মুখ না খুললেই যেন ছিল ভাল।

পুরানা পল্টনের কাছে এসে একটা রিকশা পাওয়া গেল। ঘড়িতে তখন পৌনে পাঁচটা। নওফেল দরদাম না করে উঠে পড়ল। এই শীতেও সে ঘামছে কুলকুল করে। গতকাল সূর্য ডুবেছে পাঁচটা বিশে। আজ কি আরও আগে ডুবে যাবে?

রিকশা ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। নওফেল ভাবছে ফাইজার কথা। ফাইজা এখন কি করছে? নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে আছে। এটাকে কি ঘুম বলা যায়? হয়তো বলা যায়, হয়তো যায় না। মানুষ ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখে, ফাইজাও কি দেখে? এই যে এখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, ও কি বুঝতে পারছে? ওর ঘুমও কি পাতলা হয়ে আসছে?

নওফেল প্রথম প্রথম আরেকটা সম্ভাবনার কথা ভাবত। সে ভাবত পুরোটাই ফাইজার ভান। ফাইজা ওর সাথে মজা করছে। সে অফিসে গেলেই মেয়েটি উঠে পড়বে। ফাইজাকে আলমারীর ভেতর ঢুকতে দেখে সে সন্দেহ আরও বেড়েছে। একজন মানুষ আর যাই হোক ওরকম জায়গায় ঘুমুতে পারে না। রোজ রোজ

একই সময়ে জাগতেও পারে না। নওফেল একদিন কিছু না বলে বাসায় চলে এল। ফাইজার নিষেধ না মেনে আলমারীও খুলল। তারপর?

নওফেল কাঁপা কাঁপা হাতে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। ভয়ে ভয়ে তাকাল চারপাশে। মনে হচ্ছে ওর হার্টবিট সবাই শুনছে। এই যে এত লোকজন, এদের কাছে সব বলে দিলে কেমন হয়? মতিমিস্ত্রীর কাছে আজ যা যা শুনেছে, সব পত্রিকায় ছাপিয়ে দিলে কেমন হয়? একজনও কি বিশ্বাস করবে না? কেউ কেউ নিশ্চয়ই করবে? পরীক্ষা করে দেখতে অসুবিধা কি?

দূর থেকে খিলগাঁও রেলক্রসিং দেখা যাচ্ছে। নওফেলের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কি হয়েছে ওখানে? অ্যাক্সিডেন্ট? ছিনতাই? ডাকাতি? নাকি বাজার বসেছে? এত লোকজন কেন?

রিকশাওয়ালা বলল, 'স্যার, মনে হয় গোলমাল হয়েছে।'

নওফেলের গলার কাছে থুতু জমছে। সে ঢোক গেলার চেষ্টা করল। সময় নেই, হাতে সময় নেই। যা করার এখনই করতে হবে। অন্য পথ দিয়ে ঘুরে গেলে দেরি হয়ে যাবে। আবার এখানে বসে থাকাও চলবে না।

নওফেল লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নামল। ভাড়া মেটাল। ভাড়া কিছু বেশিই হয়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই। ঝগড়া করার সময় এখন নেই। সে অফিসের ব্যাগ হাতে দৌড়াতে লাগল। যেভাবেই হোক, এই জ্যাম পেরোতে হবে, পেরিয়ে আবার রিকশা নিতে হবে। স্কুটার পেলে আরও ভাল হয়। হাতে সময় আছে মাত্র পঁচিশ মিনিট। পঁচিশ মিনিট পর সূর্য ডুবে যাবে।

এর আগেও একবার হয়েছিল এরকম। অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। দেরি হওয়ার কারণ ফেয়ারওয়েল। হেডক্লার্ক আউয়াল সাহেবের ফেয়ারওয়েল। বড় সাহেবের হুকুম সবাইকে থাকতে হবে। উপায় ছিল না। সেই ফেয়ারওয়েল শেষ হতে হতে পাঁচটা বেজে গেল। নওফেল ঝুঁকি নিল না। অফিস

থেকে বেরিয়ে স্কুটার নিল। শাহজাহানপুর ছাড়িয়ে এসে সেই স্কুটার নষ্ট হয়ে গেল। আরেকটা স্কুটার নিয়ে কোনরকমে যখন এসে পৌঁছাল তখন সূর্য ডুবে গেছে।

এখনও ভাবলে নওফেলের গায়ে কাঁটা দেয়। সে দাঁড়িয়ে আছে আলমারীর সামনে। একবার ভাবছে খুলবে, আবার ভাবছে খুলবে না। ফাইজা বার বার সাবধান করেছে, 'খবরদার, সূর্য ডোবার পর আলমারী খুলবে না। সূর্য ডোবার আগেও নয়। আলমারী খুলবে সূর্যাস্তের সাথে সাথে। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

নওফেল একবার হাত বাড়াচ্ছে, আবার গুটিয়ে নিচ্ছে। আড়চোখে ঘড়িও দেখছে। সূর্য মাত্র ডুবেছে। এটাকে সূর্য ডোবার আগের অবস্থা বলা যাবে না। সূর্য ডোবার পরের অবস্থাও কি বলা যাবে? সূর্য তো মাত্র ডুবেছে।

দোটানায় ভুগলে শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না। কিন্তু নওফেল আর দোটানায় ভোগেনি। সাহস করে ডালা খুলে ফেলেছে। ফাইজাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছে। কোন অঘটন ঘটেনি। কিন্তু আজ?

আজ মনে হচ্ছে শেষরক্ষা হবে না। বাসায় পৌঁছানোর আগেই সূর্য ডুবে যাবে। মতি মিয়া যা যা বলেছে, তার শতকরা দশভাগও যদি সত্যি হয়, তাহলে আজ তার জন্যে ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে।

'আলমারীটা ছিল খান বাহাদুর হায়দার আলী শিকদারের,' মতিমিস্ত্রী শুরু করেছিল এভাবে। 'আমার দাদা আলতাফ মিস্ত্রীই তাঁকে আলমারীটা বানিয়ে দেয়।'

'তারপর?'

'আমার দাদা ছিলেন পাগল কিসিমের মানুষ। সারা জীবন বনে জঙ্গলে কাটিয়েছে। কোন্ কাঠ কোন্ জঙ্গল থেকে এনেছে, নিজেও বলতে পারবে না।'

নওফেল চিন্তিত হয়ে ঘড়ি দেখেছে। মতি মিয়ার লম্বা ভূমিকা শোনার মত অবস্থা ওর নেই। ওকে ফিরতে হবে এক ঘণ্টার মধ্যে। কথা যা শোনার এর মধ্যেই শুনতে হবে।

'তারপর? আলমারীটার কি হলো?' নওফেল গল্প সংক্ষিপ্ত করতে চাইল।

'তারপর দাদা নিখোঁজ হয়ে গেল।' মতিমিস্ত্রী আলমারীর ধারেকাছেই গেল না। 'কিভাবে কি হলো কেউ বলতে পারল না। দশগ্রামের মানুষ খোঁজাখুঁজি করল। বাজারে ঢোল-শহরৎ করল। দাদা আর ফিরল না।'

'আলমারীর কি হলো?' নওফেল দ্বিতীয়বার জানতে চাইল।

'আমার বাবা ইয়াকুব মিস্ত্রীর সন্দেহ হলো।' মতিমিস্ত্রী ফাঁদে পা দিল না। 'বাবা গোপনে গোপনে খোঁজখবর করতে লাগল।'

'কি সন্দেহ?'

'এই কাঠ আর কোথাও পাওয়া যেত না। বিদেশেও না। এরকম আলমারীও নাকি জীবনে কেউ দেখেনি। হয়তো কারও না কারও লোভ লেগে গিয়েছিল।'

'লোভ? কিসের লোভ?'

'পৃথিবীর সবচেয়ে দামী কাঠের মালিক হবার লোভ।'

'গাঁজার নৌকা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে।' নওফেল মনে মনে বলল। মুখে জানতে চাইল, 'তারপর?'

'পাকিস্তান আমলে খানবাহাদুর সাহেবের জমিদারী নিলামে উঠল। পাঁচটা আলমারী বিক্রী হলো একলক্ষ টাকায়। একটা আলমারী লুৎফুল কবীর সাহেবের বাবা নিলামে কিনে নিলেন।'

'কোন্‌টা? এটা?'

'এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল।' নওফেলের কথায় মতিমিস্ত্রী কানই দিল না। 'কিন্তু হঠাৎ আমার বাবা নিখোঁজ হয়ে গেলেন।'

'কিভাবে?' নওফেল নড়েচড়ে বসল।

'নিখোঁজ হওয়ার আগে বাবা গিয়েছিলেন জামালপুর। কার

কাছ থেকে যেন একটা আলমারীর খোঁজ পেয়েছিলেন। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না।'

'আপনি খোঁজ করেছিলেন?'

'করেছিলাম।' মতিমিস্ত্রী রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। 'কেউ হদিস দিতে পারেনি।'

'আর...আলমারী?'

'নিখোঁজ হওয়ার আগে বাবা অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতেন।' মতিমিস্ত্রী নওফেলের কথায় কান দিল না। 'একটা কথা প্রায়ই বলতেন...'

'কোন্ কথা?'

মতিমিস্ত্রী খোঁচা খোঁচা দাড়িসুদ্ধ গাল চুলকাল। কোন জবাব দিল না।

'কোন্ কথা?' নওফেল দ্বিতীয়বার জানতে চাইল।

'আমার পূর্বপুরুষেরা সবাই...' মতিমিস্ত্রী থেমে গেল।

'থামলেন কেন? বলে যান।' নওফেল অধৈর্য হয়ে উঠল।

'সবাই নাকি ওখানে আছে।'

'কোথায় আছে?' নওফেল চমকে উঠল।

'ওই আলমারীতে।'

গাঁজা, স্রেফ গাঁজা–নওফেল রেলক্রসিং পেরিয়ে রিকশা খুঁজল। সবই পাগলের প্রলাপ। একটা কাঠের আলমারীর মধ্যে কয়েকটা পুরুষ থাকতে পারে না। একজন জলজ্যান্ত মানুষ দিনের বেলায় সেই আলমারীতে ঘুমুতেও পারে না। নওফেল বুঝতে পারছে ফাইজা তাকে বোকা বানিয়েছে। শুধু ফাইজা নয়, সবাই। মকবুল, ওবায়দুর, এমনকি মতিমিস্ত্রীও। সে যে বোকাসোকা ধরনের, কোন মারপ্যাঁচ বুঝতে পারে না–এটা সবাই জানে। হাসাহাসিও করে। গেল পয়লা এপ্রিলে অফিসের লোকজন ওকে বোকা বানিয়েছে। আর কাউকে বানাতে পারেনি। এ থেকে কি বোঝা যায়?

নওফেলের কাছে ধীরে ধীরে সব পরিষ্কার হচ্ছে। মকবুলের রসিকতা, ওবায়দুরের গল্প, ফাইজার মুচকি হাসি–সবকিছুর অর্থ বোঝা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, ওকে নিয়ে মজা করা হয়েছে। এখন ওরও উচিত মজা করা। কিছু বুঝতে না দিয়ে আরও ক'দিন চালিয়ে যাওয়া। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে সবাইকে বোকা বানানো।

নওফেল রিকশা পেয়ে গেল। এবারের রিকশাওয়ালার বয়স কম। টানছে বেশ দ্রুত। নওফেল আরাম করে পা ছড়িয়ে বসল। এখন আস্তে চালালেও কোন অসুবিধা নেই। বাসায় পৌঁছুতে পারলেই হলো। এতক্ষণ যে দুশ্চিন্তায় ভুগেছে, তার জন্য এখন লজ্জা লাগছে। নিজেকে গালি দিতে ইচ্ছে করছে।

একটা জায়গায় মনটা খুঁতখুঁত করছে। শুধু একটা জায়গায়। দুপুরের সেই ঘটনাটা যেদিন অফিস থেকে আগেভাগে চলে এসেছিল, আলমারীর ডালা খুলেছিল। কি দেখেছিল ভেতরে?

নওফেল মনে করার চেষ্টা করল। সে খুব ভয় পেয়েছিল। কেন ভয় পেয়েছিল, বলতে পারবে না। ভাল করে না দেখেই ডালা বন্ধ করে দিয়েছিল। এর মধ্যে যতখানি দেখেছে, ফাইজাকে দেখেছে। ফাইজা চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছিল। কিংবা, বলা যায় না, হয়তো জেগে ছিল। এখন তো মনে হচ্ছে জেগেই ছিল। কিন্তু তারপর? আর কি কিছু দেখেনি?

'আলমারীটা বড়। পুরানো আমলের। ভুলে গেলে চলবে না।' নিজেকে শাসাল নওফেল। 'ফাইজা ছাড়াও সেখানে নানা জিনিস থাকতে পারে। কি দেখেছ ভাল করে ভেবে দেখো।'

ভেবে দেখার আগেই গন্তব্যে চলে এল। রিকশা বাসা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। নওফেল রিকশা থামাল। রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মেটাল।

বাসা যেমন ছিল, তেমনই আছে। আগের মতই তালা ঝুলছে দরজায়। জানালাগুলোও বন্ধ। নওফেল চাবি বের করে দরজার

তালা খুলল। এই তালা লাগানো নিয়েও ফাইজার সাথে কম ঝগড়া হয়নি। নওফেল কিছুতেই তালা লাগাবে না। ভেতরে জলজ্যান্ত মানুষ রেখে বাইরে তালা লাগাবে কেন? কিন্তু ফাইজার এক কথা, তালা লাগাতেই হবে। সে থাকবে ঘুমিয়ে। খালি বাসা, পাহারা দেবে কে?

ভেতরে ঢুকে বাতি জ্বালাল নওফেল। একটা ইঁদুর দৌড়ে পালাল দরজার কাছ থেকে। দুটো আরশোলা ওড়াওড়ি করছে। এছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কোন নড়াচড়াও নেই। যা যেভাবে ছিল, সেভাবে আছে। আলমারীও আছে আলমারীর জায়গায়। তালাবদ্ধ।

নওফেল আরেক দফা মতি মিয়ার গোষ্ঠী উদ্ধার করল। ওবায়দুর রহমানকেও ছাড়ল না। ওরা তাকে আলিফ লায়লার গল্পের ভেড়া বানাতে চেয়েছিল। পারেনি। এর জবাব একদিন ওদের দিতে হবে। তবে এখন নয়। এখন খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। দুপুরে খাওয়া হয়নি। মতি মিয়ার সাথে এক কাপ চা, দুটো সিঙ্গারা–এছাড়া পেটে আর দানাপানি পড়েনি। এখন যদি ফ্রিজে কিছু থাকে, ভাল, না থাকলে মরেছে। ফাইজা ঘুম থেকে উঠে রান্না চড়াবে। তারপর খাওয়াদাওয়া।

নওফেলের রাগ পানি হয়ে গেল। মনে পড়ল মেয়েটা সারাদিন না খেয়ে আছে। মজা করুক আর যাই করুক, না খেয়ে থাকাটা নিশ্চয়ই কষ্টের। এক জায়গায় বন্দী থাকাটাও কষ্টের। বেচারী তো আর জানে না আজ ওর দেরি হবে।

নওফেল চাবি দিয়ে আলমারী খুলছে, এসময় ভেতর থেকে আবার কেউ ধাক্কা দিল। জোরে। কেন যেন নওফেলের মনে হলো এ হাত ফাইজার নয়, অন্য কারও। ওর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। শরীর অবশ হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল চাবি। মনে হলো ভুল হয়ে গেছে কোথাও, ভয়ঙ্কর ভুল। এ ভুল

শোধরানোর আর সুযোগ নেই।

কোন কারণ ছাড়া একটা গল্প মনে পড়ল। এক কাঠমিস্ত্রীর সাথে এক নবাব কন্যার বন্ধুত্বের গল্প। কাঠমিস্ত্রীর নাম আলতাফ। নবাব কন্যার নাম ফারিয়া। আকাশ কালো করা এক ঝড়ের দিনে আলতাফ নিখোঁজ হয়ে যায়। নিখোঁজ হয়ে যায় ফারিয়াও। পরে ফারিয়ার লাশ পাওয়া যায় কাঠের আলমারীতে।

তবে কি আলতাফ নিখোঁজ হয়নি? তাকে কি গুম করা হয়েছিল ওই কাঠের আলমারীতে? লোকে যে বলে ফারিয়া আসলে আলতাফের মেয়ে, নিঃসন্তান হায়দার আলী শিকদার তাকে কিনে নিয়েছিলেন–এটাও কি সত্য? বাপের শোকেই কি ফারিয়ার ওই স্বেচ্ছামৃত্যু? তাহলে ফাইজা কে? সে কেন ওই আলমারীতে ঘুমুতে যায়? ফারিয়ার সাথে তার সম্পর্ক কি?

নওফেল দাঁড়িয়ে আছে সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে। আলমারীর ডালা খুললেই যা কিছু সত্য, তা হয়ে যাবে মিথ্যা। মিথ্যা হয়ে যাবে সত্য। আলতাফ মিস্ত্রী বেরিয়ে আসবে, ইয়াকুব মিস্ত্রী বেরিয়ে আসবে, ফারিয়াও বেরিয়ে আসবে। আবার না খুললে একটা গাঁজাখুরি গল্পের কাছে হার মানতে হবে। ফাইজাকেও বের করা যাবে না। এখন সে কোনদিকে যাবে?

নওফেল পড়ে গেছে দোটানায়। একবার মনে হচ্ছে, মতিমিস্ত্রী যা বলেছে, তা-ই সত্যি। আলমারী খোলা ঠিক হবে না। আবার মনে হচ্ছে, সব মিথ্যে, বুজরুকি। আষাঢ়ে গল্প। আলমারী খুললেই ধরা পড়বে।

শেষ পর্যন্ত নওফেল আলমারীটা খুলে ফেলল।

শাহেদ ইকবাল

চোর

শ্রাবণ মাস। আকাশে কুচকুচে কালো মেঘ জমে আছে। দিনরাত এই অবস্থাই চলছিল, যেন কারও আদেশ না পাওয়ায় বৃষ্টি ঝরিয়ে নিজেকে হালকা করতে পারছিল না।

এখন বাজে রাত আড়াইটা। সন্ধে থেকে বর্ষণ শুরু হয়েছে। বালিয়াদীঘি গ্রামের একটি অশুভ রাত। আজ বৃষ্টি অনেকটা ধরে এসেছে বটে, কিন্তু ঝিরঝিরে ফোঁটায় বরফের মত ঝরছে। গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ কলিমদ্দি শেখের ঘরের দরজায় একটি রহস্যময় লোক দাঁড়িয়ে। কালো বোরখায় ঢাকা তার আপাদমস্তক। পায়ে রাবারের স্যান্ডেল, নিঃশব্দে চলাফেরা করার জন্য রাবার সোল দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি।

লোকটির হাতে একটা কিরিচ, ফলাটা এগারো ইঞ্চি লম্বা। দুই প্রান্তই ধারাল। চিকন হালকা পাতলা ছিপছিপে কিরিচটি সে খুব সন্তর্পণে ঢুকিয়ে দিল সাবেকী আমলের কাঠের তৈরি দরজার দু'কবাটের ফাঁকের ভিতর কবাটের গায়ে হুড়কো সিস্টেম। উপর দিকে হুড়কো উঠিয়ে দরজা খুলতে হয়। চাকুটি হুড়কোর নীচে ঠেকিয়ে দিয়ে ধীরে, অতি ধীরে উপরে ওঠাতে লাগল। প্রথম দফায় কিছুদূর পর্যন্ত হুড়কোটা উঠে যাবার পর হঠাৎ কোথায় যেন আটকে গেল, কিরিচে একটুখানি চাপ দিতে হলো। কিন্তু চাপটা বেশি পড়ে যাওয়ায় খটাস করে উল্টোদিকে পড়ে গেল। নিস্তব্ধ ঝিঁঝি ডাকা রাতে সেই শব্দ বোমা ফাটাল। ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে। ভিতরে ঘুমন্ত মানুষগুলো কি জেগে গেছে? রহস্যময়

লোকটা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল স্থির হয়ে, হাতটাও নামায়নি দরজা থেকে, চাকুসহ ধরেই আছে। মেরুদণ্ড বেয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে ঘাম। প্রায় ১০ মিনিট ওখানেই সম্মোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। না, ভিতরে কেউ জাগেনি। এবার আস্তে চাপ দিল দরজার কবাটে। ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল দরজাটা। কোনমতে দৌড় দেওয়ার প্রবণতা সামলাল সে।

এবার বোধহয় বাড়ির কর্ত্রী জেগেছে। কলিমদ্দি শেখ আজ রাতে বাড়িতে নেই। সে জমির ধারে শ্যালো মেশিনের ঘরে শুতে গেছে। মেশিন ঘরটি ধুধু পাথারের ঠিক মাঝখানে। উপায় নেই, কয়েকদিন ধরেই গ্রামের বিভিন্ন লোকের শ্যালোর পার্টস চুরি যাচ্ছে। পাহারা দেওয়ার জন্য চাকরটা থাকে, তারও আবার দুপুর থেকে জ্বর, সে কারণে কলিম শেখকেই যেতে হয়েছে।

দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে কলিম শেখের বউয়ের ঘুম ছুটে গেল। সে ভাবল তার স্বামী ফিরেছে। জড়ানো গলায় বলতে লাগল, 'কে? হাসুর বাপ নিকি? তা এত রাতে না আলে কী হতনি? রোজ রাত্তে আপনের এক বায়না...,' বলে হাসির মত একটু শব্দ করল। আগন্তুক তখন ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। হ্যারিকেনের নিভু নিভু আলোয় তাকে কলিমের স্ত্রীর ঘুম জড়ানো চোখ ঝাপসা একটা কাঠামোর মত দেখল শুধু। আগন্তুক সোজা হেঁটে চলে গেল ঘরের কোণে রাখা কাঠের আলমারিটার দিকে। সেখানে টিনের পাতিলের ভিতর রাখা ছিল পনেরো হাজার টাকার একটি বান্ডিল। মূর্তি বান্ডিলটি তুলে নিয়ে সোজা হেঁটে চলে এল খোলা দরজা দিয়ে একেবারে ঘরের বাইরে, তারপর হনহন করে হাঁটা শুরু করল।

ততক্ষণে কলিমদ্দি শেখের স্ত্রী তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার দিয়ে উঠেছে। আজ বিকেলে হাট থেকে মরিচ বিক্রি করে নগদ ১৫০০০ টাকার ১টি বান্ডিল এনে রেখেছে তার স্বামী। আর এই গভীর রাতে সেই টাকা কেন দরকার পড়বে হাসুর বাপের? সব

কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। এ তার স্বামী নয়, অন্য কেউ! আর তখনই চিৎকারটা দিল সে বিছানায় শুয়ে শুয়েই।

'চোর! চোর! ও আল্লা, হামাকেরে ট্যাকা লিয়ে চলে যাচ্চে! ধর! ধর! ও মিজান ভাইজান, ও হাসু...' বলতে বলতে সে দরজার কাছে রাখা বাঁশটা নিয়ে দিল দৌড় চোরের পিছু পিছু। আর চেঁচাতে থাকল রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে। পিল পিল করে গোটা গ্রামের লোক বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। পুরুষ মহিলা সবাই দিশাহারা। সবার চোখ টকটকে লাল। কে কোন দিকে চোরকে ধরতে ছুটবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

এদিকে বোরখা পরা চোর ততক্ষণে পিচ্ছিল লাল মাটির ভেজা পথ ধরে প্রাণপণে দৌড় দিয়েছে। পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে বারবার, তবু সে পেছনে ধেয়ে আসা লোকগুলোর তুলনায় কিছুটা পথ এগিয়ে রয়েছে।

গ্রামের জোয়ান লোকগুলো লাঠি-সোঁটা হাতে 'চোর' 'চোর' 'ধর' 'ধর' বলে খানাখন্দ ভেঙে তাকে খুঁজতে খুঁজতে ছুটে আসছে। বৃষ্টিতে ভেজা অত্যন্ত পিচ্ছিল পথে দড়াম দড়াম করে পড়ছেও অনেকে, তারপরেও চোর ধরার জন্য তারা সকলে বদ্ধপরিকর।

অতঃপর প্রাণভয়ে ছুটে পালানো একটা খরগোসের মত চোরটিকে সবে হাতেনাতে ধরে ফেলল প্রায় তিনঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর।

জামাল প্রথম ওর নাগাল পেয়েছিল। সে দৌড়াতে দৌড়াতে টর্চের আলোয় হঠাৎ দেখল তার হাতের ডানপাশের ঢোল কলমীর ঘন ঝোপ থেকে একটি লোক বের হয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। জামাল তার হাতের মোটা মুগুরটি ছুঁড়ে মারল পলাতকের পা লক্ষ্য করে। ক্যাঁৎ করে ভারি শরীরটা নিয়ে কাদা পানির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল চোরটি।

গ্রামের জনগণ বিস্ফোরিত নেত্রে ভোরের বৃষ্টিস্নাত মলিন

আলোয় দেখল তারা এই গ্রামেরই বিখ্যাত সিঁধেল চোর 'পরী চোর'কে ধরেছে। তবে পরীর কাছে কালো বোরখা বা টাকা পয়সা কিছুই পাওয়া গেল না। এইবার নিয়ে পরী ধরা পড়ল মোট চারবার। ওর একটা হাত ভাঙা। আগের বার ধরা পড়ার পর ভাঙা হয়েছিল। আর শরীরে অসংখ্য ছোট বড় প্রহারের ক্ষত, গহ্বরগুলো চকচক করছে।

পরীকে বাঁধা হলো স্কুল ঘরের মাঠের পতাকার স্ট্যান্ডের সাথে। শুরু হলো তার উপর নির্যাতন।

স্কুল ঘরের মাঠে চোরকে ঘিরে ছেলে-বুড়ো-জোয়ান সবাই বসে পড়েছে। প্রথম দফায় ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গণপিটুনিতে পরী চোরের চোখ মুখ ফুলে আছে। সে মাথাটা নিচু করে বুকের সাথে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে।

জনগণের মধ্যে কলিমদ্দি শেখের রাগটা যেন সবচাইতে বেশি। সে লোহার একটা রড কোথাও থেকে সংগ্রহ করে এনেছে চোর পেটাবে বলে। রডটা দিয়ে ধাম ধাম করে চোরের কাঁধে-পিঠে আট-দশটা বাড়ি লাগিয়ে বলল, 'হামার ট্যাকা কুন্টি লুকাছু, ক?'

পরী মিনমিন করে উত্তর দিল, 'ভাইজান, কলিম শেখ, আজ রাতত হামি কোন চুরি করিনি, ভাই। আল্লার কসম। ঝোপের মদ্যে বসে জুয়াত জেতা ট্যাকার হিসাব করতেই আপনেরা হামাক ধরে ফালালেন। ভয়ে দৌড় দিছি, ভাই, চুরি করিনি...' চোরের কথা শেষ না হতেই আবার শুরু হলো রডের বাড়ি। কলিম শেখ ওর হাতে পায়ে বাড়ি মারল এবার। 'ফের আবার মিছা কতা কস্...হারামজাদা...'

সকলে যতই বলে, 'বল, টাকা কোথায় রেখেছিস?' চোর ততই বলে সে আজ রাতে কোন চুরি করেনি, আর তখনই শুরু হয় তার উপর অকথ্য অত্যাচার।

অতঃপর ঠিক হলো টাকা কোথায় রেখেছে না রেখেছে বা চুরি সে আদৌ করেছে কি করেনি সে বিচার তোলা থাক। চোর তো

ধরা পড়েছে, কাজেই তাকে শিক্ষাটা আগে দেওয়া হোক।

এতক্ষণ গ্রামের যুবকশ্রেণী মজা দেখছিল, আর মধ্য বয়স্করা পিটাচ্ছিল।

এবার যুবকরা তৎপর হলো। তারা ধীরে ধীরে লুঙ্গি তুলে কাছা মারল। বলল, 'চাচা মিঞারা সরেন তো, আপনেগের এই রকম মান্ধাতার আমলের মারে কাম হবি না, এইডাক হামাকেরে হাতত ছ্যাড়ে দেন।'

ইতিমধ্যে পরী চোর প্রচুর মার খেয়েছে, সারা শরীর জখমের মত লাল লাল চাকা চাকা দাগে ভরে গেছে। ৮-৯টি ক্ষত থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। তবু মুখ দিয়ে রা সরেনি বা ব্যথায় ককিয়ে ওঠেনি। মার খেয়ে চুপ থাকাটাই তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু উঠতি তরুণদের অত্যাচার সম্বন্ধে তার কিছুটা হলেও ধারণা আছে, তাই মাথাটা সোজা করে আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রইল পরী।

জব্বার নামে এক ছোকরা উঠে দাঁড়াল। তার হাতে একটা সাইকেলের স্পোক। সে ধীরে-সুস্থে পকেট থেকে ম্যাচ বের করে কিছু পাতা আর কাগজ কুড়িয়ে এনে একটা আগুন তৈরি করল। তারপর সেই আগুনে স্পোকটি পুড়িয়ে লাল করতে আরম্ভ করল।

শহীদুল নামে আরেক জন উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণের মত করে সকলের উদ্দেশে বলতে লাগল, 'ভাইসব, এই চোরের লাজ-লজ্জা-শরমের কোন বালাই নাই, ভয় তো নাই-ই। এ্যার একটা হাত ভাঙা হছিল, তাও চুরি বন্ধ হয় নাই। আজ হামরা এ্যার একখান পাও ভাঙ্গমু আর একটা চোখ উপড়ে লিয়ে ছাইড়া দিমু…,'

কথা শেষ না হতেই ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ গ্রামের চেয়ারম্যানের ছেলে খোকন দৌড়ে এল। তার হাতে চকচক করছে সদ্য নতুন কেনা একটা ব্লেড। কেউ কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই খোকন ব্লেডটা পরীর নাক বরাবর ধরে দু'ঠোঁটের উপর দিয়ে একেবারে থুতনি পর্যন্ত দিল একটা পোঁচ। ধারাল ব্লেডের

একটা টানেই পরীর ঠোঁট দুটো চিরে দু'ফাঁক হয়ে গেল, সেখানে একজোড়া ঠোঁটের স্থলে দুই জোড়া ঠোঁটের সৃষ্টি হলো। প্রথম দুই সেকেন্ড কোন রক্ত এল না, কিন্তু তার পরপরই শুরু হলো ঝরঝর বর্ষণ। মনে হচ্ছে পরীর পেট থেকে ভক্‌ভক্ করে উঠে আসছে রক্ত স্রোত। এই প্রথম পরী চোর গগনবিদারী একটা চিৎকার দিয়ে গাছের পাখি উড়িয়ে দিল।

খোকন দু'হাত উপরে তুলে আনন্দে চিৎকার করছে। 'বাজী জিতে গেনু, ১০০ ট্যাকা, ১০০ ট্যাকা…ক্যা বে হাফিজ, পারি না বলে?'

জব্বারের স্পোকটা ততক্ষণে টকটকে লাল। স্পোকের মাথায় নীল আগুনের শিখা নাচছে। সে উঠে এল ডান হাতে সেটা নিয়ে। পরীর সামনে দাঁড়াল। পরীর তখন কোন কিছু দেখবার অবস্থা নেই। সে ঠোঁটের ব্যথায় হাঁফাচ্ছে। তার দু'চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়ছে। নদীর স্রোতের মত রক্ত তার সমস্ত শরীর লাল করে দিয়েছে। জব্বার বলল, 'বাপরে পরী, তোর রক্ত দেখি বন্দ হয় না। থাম, তোর রক্ত বন্দ করার ব্যবস্থা করি।' স্পোকের গনগনে লাল অগ্রভাগটি চেপে ধরল পরীর দু'ফাঁক করা কাটা ঠোঁটের উপর। হুঙ্কার দিয়ে উঠল পরী। পটাপট মোটা মোটা রশিগুলো তার হাত থেকে ছিঁড়ে গেল। বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে জ্ঞান হারাল সে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল মাংস পোড়ার গন্ধ। মিনিট পনেরো পর তার জ্ঞান ফিরল। দেখল তাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া চলছে। দুইজন চড়েছে তার উরুর উপর আর একজন পায়ের উপর চড়ে উল্টো দিক থেকে পায়ের পাতা ধরেছে। তার পা ভাঙা হচ্ছে। অধিক রক্তক্ষরণে বাধা দেবার ক্ষমতাও সে হারিয়েছে।

যে লোক পায়ের পাতা ধরেছিল সে এবার পুরোপুরি হাঁটুর উপর চড়ে দাঁড়াল। দু'হাতের পেশী ফুলিয়ে সবাইকে দেখিয়ে নিল একবার। গ্রামের লোকজন গভীর আগ্রহে চেয়ে আছে,

ব্যায়ামবীর ওসমানের শক্তির কসরত দেখানোর এটাই সুযোগ। একবারে পরীর পায়ের মোটা হাড্ডিটা ভাঙতে পারবে তো?

কলিম শেখ ঘোষণা দিল, 'ওসমান পারলে হামার তরফ থেকে একটা ডেগী মুরগী পাবা।' পরমুহূর্তে মড়াৎ করে পরীর পায়ের হাড় ভাঙার একটা বীভৎস শব্দ শোনা গেল। অতি বড় পাষাণেরও সে শব্দে বুক কেঁপে ওঠে। আসরের অনেকে শিউরে উঠে স্থান ত্যাগ করল।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দ্বিতীয়বার জ্ঞান হারাল পরী। এবার যখন জ্ঞান ফিরে এল শরীরের ব্যথাগুলো তার অন্য এক রূপ ধারণ করেছে–চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, মাথার ভিতরটা ফাঁকা। অন্য এক জগতের বাসিন্দা মনে হচ্ছে তার নিজেকে।

কানে তার ভেসে এল দু'একটা মানুষের কণ্ঠস্বর, চোখ তোলা নিয়ে কী যেন মতবিরোধ হচ্ছে।

পরী চোখ খোলা দেখে জব্বার দ্রুত এগিয়ে এল স্পোকটি হাতে নিয়ে, বলল, 'কী রে চোরের বাচ্চা চোর, আর চুরি করবি না? দিমু নাকি চোখটা তুলে?'

পরী শুধু গলা দিয়ে একটাই ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বের করতে পারল, 'পানি।'

ঠিক তখনই জব্বার তার স্পোকটা চেপে ধরল তার একটি চোখের উপর। পরী দ্রুত চোখটা বন্ধ করে ফেলায় চোখের কোন ক্ষতি না হলেও পাপড়িগুলো পুড়ে গেল। কে যেন তখনই তার তলপেটে দিল ঝেড়ে এক লাথি। মলদ্বার দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল মল।

তৃতীয় বারের মত জ্ঞান হারাল পরী। আর সেই জ্ঞান কখনও ফিরল না। কারণ সে মারা গেছে

এবার টনক নড়ল গ্রামবাসীর। মাথা-মুরব্বী সহ সকলে ভয়ে পাংশু বর্ণ হয়ে গেল। শেষমেশ খুনের দায়ে পড়তে হলো সকলে একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে লাগল। কে বেশি মেরেছে, কে

একেবারেই মারেনি, কেউ কেউ মাঠেই আসেনি, সে হিসাব নিকেষ বের হতে শুরু করল একে একে। চেয়ারম্যান লাঠি উঁচিয়ে চ্যাংড়াগুলোকে বকাবকি শুরু করল। 'এই তোমরা যা করিছ, অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি! তাই বলে একবারে মারেই ফালালা? এখন ঠ্যালা সামলাও!'

কিন্তু কে কার ঠ্যালা সামলায়। স্কুল মাঠ ফাঁকা হতে শুরু করেছে। সবাই খুব দ্রুত উধাও হতে লাগল।

পরীর লাশটা পড়ে আছে মাটিতে। ধুলো, কাদা, বিষ্ঠা আর রক্তে মাখামাখি হয়ে, পেছনের একটা পা চামড়ার সাথে ঝুলে নড়বড় করছে, বাঁকা হয়ে মাটিতে পড়ে আছে সেটা।

অতঃপর নিজেদের প্রাণরক্ষার্থে সকলে ঠিক করল এই লাশটা তারা চুপিচুপি কবর দিয়ে দেবে। কথাটা পুলিশের কানে উঠলেই ঝামেলার সৃষ্টি। কথায় আছে না, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।' অনেক জল্পনা-কল্পনা করার পর অবশেষে পরীকে গোপনে গুম করে দেওয়াই স্থির হলো। শুধু গ্রামবাসীকে একজোট থাকতে হবে। কিছুতেই ঘটনা যেন বাইরে না যায় তা হলে নিজেদেরই সর্বনাশ।

প্রথমে ঠিক হলো এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে কোনমতে পুঁতে ফেলা হোক। কিন্তু ইমাম সাহেব এবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন। বললেন, 'চোর হলেও মোসলমান ঘরের ছেলে, অন্তত দাফনডা দেওয়া উচিত।'

এরপর আর কথা চলে না, কারণ গ্রামের সব মুসলমান জনগণের নীতিতে বাধল। হাজার হলেও মানবিক ব্যাপার বলে কথা। হোক না চোরের লাশ। মুসলমানের তো।

পরীর লাশটা ধোয়া হলো, ধবধবে নতুন সাদা কাফনে সজ্জিত করা হলো। ক্ষত বিক্ষত চোখে সুরমা লাগানো হলো।

এসব করতে করতে বিকেল গড়িয়ে গেল। আকাশ দুপুরের পর থেকে আবারও ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেছে, সন্ধ্যা নেমে

গেছে ঝপ্ করে। ওদিকে জঙ্গলের ঝোপে যে কবরটা খোঁড়া হয়েছে সেটাও পানিতে টইটম্বুর, যতই খোঁড়া হচ্ছে ততই পানিতে ভরে যাচ্ছে। দু'তিন জায়গায় আরও খোঁড়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পরীর বিধি বাম, একই অবস্থা। শেষে ঠিক হলো ওই পানিতেই মাটি চাপা দেওয়া হবে। ওটাই পরীর শাস্তি–সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

পরীকে একটা বাঁশের খাটিয়ায় বহন করে আনা হলো কবরের কিনারায়। এখন পুরোপুরি সন্ধ্যা নেমেছে। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো। ঝমঝমিয়ে নামার অপেক্ষা।

কবরের কিনারায় শেষ বারের মত ভূতুড়ে আলোয় গুমোট পরিবেশে ইমাম সাহেব জানাজা শুরু করলেন। চেয়ারম্যানের ছোট ভাই মিজানের চোখটা চলে গেল লাশের মাথার দিকে। আচমকা মনে হলো কাফন বন্দী মাথাটা যেন একটুখানি নড়ে উঠল। চমকে গেল চিরকালের ভীতু মিজান। ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য আবার তাকাল ডেডবডির দিকে। আরে, ওটার পা দুটো বের হলো কখন? পা তো ঢাকা ছিল কাফনে। বুড়ো আঙুলটা মনে হলো নড়ে উঠল? ভয়ে অজ্ঞান হবার অবস্থা হলো মিজানের।

জানাজা পড়া শেষ। কবরের এক কোমর পানির মধ্যে নেমে পড়ল সাজু আকন্দ লুঙ্গিটা কাছা মেরে। সে লাশের মাথার দিকটায় চলে গেল। আর জামাল, সলিমুদ্দি ও খোকন মিলে লাশটা ধরল কবরে নামাবে বলে। কবরের পানিতে ডেডবডিটা রেখেছে কি রাখেনি, ওদের হাতের ভিতর বিশাল একটা অজগর সাপের ভারি দেহের মত ভীষণ জোরে কেঁপে উঠল লাশটা। বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত সমানে ঝাঁকি খেতে লাগল। তিনজনের হাত থেকেই ঝপাং করে পড়ে গেল চঞ্চল মৃতদেহ কবরের পানির মধ্যে। আর পানিতে দাঁড়ানো সাজু আকন্দ লাশের শরীরের একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল কবরের ভিতর একেবারে লাশটার

নীচে। সেখানে পানিতে খাবি খেতে লাগল সমানে। কবরপাড়ের সবগুলো মানুষ দৌড় শুরু করেছে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে।

লাশটা ততক্ষণে সাজু আকন্দের গায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি উঠে দাঁড়িয়েছে। কবরের মধ্যে সাজু মৃগী রোগীর মত তড়পাতে লাগল—আতঙ্কে ওখানেই হার্টফেল করল সে।

বালিয়াদীঘির প্রত্যেকটা ঘরের দরজা বন্ধ। বদ্ধ ঘরের ভিতর বিরাজ করছে চাপা আতঙ্ক। গ্রামবাসী জোরে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছে। গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর চলছে। এরকম ঘটনা বাপ-দাদার জন্মে কোনদিন কেউ শোনেওনি, দেখা তো দূরে থাক।

'ব্যাটা পরী, কবরে পাও না দিয়েই ভূত হয়ে অত্যাচার শুরু করলি?'

একটা দুটো চোখ হলে কথা ছিল, অতগুলো চোখের ভুল কী করে হয়? সবাই দেখল দিব্যি কাফন পরা লাশটা উঠে দাঁড়াল, তার সারা গা থেকে টপটপ করে পানি ঝরে পড়ছে, সে দাঁড়াল মাটি থেকে কমপক্ষে দুই হাত উপরে শূন্যে আর নীচে বেচারা সাজু কাটা মাছের মত তড়পাতে লাগল। শুরুতেই খুন? এমনি ভাবে ঘটনাটা গ্রামের প্রত্যেকটা ঘরে তিল থেকে তাল হয়ে উঠল।

পরদিন সকালের দিকে অতিরিক্ত সাহসী দু'তিনজনের একটা দল পা টিপে টিপে এগিয়েছিল জঙ্গলের ধারে কবরপাড়ে। দূর থেকেই দেখে সে এক বীভৎস দৃশ্য। সাজু আকন্দের লাশটা অর্ধেক কবরের মধ্যে আর অর্ধেকটা কবরের বাইরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার চোখ দুটো পুরোপুরি খোলা। যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে সে চোখে—মণি ভিতরে, সাদা অংশটা চকচক করছে। পেটটা ভয়ানক ভাবে ফুলে ঢোল। মুখটা হাঁ করা, সেখানে মাছির চাক লেগে গেছে। আর পরীর লাশ উধাও।

সেদিনটা সুনসান কেটে গেল। রাতটাও। এই গ্রামের অবস্থা দেখে এখন যে কেউ ভাববে এখানে কারফিউ জারি করা হয়েছে।

কবরপাড়ের ঘটনায় উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ৪-৫ জন জ্বরে পড়ল। চেয়ারম্যান রমিজ মোল্লা কাতলা মাছের মত মোটা মানুষ, তার হাঁপানি সহ নানা রোগের উপসর্গ বেড়ে গেল। তার ছোট ভাই মিজানের ১০৪ জ্বর। সকাল থেকেই সে ভুল বকছে।

দ্বিতীয় দিন রাত ১২টা। আকাশটা থম ধরে আছে। কোন এক অজানা আশঙ্কায় ঝিঁঝিদের ডাকাডাকিও আজ বন্ধ। বাতাসও থেমে গেছে। নারকেল গাছটায় একমাত্র প্রাণের স্পন্দন স্বরূপ একটা বড়সড় বাদুড় কিছুক্ষণ পর পর ডানা ঝাপটাচ্ছে। গোটা গ্রামটা নীরব, নিথর, ঘুটঘুটে। সন্ধ্যার সাথে সাথেই সবাই দরজায় খিল এঁটেছে। কারও চোখেই ঘুম নেই। তবু নিশ্চুপ।

জামালের ৪ মাসের পোয়াতী বউ হেলেনা খাতুন। প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল তলপেটটা তার। দুপুর থেকেই ডায়রিয়া শুরু হয়েছে তার। জামালকে ধাক্কা দিল। 'ও মঞ্জুর বাপ, ওঠো। একবার বাইরে না গেলে মরেই যামু। উহ্ আল্লা বাঁচাও।'

কী করবে জামাল, হ্যাঁ-না করতে করতে উঠতেই হলো। বাড়ি থেকে ২৫-৩০ কদম দূরে পায়খানা। এই দুর্যোগের রাতে সেখানে যাওয়াটাও কঠিন ব্যাপার। একহাতে কেরোসিনের কুপিটা ধরল হেলেনা। দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে উৎকট বিশ্রী পচা মাংসের একটা তীব্র গন্ধ ঝাঁ করে নাকে এসে ধাক্কা মারল। বিকেল থেকেই গন্ধটা গ্রামবাসী পেতে শুরু করেছে। তারমানে সাজু আকন্দ পচতে শুরু করেছে। শিউরে উঠল স্বামী-স্ত্রী।

দু'জন এগোল পায়ে পায়ে। পেছনে স্বামীকে দাঁড় করিয়ে কুপিটা মাটিতে রাখল হেলেনা খাতুন, তারপর এক হাতে বদনাটা ধরে আর এক হাতে পায়খানার গেটটা খুলল। কুপির হালকা আলোয় ক্র্যাচে ভর দিয়ে সেখানে দাঁড়ানো সাদা কাফন পরিহিত পরীকে দেখা গেল স্পষ্ট। একটা চোখ ইঞ্চিখানেক ফোলা। মুখটা শুয়োরের আকৃতি পেয়ে বিকট ভাবে উঁচু হয়ে আছে। সেখানে ঝলসানো মাংস ও চামড়া ঝুলে আছে। গোটা মুখমণ্ডলের

অর্ধেকটাই পোড়া। শুধু মুখ ছাড়া সমস্ত শরীর কাফনে ঢাকা। সে টকটকে লাল চোখ দিয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে হেলেনা খাতুনের দিকে।

হাত থেকে পড়ে গেল বদনাটা।

পরের দিন তাপিয়ে জ্বর উঠল হেলেনার। একটানা ভুল বকে, মুখ দিয়ে ফেনা তুলে বমি করতে করতে বিকেলের দিকে মারা গেল সে।

তৃতীয় দিন রাত সাড়ে বারোটা। কলিমদ্দি শেখের বড় ছেলে হাসু নিজের ঘর ছেড়ে ভয়ে বাবা-মার ঘরে এসে মেঝেতে বিছানা পেতেছে। হাসিখুশি, দশম শ্রেণীতে পড়া হাসু যদিও এসব ভূত-প্রেতে তেমন বিশ্বাস করে না, তবুও গ্রামে যা ঘটে চলেছে তাতে ভয় না পাওয়াটাই অস্বাভাবিক।

সবাই ঘুমে প্রায় অচেতন। যদিও থেকে থেকে প্রচণ্ড একটা গন্ধ পেটের ভিতরটা গুলিয়ে তুলছে। হ্যারিকেনের টিপ দেওয়া আলো কমতে কমতে প্রায় শেষের পথে। খুট করে একটা শব্দ হলো। হাসুর পাতলা ঘুমটা ভেঙে গেল। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে শব্দটা কোথায় হলো। ভয়ে ঘেমে নেয়ে তার বিছানা ভিজে জবজব করছে। একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল তার–সামনের জানালার কবাটে। কাঠের জানালাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। হাসু অনড় হয়ে পড়ে রইল। নড়াচড়া করতে ভুলে গেছে। স্থির চোখে চেয়ে রইল জানালার দিকে। জানালাটা এবার পুরোপুরি খুলে গেল। প্রথমে দেখা গেল সেখানে চাপা অন্ধকারের একটা ফ্রেম। আচমকা সেই ফ্রেমে অবস্থান নিল পরীর পোড়া, কাটা বীভৎস মুখটা। ওরই দিকে তাকিয়ে একটু যেন হাসল, তার মাথা ও শরীর সাদা কাফনে আবৃত। ভাঙা গলায় একটা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারাল হাসু।

ব্যায়ামবীর ওসমান চৌকিতে শুয়ে শুয়েই শুনল হাসুর চিৎকারটা। তড়াক করে একবার উঠে বসল চৌকির উপর, আবার

শুয়ে পড়ল ধপাস করে। তার সাহস নেই ওদিকে যাবার। বৃষ্টি শুরু হয়েছিল খানিক আগে। সেই রেশ ধরে টিনের চাল থেকে টপটপ করে ঝরে পড়ছে পানির ফোঁটা। ওসমানের ঘরের চালের ঠিক উপরের নিমগাছটায় একটা পেঁচা ডেকে উঠল 'ধু-ধু-ধু-ধু' করে। ওসমানের কেন যেন ভয় করতে লাগল। খুব শীতও লাগছে তার। সে এই ঘরে একাই থাকে। পাশের ঘরে থাকে অন্ধ বুড়ি মা। আজ ঘরের ভিতর অন্ধকারটা যেন জাঁকিয়ে বসেছে। কুপিটা সেই কখন নিভে গেছে।

ওসমানের মনে হলো কে যেন ক্র্যাচে ভর দিয়ে তার ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছে। সে ঘাড়টা আস্তে ঘুরিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করল। উঠে বসল চৌকির উপর। বালিশের নীচে রাখা ম্যাচটা হাতে নিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফস করে জ্বালল ম্যাচের একটা কাঠি। চমকে গেল মশারির ভিতর নিজের বিশাল ছায়াটা দেখে। ওই ছায়ার দিকে তাকাতেই শরীর ঝাঁকি খেয়ে উঠেছে। পরক্ষণেই দেখতে পেল বিছানার কিনারায় কার যেন একটা হাত পড়ে আছে। হাতের আঙুলে বিড়ালের থাবার মত বড় বড় নখ, ধূসর চিকন হাতটা। হাতের মালিক খাটের তলায়। সে উঠে আসছে। হাতটাও ওসমানকে ধরার জন্য এগুচ্ছে। ওসমান বিস্ফারিত চোখে দেখতে পেল সাদা কাফনে ঢাকা পরীর বিকৃত গলিত মুখটা বেরিয়ে আসছে মশারির ভিতর। চিৎকার দিয়ে উঠল ওসমান। তার হাতের জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠিটা পড়ে গেল চৌকির উপর।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সকলে ওসমানের বিদগ্ধ পোড়া কুঞ্চিত লাশটা পেল চৌকির পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া স্তূপের মাঝে।

এমনি ভাবে ঘটে চলল অলৌকিক ঘটনাগুলো। বালিয়াদীঘি গ্রামটা শহর থেকে ১৫ মাইল দূরে। গ্রামটা এখনও অজ পাড়া গাঁ। একটি মাত্র পাকা সড়ক চলে গেছে গ্রামের পাশ দিয়ে। বিদ্যুৎ এখনও পৌঁছায়নি সেখানে। যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের বলে যোগাযোগও হয় কম। আর এই গাঁয়ে শিক্ষিত

লোকের সংখ্যাও নগণ্য। কাজেই এ ঘটনা সদর থানার ওসির কানে পৌঁছুতে প্রায় চার দিন লেগে গেল। ওসি দলবল নিয়ে হাজির হলেন ৪র্থ দিন দুপুরেই।

ঘটনাস্থলে এসে সবকিছু দেখে শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছেন। কোন কিছুরই কোন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। শিক্ষিত লোক হলেও ভূত-প্রেত তাবিজ-কবজে বিশ্বাস আছে ওসি নিয়াজ খন্দকারের। তবুও মনের কোণে কোন অমূলক সন্দেহকে ঠাঁই দিতে চাইলেন না, এতে কাজের ক্ষতি হবে।

সাজু আকন্দ আর ওসমানের লাশ দুটো পোস্ট মর্টেমের জন্য পাঠিয়ে কেসের তদন্ত করতে বসলেন। সব কিছু সরেজমিনে দেখে শুনে গ্রামের কিছু মাথা-মুরব্বী নিয়ে বসলেন চেয়ারম্যানের বাড়িতে। দেখতে দেখতে গ্রামের আরও অনেকে এসে সেখানে হাজির হলো। এক কথা দু'কথা অতঃপর পাঁচ কথায় পরীকে নির্যাতন, পরীর মৃত্যু, সব কথাই বের হয়ে এল। গ্রামবাসী আর কিছুই ঢেকে রাখল না। তারা এই দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি চায়।

ওসি অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিলেন, আজ রাতে গ্রামটা পাহারা দিতে হবে, পরী ভূতকে আগে দেখা দরকার। এদের ভিতরে অবশ্যই কোন গলদ আছে। তার ধারণা পরীর লাশ অন্য কোথাও গুম করা হয়েছে, এবং আরও কিছু ঘটনা এরা লুকাচ্ছে। তবে প্রথমেই তিনি সবাইকে চটাতে চাইলেন না। গ্রামের লোকদের অন্য রকম সন্দেহ করা হচ্ছে বুঝতে পারলে ভয়েই ওরা পালাতে শুরু করবে, কেউ মুখ খুলবে না। তাই তিনি কেসটা গুটিয়ে আনার অভিপ্রায়ে গ্রামবাসীর অনুকূলে থেকেই কাজ শুরু করলেন।

মীটিং-এর আলোচনা থেকে তথ্য পাওয়া গেল যে যতবারই পরীকে দেখা গেছে ততবারই ঘড়িতে ১২ টা বা তার কাছাকাছি সময় ছিল। কাজেই পরীর আত্মা বের হ ার সময় মধ্যরাত।

ঠিক হলো আজ রাতে জুনিয়র ইন্সপেক্টর রায়হান সোবাহান ও তার সাথে তিনজন সাহসী কন্সটেবল সাধারণ পোশাকে গ্রাম পাহারা দেবে। কোন লোক যেন গ্রামের বাইরে পা না দেয় সেই নিষেধাজ্ঞা জারি করে ওসি নিয়াজ খন্দকার জুনিয়র রায়হান সোবাহানকে কিছু গোপনীয় নির্দেশ দিয়ে সদরে ফিরে গেলেন।

সকলে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। তবে সবাই খুব সতর্ক। আজ রাতে কিছু একটা ঘটতে চলেছে নিশ্চয়ই।

রাত গভীর হচ্ছে। তিন কন্সটেবল আর সাহসী যুবক রায়হান সোবাহানের দলটার সাথে জুটল গ্রামের ৬-৭ জন সাহসী তরুণ। তারাও বিশ্বাস করার চেষ্টা করছে আসলে ওসব ভূত-ফুত বলে কিছু নয়, আতঙ্কে মানুষ ভুল দেখছে।

রাত্রি পৌনে তিনটা। কলিমদ্দি শেখ ধীরে ধীরে বৌ-এর হাতটা বুকের উপর থেকে সরিয়ে দিল। নিঃশব্দে মাটিতে নামল। মরিচের মাচার গোপন জায়গা থেকে বের করল একজোড়া রাবারের স্যান্ডেল। বিশেষ সোল দিয়ে তৈরি। চলার পথে যাতে কোন শব্দ না হয়।

এই কুসংস্কারের অন্ধ রাতেও বাইরে না গেলে আজ আর চলছেই না। নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে পা দিল। অজানা আতঙ্কে গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল। ইচ্ছে হলো ঘরেই ফিরে যাবে, পরক্ষণেই স্বাস্থ্যবতী যুবতী, শ্যামলা অথচ মিষ্টি লাবণ্যে ঢলঢল মুখটা মনের কোণে ভেসে উঠল। (আম্বিয়া) প্রতিবেশী বন্ধু সামসুদ্দীনের ছোট মেয়েটা। হোক না বন্ধুর মেয়ে, কলিমদ্দির কী অর্থবল, মনোবল শরীর স্বাস্থ্য কিছু কম আছে? শুধু হাদোড় বুড়ো সামসু ২৫ হাজার টাকা চেয়ে বসেছে, তা না হলে মেয়ের বিয়ে দেবে না। সেই টাকার জন্যই তাকে এত রাতে ঘর থেকে বের হতে হয়েছে।

দ্রুত হাঁটা ধরল। সে যাচ্ছে শ্যালো মেশিনের ঘরে। যাবার পথে একটা বাঁশের ঘন জঙ্গল পার হতে হবে। সেই অংশটুকু পার

হতে পারলেই বাঁচা। গা ছমছম করা নিস্তব্ধ রাতের ভয়াল পরিবেশে ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার বাঁশের জঙ্গলটার মধ্যে একটুখানি ইতস্তত করে ঢুকেই পড়ল কলিম শেখ। মনে জোর আনল এই ভেবে যে আজ পুলিশের লোক গ্রাম পাহারা দিচ্ছে। তা ছাড়া ১২টা পার হয়ে গেছে। জোরে জোরে সৃষ্টিকর্তাকে শুনিয়ে সূরা 'ইখলাস' আওড়াতে লাগল। তার চলার গতি স্বপ্নের মধ্যে হাঁটার মত মনে হচ্ছে। কিছুতেই পথ ফুরাচ্ছে না কেন? হাতের বাম পাশের বিশাল মোটা বটগাছটার গায়ের ভাঙাচোরা গহ্বরগুলোকে দৈত্যের হাঁ করা মুখের মত লাগছে। সামনেই একটি পুরানো ভাঙা কবর পেরুতে হবে। হাতের মিনি টর্চটা জ্বলে উঠল। নির্বিঘ্নেই পার হলো কবরটা।

হঠাৎ তার মনে হলো পেছনে মৃদু-পায়ে কে যেন আসছে। সে থেমে দাঁড়াল। পেছনেও মট করে একটা পাটকাঠি ভাঙার শব্দ হলো। কলিমদ্দি এবার পরিষ্কার বুঝল, তাকে কেউ অনুসরণ করছে। সে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেল। আসছে পদশব্দ। এখন তা আরও জোরাল। কেমন ভরাট সে আওয়াজ। মনে হচ্ছে অনুসরণকারীর পা যেন পাথরের তৈরি।

প্রচণ্ড আতঙ্ক কলিমদ্দির পায়ে বিদ্যুতের গতি এনে দিল। দৌড় শুরু করল সামনে। পেছনের লোকটাও দৌড় দিয়েছে। দৌড়াতে দৌড়াতে দম বন্ধ হয়ে এল তার। বুড়ো ফুসফুস দম পাচ্ছে না। আচমকা তার সম্মুখে উদয় হলো মেশিন ঘরটি। চেনা নিজের ঘরটার সামনে এসে তার বুকে কিছুটা সাহস সঞ্চয় হলো। পেছন দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে চাইল। নাহ্, ধু ধু ফাঁকা ধূসর মাঠ, পিনপতন নিস্তব্ধতা চারদিকে। কোন জনমানব তো দূরের কথা, একটা জোনাকি পোকার অস্তিত্বও নেই।

বার কয়েক ঢোক গিলল শেখ। সামসুদ্দীনের গুষ্ঠি উদ্ধার করতে লাগল মনে মনে, ভোরের মধ্যে তার টাকা চাই, মেয়ের নাকি অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। নইলে কে আসে মরতে?

কালি গোলা অন্ধকার মেশিন ঘরটায় প্রবেশ করল সে। দৌড়ানোর সময় টর্চটা হাত থেকে পড়ে গেছে। হাতড়ে হাতড়ে কুপিটার নাগাল পেল। ঝাঁকিয়ে দেখল কেরোসিনে ভর্তিই আছে। ফসস্ করে ম্যাচের কাঠিটা জ্বালল। কুপি ধরাল। তোষক, কম্বল, কাঁথা বিছানো বাঁশের তৈরি চৌকির উপর নজর পড়তেই বরফের মত জমে গেল কলিমদ্দি শেখ। চিৎকার করার চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে ফ্যাসফ্যাস করে বাতাস বের হতে লাগল শুধু।

চৌকির উপর সটান হয়ে শুয়ে রয়েছে কাফন পরা জলজ্যান্ত পরীর মৃত দেহটা। পরীর মুখটা এদিকেই ঘোরানো। তার গলিত, পচা বিধ্বস্ত মুখটা কলিম শেখের দিকে তাকিয়ে ক্রূর হাসি হাসছে।

পরী উঠে দাঁড়াল মাটির উপর। তার পেছনে লেজের মত পাকানো একটা পা ঝুলছে। সেটা মাটিতে ছেঁচড়ে যাচ্ছে। শেখ অর্ধচৈতন্য অবস্থার মাঝামাঝি তখন। মাথা, মন সব শূন্য। সামনের দৃশ্যটা চোখের ভুল ভেবে মন থেকে তাড়াতে চাইছে, কিন্তু যাচ্ছে না।

ভাঙা গলায় ফ্যাচফ্যাচ করে পরী হাসতে লাগল। 'কী কলিম মিঞা! হারামখোরের বাচ্চা, লুচ্চা, জানোয়ার! তোর ট্যাকা হামি চুরি করছি? ক জোচ্চোর?'

কলিমদ্দি হাত দুটো কোন মতে জড়ো করল ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে, কাঁপতে কাঁপতে তোতলাতে লাগল, 'মা...মা...মাপ... কর...পরী...হামার...ট্যাকা তুই...চুরি করিস...নাই...।'

পরী ক্র্যাচে ভর দিয়ে নিঃশব্দে একধাপ এগিয়ে এল। 'হামাক তোরা মারলু ক্যা? সেদিন কা রাতত হামি তো কোন চুরি করিনি। বাঁচপার দিলু না তোরা?' বলে শেখের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল পরী। কলিমদ্দি বোটকা একটা পচা মাংসের দুর্গন্ধ পেল। পরীর দেহ থেকে ছড়াচ্ছে।

কলিমদ্দি ওর এগুনো দেখে পিছাতে লাগল। এক সময় দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল তার। কম্পিত হাতটা নিজের অজান্তেই

চলে গেল তার কোমরে গোঁজা সার্বক্ষণিক সঙ্গী প্রিয় এগারো ইঞ্চির ছিপছিপে কিরিচটার বাঁটের উপর।

'আবার বিয়া করবা কলিম শেখ, ৻ মার ট্যাকা তুমিই চুরি করো...আর মরণ হয় হামার। কিন্তু হামাক মারলা ক্যা?' বলে পরী কলিমদ্দি শেখের গলাটা শীর্ণ ধূসর কঙ্কালসার দুটি হাত দিয়ে টিপে ধরল। কলিমদ্দি তার হাতের কিরিচটাও সঙ্গে সঙ্গে আমূল বসিয়ে দিল কাফনে ঢাকা জিন্দালাশ পরীর হৃৎপিণ্ড বরাবর। গগনবিদারী একটা চিৎকার দিয়ে উঠল পরী; ডুকরে ডুকরে বলতে লাগল 'কব্বরের মদ্যে থিনী যখন আচানক হুঁশ ফিরা পানু,...নিজের কাফন পেন্দা শরীলডা দেখে ভাবছিনু...হামি আজ সত্যিই মরছি,...মুরুখখু হামি অখন বুজনু হামি জিন্দাই এতদিন ঘুরছি...ওরে আল্লা! কলিম্ম্যা তুই এবার সত্যি সত্যিই হামাক খুন করলি...'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যু হলো পরীর। মৃত্যুর আগে তার হাত দুটো সাঁড়াশীর মত চেপে ধরেছিল কলিমদ্দি শেখের গলাটা। মৃত্যু যন্ত্রণার পুরো কষ্টটা সে হজম করেছে কলিমদ্দির শ্বাসনালীটা টিপে ধরে।

পরীর আর্ত চিৎকার শুনে কলিমদ্দিকে অনুসরণ করে আসা রায়হান সোবাহানের দলটা দেখল কলিমদ্দি শেখ ও পরীর দেহটা জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। কলিমদ্দির জিভ আধ ফুটের মত বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ভয়ঙ্কর পিশাচের মত লাগছে দেখতে। আর পরীর ঠাণ্ডা হাত দুটো শক্ত হয়ে ধরে আছে শেখের গলা। পরীর বুকের কাছটায় সাদা কাফনে টকটকে লাল রক্তের গোল একটা আকৃতি সৃষ্টি হয়েছে।

কলিমদ্দির সেই মেশিন ঘরে পুলিশ সার্চ করে সদ্যমৃত লাশ দুটির সাথে পনেরো হাজার টাকার একটি বান্ডিল ও একটি কালো বোরখাও পেয়েছিল।

তাহমিনা আখতারী খানম

সর্প মানব

অস্ত্রোপচার শুরু করবার ঠিক আগের মুহূর্তে দু'তিনবার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল রোগিণীর দেহ। পালস্ পরীক্ষার জন্য রোগিণীর বাম হাতের কব্জিতে হাত রাখলেন প্রফেসর হায়দার। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে দেহ ছেড়ে। মুমূর্ষু আর অচেতন অবস্থায় বান্দরবান স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রোগিণীকে পাঠানো হয়েছে চট্টগ্রামের সাউথল্যান্ড নার্সিংহোমে। এই নার্সিংহোম প্রফেসর হায়দারের বহুদিনের স্বপ্নের ফসল। রোগিণীর দেহের সংকটময় অবস্থা দেখে তিনি নিজেই অপারেশনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রফেসরের ইশারায় একজন নার্স রোগিণীর মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্ক খুলে মুখটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল। গ্লাভস পরা হাতে সার্জিক্যাল নাইফ তুলে নিয়ে প্রফেসর অস্ত্রোপচারের কাজ শুরু করলেন। মৃতদেহের তলপেটে ছুরি চালাতে গিয়ে নিজেকে কসাই মনে হলো তাঁর। কিন্তু উপায় নেই। অস্ত্রোপচার তাঁকে চালিয়ে যেতেই হবে। কারণ মৃতদেহের পেটের ভিতর এখনও একটা প্রাণ লুকিয়ে থাকবার সম্ভাবনা আছে। তাকে বাঁচানোর জন্য এই অস্ত্রোপচার অপরিহার্য। পাশে দাঁড়ানো সহকারী ডাক্তার আর নার্সরা একের পর এক নতুন যন্ত্র তুলে দিতে লাগল প্রফেসরের হাতে। তলপেটের মাঝামাঝি অংশ লম্বালম্বিভাবে কাটবার পর আর্টারী ফরসেপ দিয়ে কাটা অংশের দুই দিকের চামড়া ফাঁক করে ধরল সহকারীরা। ফুটবলের মত ফুলে থাকা ইউট্রাসের বাইরের পর্দাটা চকচক করে উঠল

প্রফেসরের চোখের সামনে। তিনি অভিজ্ঞ হাতে ছুরি চালালেন ইউট্রাসের গায়ে। বাচ্চার দেহের একটা অংশ চোখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন প্রফেসর। লন্ডন থেকে এফ.আর.সি.এস. পাশ করে আসবার পর দীর্ঘদিন তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের গাইনী বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করেছেন। নিজের মাতৃভূমি চট্টগ্রামে নার্সিংহোম স্থাপনের পর শতাধিক গর্ভবতী মহিলার দেহে অস্ত্রোপচার করে বাচ্চা অপসারণ করেছেন। কিন্তু এমন অদ্ভুত বাচ্চার দেহ কখনও তাঁর চোখে পড়েনি। স্থির দৃষ্টিতে তিনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বাচ্চার দেহের ছোট ছোট আঁশগুলোর উপর। চোখের ভ্রম মনে করে প্রফেসর একটা তুলো দিয়ে বাচ্চার দেহের উপর লেগে থাকা রক্ত পরিষ্কার করে ফেললেন। সাথে সাথে চকচক করে উঠল মাছের দেহের মত এক গুচ্ছ সমতল আঁশ। বাচ্চার সমস্ত পিঠ জুড়ে শুধু আঁশ আর আঁশ। সহকর্মীদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা থাকলেও, চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সবার মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। যে কেউ হঠাৎ চিৎকার করে উঠতে পারে, অথবা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। প্রচণ্ড শক্ত নার্ভের অধিকারী প্রফেসর নিজেকে সামলে নিয়ে চোখের কড়া দৃষ্টি দিয়ে সহকর্মীদের শান্ত থাকবার নির্দেশ দিলেন। বাচ্চার দেহে বিন্দুমাত্র নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। মায়ের সাথে সাথে তার আত্মাও চলে গেছে দেহ ছেড়ে। ইউট্রাস থেকে বের করে আনবার পর নাড়ি কেটে বাচ্চার দেহ মায়ের দেহ থেকে আলাদা করা হলো। বড় আকারের একটা ট্রেতে রাখা হলো বাচ্চাটাকে। দ্রুত হাতে তিনি মৃত রোগিণীর পেট সেলাই করে দিলেন। এরপর মনোযোগ দিলেন বাচ্চার দিকে।

বাচ্চাটা যেন সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে সবার মুখের দিকে। বাচ্চার চোখে কোন পর্দা নেই। হাত, পা, মুখ মানুষের মত। পিঠের নীচের নিতম্বের জায়গা দখল করে আছে মোটা একটা

লেজ। নাক-মুখ আছে ঠিকই, কিন্তু কোন কান নেই। মাথা থেকে শুরু করে দেহের সমস্ত অংশে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট আঁশ। চামড়া বলতে কোন জিনিস নেই অদ্ভুত শিশুর দেহে। সমস্ত অপারেশন থিয়েটার জুড়ে তখন পিনপতন নিস্তব্ধতা। প্রফেসর মনে মনে ভাবলেন রোগিণীর স্বামী ফরেস্ট অফিসারের কথা।

অপারেশন থিয়েটারের দরজা খুলবার পর পলকহীন দৃষ্টিতে ইমতিয়াজ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল প্রফেসরের মুখের দিকে। প্রফেসরের নির্বাক মুখের দিকে তাকিয়ে তার বুঝতে কষ্ট হলো না, তার স্ত্রীকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। ডাক্তার-নার্সদের পাশ কাটিয়ে সে তার স্ত্রীর মৃতদেহের সামনে এসে দাঁড়াল। একবারের জন্যও সে কারও কাছে বাচ্চার খবর জানতে চাইল না। ইমতিয়াজের এই আচরণে প্রফেসর প্রথমে কিছুটা অবাক হলেও, পরক্ষণে বুঝতে পারলেন স্ত্রীর প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসাই তার এই আচরণের কারণ। অনড় ইমতিয়াজ দাঁড়িয়ে রইল ড্রেসিং সিটে ঢাকা স্ত্রীর মৃতদেহের সামনে। অত্যন্ত শক্ত নার্ভের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রফেসর বেশিক্ষণ দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন নিজের ব্যক্তিগত কামরার দিকে। একজন নার্স কাপড়ে ঢাকা ট্রেটা এনে রাখল তাঁর টেবিলের উপর। রিভলভিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন ট্রে-র উপরের আকাশী রঙের কাপড়ের দিকে। পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাজার বছরের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া রহস্যময় ঘটনাগুলোর একটি এই মুহূর্তে ঢাকা আছে এই আকাশী কাপড়ের নীচে। থমথমে মুখ নিয়ে হঠাৎ ইমতিয়াজ প্রফেসরের রুমে ঢুকল। তার চোখে শোকের ছায়ার সঙ্গে অন্য একটা জিনিস দেখতে পেলেন তিনি। কিন্তু সেটা কীসের বহিঃপ্রকাশ তা বুঝতে পারলেন না। প্রফেসর ভাবলেন, ইমতিয়াজ নিশ্চয় এখন মৃত বাচ্চাটাকে দেখতে চাইবে। বাচ্চার কিম্ভূতকিমাকার অবয়ব

দেখবার পর কী অনুভূতি সৃষ্টি হবে তার মনে? তাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন প্রফেসর। কিন্তু তাকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ইমতিয়াজ বলে উঠল, 'আমাকে কিছু বলতে হবে না, প্রফেসর। আমি জানি পেশেন্টকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা আপনি করেছেন । মৃত বাচ্চাটাকে আমি শুধু একবারের জন্যে দেখতে চাই। বাচ্চাটাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না। আপনি শুধু আমার স্ত্রীর ডেথ সার্টিফিকেটটা লিখে দিন।' কথাগুলো শেষ করে ইমতিয়াজ এগিয়ে গেল কাপড় ঢাকা ট্রে-র দিকে। কাঁপা কাঁপা হাতে প্রফেসর ট্রে-র উপরের কাপড়টা সরিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে বাচ্চার দেহের আঁশগুলো শুকাতে শুরু করেছে। সাদা-কালো রঙের ছোপ ছোপ দাগ ভেসে উঠেছে দেহ জুড়ে। বাচ্চার কাত হয়ে থাকা মাথাটা সোজা করে ধরলেন প্রফেসর। পলকহীন দুটি চোখ যেন তাকিয়ে আছে ইমতিয়াজের দিকে। তরতাজা চোখ দুটি দেখে মনে হয় না বাচ্চাটা মৃত। এবার প্রফেসর ভীষণভাবে ধাক্কা খেলেন ইমতিয়াজের মুখের দিকে তাকিয়ে। ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে ছিল সে বাচ্চার দিকে। হঠাৎ চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সে চোখে পিতৃত্ব হারানোর শোকের ছায়া নেই, আছে আক্রোশের আগুন। কিছুক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকবার পর বাচ্চার কাছ থেকে সরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। বাচ্চাটাকে কাপড়ে ঢেকে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন প্রফেসর। দ্রুত হাতে একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে বাড়িয়ে দিলেন ইমতিয়াজের দিকে।

কাগজটা হাতে নেওয়ার সময় প্রফেসরের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আপনি হয়তো ভেবেছিলেন বাচ্চাটার অদ্ভুত চেহারা দেখে আমি ভীষণ ভাবে আঁতকে উঠব। আমার চমকে না ওঠার পেছনে একটা কারণ আছে, প্রফেসর। আমি সবকিছু খুলে বলব আপনাকে, কিন্তু আজ নয়। এখন আমাকে একটা বিশেষ কাজ করতে হবে। কাজটা শেষ হলেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা

করব।'

প্রতিদিন ইমতিয়াজের আগমনের জন্য অপেক্ষা করেন প্রফেসর। তাঁর কামরার দরজার পাশের বুক শেলফের উপর একটা কাঁচের জারের ভিতর তরল ফরমালিনে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে বাচ্চাটাকে। নিজের চেয়ারে বসে তিনি তাকিয়ে থাকেন বাচ্চাটার দিকে। যেন নিজের লেজের উপর ভর দিয়ে বসে আছে সে। চোখ দু'টি আগের মতই সতেজ। এই চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন প্রফেসর। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাউথল্যান্ড নার্সিংহোমে ছুটে এসেছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এই অদ্ভুত বাচ্চাটাকে দেখবার জন্য। কিন্তু কেউ বাচ্চাটার অদ্ভুত আকৃতি সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেননি। আর এদিকে রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে প্রফেসরের চোখ থেকে। দেশের বড় বড় লাইব্রেরি থেকে জোগাড় করে আনলেন চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ। রাত দিন পাতা উল্টালেন বিদেশী জার্নালের। কোথাও এই অদ্ভুত বাচ্চা সম্পর্কে এক লাইন লেখাও খুঁজে পেলেন না।

প্রায় এক মাস সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। প্রতিদিনের মত বিকালের চা খেতে খেতে একটা বিদেশী জার্নালের পাতা উল্টাচ্ছিলেন প্রফেসর। দরজার পর্দা ঠেলে হঠাৎ ঘরে ঢুকল ফরেস্ট অফিসার ইমতিয়াজ। চমকে উঠলেন প্রফেসর, কেমন যেন একটা শিহরণ খেলে গেল তাঁর দেহ-মনে। অপারেশনের রাতের দেখা সেই বিধ্বস্ত যুবককে আজ বেশ চাঙ্গা মনে হচ্ছে। ফিটফাট পোশাক পরা দীর্ঘদেহী এক যুবক, হাসি হাসি মুখ। প্রফেসরের রুমে সাধারণ মানুষ ঢোকে কথা শুনবার জন্য। কিন্তু আজ ব্যাপারটা উল্টে গেছে। সুবোধ আগ্রহী শ্রোতার মত মুখ করে প্রফেসর তাকিয়ে রইলেন যুবকের দিকে। তিনি শুনতে চান এক অদ্ভুত মানব শিশু জন্ম নেওয়ার পিছনের অজানা কাহিনী।

টেবিলের পাশের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে কোনও ভূমিকা ছাড়াই প্রফেসরের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করল সে। 'যে ঘটনার প্রভাবে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম তার কিছুটা প্রভাব যে আপনার উপরও পড়েছে, তা আপনার চেহারা দেখেই আমি বুঝতে পারছি। অবশ্য অপারেশনের রাতেই আমি টের পেয়েছিলাম ঘটনাটা আপনাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলবে। একের পর এক চিন্তা আর গবেষণা করে যাবেন আপনি, কিন্তু ঘটনার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন না। তাই সে রাতে বিদায়ের আগে আমি আপনাকে বলেছিলাম, একটা কাজ শেষ করে এসে আমি সব কিছু খুলে বলব। গতকাল আমি কাজটা শেষ করেছি। তাই আজ ছুটে এসেছি আপনার কাছে।'

প্রফেসর ইমতিয়াজের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার মুখের কিছুক্ষণ আগের সেই হাসি হাসি ভাবটা আর নেই। সমস্ত মুখ জুড়ে ভেসে উঠেছে বিষাদের ছায়া।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকবার পর আবার কথা বলতে শুরু করল ইমতিয়াজ। 'একাত্তরের এক আগুনঝরা দিনে আমার জন্ম হয়েছিল সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল থানার সিন্দুরখান গ্রামে। বাবা ছিলেন শ্রীমঙ্গলের একজন নামকরা ব্যবসায়ী। সে সময় আমাদের বাড়ির কয়েকটা ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল একদল মুক্তিযোদ্ধা। এক রাতে হানাদার বাহিনী ঘিরে ফেলে আমাদের বাড়ি। তুমুল যুদ্ধের মধ্যে শহীদ হন মুক্তিযোদ্ধারা। তারা শহীদ হওয়ার পর হানাদাররা একে একে গুলি করে মারে বাড়ির সদস্যদের। মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একজন হানাদার আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল অন্ধকারে। মাটিতে না পড়ে আমার ছয় মাসের ছোট্ট দেহটা উড়ে গিয়ে পড়েছিল এক খড়ের গাদায়। বাবা-মা সহ বাড়ির বাকি সবাইকে গুলি করে মারার পর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হানাদার বাহিনী চলে যায়। আমাদের বাড়ি থেকে কিছুদূরে ছিল আমার চাচার বাড়ি। হানাদাররা চলে যাওয়ার পর চাচা-চাচী ছুটে

আসে আমাদের বাড়িতে। চিৎকারের শব্দ শুনে খড়ের গাদা থেকে উদ্ধার করে আমাকে। তারপর থেকে তাদের সংসারেই আমি বড় হয়েছি। বাড়ির পাশের পাহাড় জঙ্গল যেন জন্মলগ্ন থেকে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকত। আমার কৈশোর আর যৌবনের একটা বিরাট অংশ কেটেছে রেমাকালেঙ্গার দুর্ভেদ্য পাহাড়ী জঙ্গলে বন্দুক হাতে ঘুরে ঘুরে। বি.এ. পাশ করবার পর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে বনবিভাগে চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দেওয়ার পর ভাগ্যগুণে টিকে যাই। ছয় মাস ট্রেনিং নেওয়ার পর একজন ফরেস্ট অফিসার হিসাবে আমার প্রথম পোস্টিং হয় সুন্দরবনের বুড়িগোয়ালিনী রেঞ্জে। সুবিশাল ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে চাকরি করতে গিয়ে জঙ্গলে কর্মরত বাওয়ালী আর জেলেদের জীবন রক্ষা করবার জন্য আমাকে বহুবার বন্দুক হাতে লড়াই করতে হয়েছে বনের বাঘ আর জঙ্গলের দস্যুদের সঙ্গে। সুন্দরবনে দু'বছর কাটানোর পর আমাকে বদলী করা হয় সিলেট জেলার মধুপুর রিজার্ভ ফরেস্টে। এই রিজার্ভ ফরেস্টের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে–সমগ্র জঙ্গলের চারদিকে সীমানা প্রাচীরের মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় চা বাগান। আমি যখন মধুপুরে কাজে যোগদান করি তখন সমগ্র জঙ্গলে আর চা বাগানগুলোতে বইছে ভয়ংকর এক মানুষখেকো চিতাবাঘের আতংক। রাতের পর রাত আমি জঙ্গল আর চা বাগানগুলোর ধারে ঘুরতে থাকি সেই মানুষখেকো চিতার সন্ধানে। এক ফকফকা চাঁদনি রাতে চণ্ডিপুর চা বাগানের পাশের জঙ্গলে বসে একটা রাস্তার উপর চোখ রাখছিলাম আমি। চা বাগান আর জঙ্গলের এই সরু রাস্তা ধরে প্রায়ই চলাচল করে চিতাটা। চা বাগানের কুলিদের বস্তিগুলো থেকে ভেসে আসছে ঢাকের শব্দ। চিতাটাকে দূরে রাখবার জন্য গভীর রাত পর্যন্ত ঢোল বাজিয়ে চলে সাঁওতাল কুলিরা। তারা হয়তো জানে না একদিন এই ঢোলের শব্দই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। শব্দ লক্ষ্য করে মানুষ ধরার জন্য একদিন তাদের

সামনে এসে হাজির হবে ক্ষুধার্ত চিতা। মনে মনে ভাবলাম সকালে বস্তিতে গিয়ে তাদের সাবধান করে দিতে হবে। রাত তখন প্রায় দুটো। আমার অবস্থানের ডান দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখলাম চিতাটাকে। সাধারণ মানুষ ছাড়াও এ পর্যন্ত তিনজন বন্দুকধারী শিকারী মারা পড়েছে মানুষখেকোটার হাতে। তাই হান্টিং টর্চ বাঁধা দোনলা বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'চিতাটা আমার কাছ থেকে মাত্র তিরিশ গজ দূরে। আর ঠিক তখন এমন একটা ঘটনা ঘটল যা ভৌতিক ঘটনাকেও হার মানায়। আমার দেহের ঠিক বাম দিকে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো এক নারী মূর্তি। হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের শক খাওয়ার মত আঁতকে উঠলাম আমি। পাগলের মত এলোমেলো চিন্তায় ভরে গেল মাথা। কে এই নারী মূর্তি? সে কী মানবী? নাকি কুহকিনী? ভূত-প্রেতে কখনোই আমার বিশ্বাস নেই। তবু নিজের চোখের সামনে দেখা দৃশ্যটার কী ব্যাখ্যা দেব তা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। দীর্ঘদেহী নারী মূর্তি সোজা এগিয়ে চলল চিতার দিকে। তার নির্বিকার হাঁটবার ভঙ্গি দেখে শিউরে উঠলাম আমি। হঠাৎ মনে হলো জীবনের প্রতি চরম হতাশায় ভুগতে থাকা এই নারী ইচ্ছে করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আমার সামনে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল সে। সাথে সাথে একটা অদ্ভুত সুন্দর পরিচিত গন্ধ আমার নাকে ভেসে এল। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম কোন প্রেতাত্মা বা কুহকিনী নয়, জলজ্যান্ত এক মানবী বেছে নিয়েছে মানুষখেকো চিতার মুখে জীবন দেওয়ার পথ। নারী মূর্তির নির্বিকার হাঁটবার ভঙ্গিতে আমার মত চিতাটাও হয়তো কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে এতক্ষণে সে গর্জনে এগিয়ে আসত সামনের দিকে। চিতার দেহটা হঠাৎ যেন প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল। লাফ দেওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত। শুধু তার লেজের ডগাটা নড়তে দেখা গেল। আর মাত্র কয়েক

সেকেন্ডের মধ্যেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে নারী মূর্তির উপর। ঝোপ থেকে বেরিয়ে একলাফে পৌঁছে গেলাম নারী মূর্তির ঠিক পাশে। প্রচণ্ড গর্জন ছেড়ে লাফ দিল চিতা। টর্চের সুইচ টিপতেই দেখলাম জীবন্ত এক মৃত্যুদূত উড়ে আসছে সামনের দিকে। প্রায় একসাথে দুটো ব্যারেল ফায়ার করলাম উড়ে আসা চিতার দিকে। বন্দুকের প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল নারী মূর্তি। উড়ন্ত চিতার মরণ থাবা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নারী মূর্তিকে এক হাতে চেপে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম পাশের ঝোপে। আমাদের দেহের পাশে এসে পড়া চিতার দেহটা কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল। নারী দেহটাকে বাহুমুক্ত করতে গিয়ে বুঝলাম চিতার ভয়ংকর গর্জন আর বন্দুকের প্রচণ্ড শব্দে জ্ঞান হারিয়েছে সে। মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেললাম অজ্ঞান মেয়েটার মুখে। তার সেই মুখে আলো পড়বার সাথে সাথে বুকের ভিতর একটা ধাক্কা খেলাম। এ কিসের ধাক্কা বুঝতে পারলাম না। কারণ আগে কখনও এ ধরনের ধাক্কা খাওয়ার অনুভূতি হয়নি আমার।

'মেয়েটা যখন আমার সামনে দিয়ে চিতার দিকে হেঁটে যাচ্ছিল তখন যদি তার মুখে টর্চের আলো ফেলতাম তা হলে অবশ্যই আমাকে স্বীকার করে নিতে হত বনভূমির বুকে নেমে এসেছে এক স্বর্গের অপ্সরী। অপূর্ব সুন্দরী এই নারী কেন বেছে নিতে যাচ্ছিল আত্মহত্যার মত নির্মম পরিণতির পথ? কাশবনের মত দীর্ঘ এলো চুল, পরনের দামী নাইট গাউন, দেহ থেকে ভেসে আসা দামী পয়জন পারফিউমের গন্ধ—এর সবই বলে দিচ্ছে অভিজাত কোন মানুষের ঘরে তার বাস। মাটির উপর ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করতে লাগলাম এখন কী করা যায়। মেয়েটা সম্পর্কে সবকিছু জানতে হলে আগে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা দরকার। এসব যখন ভাবছিলাম তখন হঠাৎ চা বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কয়েকটা আলো এগিয়ে আসছে আমাদের

দিকে। মনে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলাম। টর্চ হাতে একজন ছিপছিপে দেহের প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। তাঁর মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই। ধবধবে সাদা চুলগুলোয় স্পষ্ট ভেসে আছে বয়সের ছাপ। তিনজন বন্দুকধারী সাঁওতাল তাঁর ঠিক পেছনে। ভদ্রলোক আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আমি প্রথমে টর্চের আলো ফেললাম মৃত চিতার দেহের উপর, এরপর মাটিতে পড়ে থাকা মেয়েটার দিকে। আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভদ্রলোক ছুটে গেলেন মেয়েটার দিকে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে অজ্ঞান মেয়েটার মাথা তুলে নিলেন নিজের বুকে। আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় জানিয়ে সবকিছু খুলে বললাম। আমার কথা শেষ হওয়ার পর তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। জঙ্গলের পাশের এই চণ্ডিপুর চা বাগানের মালিক তিনি। তাঁর নাম নাজিম লোহানী। নিজের নাম বলবার সময় অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য অনুভব করলাম তার গলায়। এই অজ্ঞান মেয়েটা তাঁর একমাত্র কন্যা। রূপন্তী। মেয়েটা অদ্ভুত একটা রোগে আক্রান্ত। প্রায়ই গভীর রাতে নিজের অজান্তে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে ঘরের বাইরে এসে হাঁটা শুরু করে সে। এক সময় হঠাৎ সজ্ঞানে ফিরে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এরপর দীর্ঘ ঘুমের মাধ্যমে তার জ্ঞান ফেরে। জ্ঞান ফিরবার পর রাতের ঘটনা সম্পর্কে সে কিছুই মনে করতে পারে না। সেই রাতের সংকটময় ক্ষণে নাজিম লোহানীর পক্ষে এরচেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব ছিল না। ধরা গলায় কথাগুলো বলে হাতের টর্চটা একজন সাঁওতালের দিকে এগিয়ে দিয়ে রূপন্তীর অজ্ঞান দেহটা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন নাজিম লোহানী। তাদেরকে বাংলোর গেটের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমি বিদায় চাইলাম। ভদ্রলোক বারবার অনুরোধ করলেন বাকি রাতটা তাঁর বাংলোয় কাটিয়ে যাওয়ার জন্য। সবিনয়ে তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে সুবিশাল বাংলোর গেট ছেড়ে শেষ

রাতের হাত ধরে আমি রওনা দিলাম মধুপুর ফরেস্টের বনবাবুর কাঠের বাংলোর উদ্দেশে।

মানুষখেকো চিতা মারা যাওয়ার পর সমগ্র অঞ্চলের মানুষের মনের দীর্ঘদিনের আতংক কেটে গিয়ে স্বস্তি নেমে এল চারদিকে। বহু পাহাড়ী আমার কাঠের বাংলোয় এসে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। তারা কেউ জানে না এই মানুষখেকো চিতা মারতে গিয়ে চিতা শিকারের উত্তেজনাকে ছাপিয়ে কী বিশাল উত্তেজনাময় ঘটনা ঘটে গেছে। অফিসের লোকজন আর পাহাড়ীদের কাছে নাজিম লোহানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে অনেক কিছু জানতে পারলাম। শুধু চণ্ডিপুর চা বাগান নয়, রিজার্ভ ফরেস্টের আশপাশের অনেকগুলো চা বাগানের মালিক তিনি। চা বাগান ছাড়াও অনেক ধরনের কলকারখানা রয়েছে তাঁর। প্রভাবশালী মানুষ হওয়ায় সাধারণ মানুষ তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। যেমন সবাই জানে অগাধ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও নাজিম লোহানী দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন। একমাত্র কন্যা সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রীর। তাঁর একমাত্র আদরের কন্যা সন্তান অদ্ভুত এক রোগে আক্রান্ত। অবশ্য তাঁর মেয়ের চিতাবাঘের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসবার খবরটি কেউ জানে না। হয়তো মালিকের ভয়ে ঘটনাটা বুকের ভিতর চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছে সেই বন্দুকধারী তিন সাঁওতাল। প্রাচুর্যকে এড়িয়ে চলা আমার চরিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নাজিম লোহানীর বাংলোয় গিয়ে সেই রাতে তাঁর বলা সংক্ষিপ্ত কথাগুলো বিস্তারিতভাবে শোনা হলো না।

'এক বিকালে বাংলোর বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম দু'জন বিট অফিসারের সঙ্গে। বারান্দার সামনের খোলাস্থানে এসে থামল একটা ল্যান্ড রোভার জিপ। অভিজাত ভঙ্গিতে ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে নামলেন একজন ভদ্রলোক। পরনের হালকা নীল রঙের হাওয়াই সার্ট আর চোখের ভারি কাঁচের কালো ফ্রেমের

চশমায় নাজিম লোহানীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। বিট অফিসারদের বিদায় করে দিয়ে তাঁকে নিয়ে বেতের সোফায় বসলাম। মনিপুরী বাবুর্চি দেবনাথ চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ। চা শেষ করে তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। আমি বুঝলাম সেদিন রাতে বলা সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। ভদ্রলোকের গুছিয়ে কথা বলবার ভঙ্গি আমার কাছে ভাল লাগল। নিজের জীবন এবং তাঁর মেয়ের শৈশব-কৈশোরের কথা সব খুলে বললেন এক এক করে। রূপন্তীর মধ্যে প্রথম এই রোগের আবির্ভাব ঘটে কিশোরী বয়সে। এরপর তাকে বহু ডাক্তার আর মনোবিজ্ঞানী দেখানো হয়। কিন্তু কয়েক মাস ভাল ভাবে কাটবার পর আবার ঘটে যায় একই ঘটনা। বাধ্য হয়ে তিনি রাতের পর রাত মাসের পর মাস রূপন্তীর ঘরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে রাখতেন। অনেক নামকরা পরিবার থেকে রূপন্তীর বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু মেয়ের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে একের পর এক প্রস্তাব তিনি নাকচ করে দিয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন এসব প্রস্তাবকারীদের কাছে রূপন্তীর কোন মূল্য নেই। তাদের সবার দৃষ্টি তাঁর ধন সম্পদের প্রতি। গত বছর তিনি রূপন্তীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে গিয়েছিলেন। সেই মনোবিজ্ঞানীর চিকিৎসায় রূপন্তী সুস্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বছর খানেক সময় কেটে যায় এভাবে। অবশেষে তিনি ভেবেছিলেন তাঁর মেয়ে সুস্থ হয়ে গেছে। তাই রাতের বেলা রূপন্তীর ঘরের দরজায় তালা দেওয়ার চিন্তা আস্তে আস্তে তাঁর মাথা থেকে হারিয়ে যায়। আর একরাতে ঠিকই তার পুরনো রোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ঘর ছেড়ে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় জঙ্গলে। নিজের অজান্তে এক ভয়ংকর মানুষখেকো চিতার সামনে পড়ে যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছা আর একজন মানুষের সহায়তায় মৃত্যুর

ঘাত থেকে রক্ষা পায় সে। এই ঘটনার পর থেকে আবার শুরু হয় নাজিম লোহানীর উদ্বিগ্ন জীবন।

দেখতে দেখতে ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেল বারান্দা। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক এমন একটা সময়ের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন নাজিম লোহানী। তিনি সরাসরি আমাকে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিলেন। আমি যেন বোবা বনে গেলাম। একী বলছেন ভদ্রলোক! রাজকন্যা আর রাজত্ব দুই-ই তিনি তুলে দিতে চাইছেন আমার হাতে। অজ্ঞাত-অখ্যাত একজন ফরেস্টারের জন্য এটা নিঃসন্দেহে একটা অকল্পনীয় প্রস্তাব। কিন্তু আমার ভিতরে হঠাৎ প্রচণ্ড একটা রাগ ফুঁসে উঠল। ভদ্রলোক ভেবেছেন কী? তাঁর সম্পত্তির লোভে একটা আধপাগল মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য আমি লাফিয়ে রাজি হয়ে যাব? মুখে রাগ প্রকাশ না করে ধীর গলায় আমি তাঁকে আমার অপারগতার কথা জানিয়ে দিলাম। বিদায় না নিয়েই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলেন ল্যান্ড রোভারের দিকে। হেডলাইটের তীব্র আলোর ধারা ছড়িয়ে পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা রাস্তায় হারিয়ে গেল তাঁর জিপগাড়ি।'

এ পর্যায়ে এসে ইমতিয়াজ প্রফেসরের অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বুক ভরা ধোঁয়া নিয়ে সে যেন পুরনো স্মৃতি রোমন্থনের চেষ্টা করছে। প্রফেসরের নির্বাক দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে রইল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে। কাহিনীর শেষ অংশ শুনবার জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পুড়ে যাওয়া সিগারেটে শেষ টান দিয়ে আবার শুরু করল ইমতিয়াজ। 'আমার উপর প্রচণ্ড রাগ নিয়ে সেদিন বাংলো থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন নাজিম লোহানী। তাই আমার মনে একটা ক্ষুদ্র ভয় দানা বেঁধে উঠেছিল। কারণ তাঁর মত একজন প্রভাবশালী মানুষের আঙুলের ইশারায় আমার জীবনে যে কোন বড় ক্ষতি ঘটে যেতে পারে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি তেমন কিছু করলেন না।

বরং আমি অনেক ধরনের পরোক্ষ সহযোগিতা পেলাম তাঁর কাছ থেকে।

'যে কোন রিজার্ভ ফরেস্টে বন্যপ্রাণী বা পাখি শিকার আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু মধুপুরে এ আইন কিছুটা ভিন্ন। এখানে চা বাগানের মালিক ও কর্মকর্তাদের কিছুটা শিকারের সুবিধা দিতে হয়। এর কারণ মধুপুর ফরেস্টকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে ব্যক্তি মালিকানাধীন অসংখ্য চা বাগান। সরকারী লোকদেরকেও চা বাগানের রাস্তা দিয়ে রিজার্ভ ফরেস্টে ঢুকতে হয়। মোটকথা মধুপুরের জীবজন্তু আর মানুষের সুবিধা-অসুবিধার একটা বিরাট অংশ নির্ভর করে চা বাগানের মালিক আর কর্মচারীদের ওপর। তাদেরকে অবশ্য একটা নির্দিষ্ট তালিকা মেনে শিকার করতে হয়। আর এই তালিকাটি তাদেরকে বনবিভাগের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়।

একদিন বিকালে বনের ভেতর দিয়ে জিপ চালিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ খুব কাছ থেকে গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। জিপ থামিয়ে বন্দুক হাতে ছুটলাম শব্দ লক্ষ্য করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে কয়েক মিনিট লাগল। খোলাস্থানে একটা পাকড়া ধনেশ পাখি হাতে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে একজন সাঁওতাল, তার পাশে দাঁড়ানো চিকন নলের পয়েন্ট টুটু বোরের রাইফেল হাতে শিকারের পোশাক পরা এক তরুণী।

তরুণীর মুখের দিকে তাকাতেই দ্বিতীয় বারের মত একটা অদ্ভুত ধাক্কা অনুভব করলাম নিজের বুকে। কিন্তু পরক্ষণেই দৃষ্টি ফেরালাম ধনেশ পাখিটার দিকে। দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির এই বিশাল পাখিটা কয়েক সপ্তাহ আগে রিজার্ভ ফরেস্টে এসে আশ্রয় নিয়েছে। পাখিটাকে দেখে রাখার জন্য প্রত্যেক ফরেস্ট গার্ডকে আমি আলাদাভাবে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অথচ আমার কাছ থেকে অল্পদূরে পাখিটাকে গুলি করে মারল লোহানী সাহেবের মেয়ে, আমি কিছুই করতে পারলাম না। নিজের ব্যর্থতায় গা

জ্বালা করে উঠল আমার। কড়া করে ধমক দিলাম মেয়েটাকে। আমার কথায় মেয়েটার মুখ লাল হয়ে গেল। হয়তো জীবনে কারও কাছ থেকে এ ধরনের কড়া কথা শোনেনি সে। জিপের কাছে ফিরে আসার সময় পেছন ফিরে তাকাতেই দেখলাম মেয়েটার চোখ গড়িয়ে নামছে জলের ধারা। মনে মনে ভাবলাম এবার নিশ্চয়ই আমাকে লোহানীর রুদ্ররোষের শিকার হতে হবে।

পরদিন সকালে বাংলোর দরজা খুলতেই আমার দৃষ্টি আটকে গেল বারান্দার বেতের চেয়ারে। নীল শাড়িতে সকালের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, রূপন্তীকে মনে হচ্ছে বন বাংলোর বারান্দায় বসা এক নীল অপ্সরী। সামান্য একজন ফরেস্ট অফিসারের রুক্ষ আচরণে অভিমানী মেয়ে নিশ্চয় ছুটে গিয়েছিল তার প্রভাবশালী বাবার কাছে। কিন্তু তার বাবা ফরেস্টারকে শাস্তি দেওয়ার কোন কথা না বলে তাঁকে এমন কিছু কথা খুলে বলেছেন যাতে সে নিজে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছে এই বন বাংলোর দুয়ারে। রূপন্তী প্রথমে আমার কাছে ক্ষমা চাইল দুষ্প্রাপ্য পাখিটাকে গুলি করে মারার জন্য। এরপর সে জানতে চাইল সেই ভয়ংকর রাত্রির কথা। আমি বার বার এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। রূপন্তী প্রথম বারের মত আমার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। তৃতীয় বারের মত সেই অদ্ভুত ধাক্কা অনুভব করলাম বুকে এবং বুঝলাম আমি জড়িয়ে যাচ্ছি অন্য এক জীবনে। সেই বুনো বাতাসে ভরা সকালে আমি কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলাম রূপন্তীর চোখের সমুদ্রে। রূপন্তী সত্যিই রূপন্তী। কি অপরূপ সৌন্দর্য দান করে বিধাতা তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, কিন্তু কত ভয়ংকর একটা রোগ বয়ে বেড়াচ্ছে এই সুন্দর দেহটা। ক্ষণে ক্ষণে তার প্রতি আমার মায়া বাড়তে লাগল। মায়া থেকে আকর্ষণ, আকর্ষণ থেকে ভাললাগা, ভাললাগা থেকে প্রেম।

সেই সকালের পর থেকে রূপন্তী জড়িয়ে গেল আমার জীবনে। মন-প্রাণ দিয়ে আমি কামনা করতে লাগলাম রূপন্তীর আজীবন সান্নিধ্য। আমাদের ঘনিষ্ঠতার খবর পৌঁছে গেল নাজিম লোহানীর কানে। আমার মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পারলেন। দ্বিতীয় বারের মত হঠাৎ একদিন সেই পুরনো প্রস্তাব নিয়ে আমার বাংলোয় এলেন ভদ্রলোক। তিনি বললেন, আর আমি মাথা নিচু করে সব শুনে গেলাম। আমি নিজের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য তাঁর কাছে তিন দিন সময় চাইলাম। হাসি মুখে বাংলো থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

চিন্তা আর দুশ্চিন্তার দোলায় কেটে গেল তিনটি দিন। মনে মনে সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেলেছি। এরপর এক পাহাড়ী সন্ধ্যায় বিশাল বাংলোর ড্রয়িংরুমে নাজিম লোহানীর মুখোমুখি বসলাম। বললাম, রূপন্তীকে আমি জীবন সঙ্গী হিসাবে পেতে চাই তবে আমার দুটো শর্ত আছে। প্রথম শর্ত, বিয়ের পর বাবার ধন সম্পদের উপর রূপন্তীর কোন অধিকার থাকবে না। দ্বিতীয় শর্ত, বিয়ের পর রূপন্তীকে নিয়ে আমি সিলেট ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাব।

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে চিন্তা করবার পর আমার শর্ত দুটো মেনে নিলেন নাজিম লোহানী। এরপর এক শুভক্ষণে আমাদের বিয়ে সম্পন্ন হলো। প্রাসাদের মত সুবিশাল বাংলো ছেড়ে রূপন্তী চলে এল আমার ছোট্ট কাঠের বাংলোয়। বাসর রাতে ঘরের দরজার ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে চাবি দিয়ে দিলাম বাবুর্চি দেবনাথের হাতে। প্রতিদিন সকালে আমাদের ঘুম ভাঙত দেবনাথের ডাকে। রূপন্তীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এভাবেই আমাকে দাম্পত্য জীবন শুরু করতে হয়েছিল।

কিছুদিন চেষ্টা তদ্বির করার পর আমার বদলী অর্ডার এসে উপস্থিত হলো অফিসে। আমাকে সিলেট থেকে বদলী করা হয়েছে বান্দরবানের মাতামুহুরী রিজার্ভ ফরেস্টে। জিনিস-পত্র

গুছানোর মাঝ দিয়ে কেটে গেল কয়েকটি দিন। ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে লাগল আমাদের মধুপুর ফরেস্ট ত্যাগ করবার দিন। একরাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, আর মাত্র সাতদিন পর ফরেস্টের জিপে চড়ে আমরা রওনা দেব বান্দরবানের উদ্দেশে। শুনেছি জায়গাটা খুব দুর্গম, সেখানে কেমন কাটবে আমাদের দিন–এসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। গভীর রাতে হঠাৎ যেন কীসের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় হাত বাড়িয়ে রূপন্তীকে পেলাম না। ঘরের আলো নেভানো। আবছা অন্ধকারে দেখলাম রূপন্তী দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। হাত দিয়ে সে তালা খোলার চেষ্টা করছে। তালার খটখট শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে ছুটে গেলাম রূপন্তীর দিকে। তার শরীরে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

রূপন্তীর ঘুম ভাঙল পরদিন দুপুরে। গতরাতে কী ঘটেছিল তা মনে করতে না পারলেও ঘুম ভাঙার পর রূপন্তী ঠিকই বুঝতে পারল সে আবার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ক্রমেই আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে চলল। সামনের দিনের কথা ভাবতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়লাম। দুশ্চিন্তা আর হতাশার ভাবনার মিলিত স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল একটি নাম, মিরাজ চৌধুরী।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের মানসিক বিভাগের প্রধান প্রফেসর মিরাজ চৌধুরী একবার লঞ্চ ভাড়া করে সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছিলেন। একা এসেছিলেন তিনি। সুন্দরবনে বেড়ানোর সময় এই উদাসী মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাদাবনের অসংখ্য খাল আর শিশখালে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম আমি। বিদায় নেবার সময় তিনি আমাকে তাঁর ঢাকার চেম্বারের ঠিকানা লেখা একটা কার্ড দিয়ে গিয়েছিলেন। মানিব্যাগ থেকে সেই কার্ডটা বের করে হাতে নেওয়ার পর

নতুন একটা আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল আমার মাথায়।

বিদায়ের দিন অশ্রুসজল চোখে নাজিম লোহানী আমাদেরকে জিপে তুলে দিলেন। জিপের ড্রাইভারকে প্রথমে সোজা ঢাকার দিকে যেতে বললাম। মিরাজ চৌধুরীর কাছে ফোন করে আগেই আমাদের আসবার কথা তাঁকে জানিয়ে রেখেছিলাম। পাঁচ ঘণ্টার জিপ জার্নির পর ঢাকায় এসে পৌঁছলাম। প্রবীণ মনোবিজ্ঞানী সময় নিয়ে রূপন্তীর সঙ্গে কথা বললেন। এরপর আলাদা ভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন। আমাকে তিনি যা বললেন তার অর্থ হচ্ছে, রূপন্তী স্লিপ ওয়াকিং ডিজঅর্ডার রোগে আক্রান্ত। শৈশবে পাওয়া কোন তীব্র ভয় অথবা ভয়ংকর কোন দুঃস্বপ্ন থেকে এই রোগ মানুষের মনে বাসা বাঁধে। এটা জটিল এক ধরনের মানসিক রোগ। ডাক্তারী শাস্ত্রে এ রোগের নির্দিষ্ট কোন ওষুধ নেই। চিকিৎসকরা এসব রোগীকে সাধারণত ওষুধ দিয়ে থাকে অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়বার মত। কারও ঢিল লাগে, কারওটা লাগে না। এসব রোগীদের পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবার ঘটনা পৃথিবীতে খুবই বিরল। তবে রূপন্তীর সুস্থ হয়ে উঠবার একটা সম্ভাবনা এখনও আছে। অনেক সময় এ ধরনের রোগাক্রান্ত মেয়েরা বাচ্চা প্রসবের পর এই মানসিক রোগ থেকে মুক্তি পায়। এর কারণ নারীর গর্ভে বাচ্চা আসবার সঙ্গে সঙ্গে দেহ মনে একটা শক্তিশালী জৈবিক পরিবর্তন ঘটে। তীব্র এক যন্ত্রণাময় অনুভূতির মাধ্যমে প্রতিটি নারী মা হবার যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। প্রবল কিছু পরিবর্তন আর সীমাহীন কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মাতৃত্ব লাভের পর অনেক ভয়ংকর সিজোফ্রেনিক রোগিণীকেও সুস্থ হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

একেই বোধহয় বলে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস! এক, দুই করে বারো মাস পার হলো আমাদের দাম্পত্য জীবনের। রূপন্তীর মা হওয়ার কোন লক্ষণ নেই দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লাম আমি। যাই

যাচ্ছি করেও ডাক্তারের কাছে যাওয়া হচ্ছে না। এভাবে আরও ৬'মাস কাটল। আর তো অপেক্ষা করা ঠিক নয় জানা দরকার কী ঘটনা। আবার আমরা একদিন ঢাকায় এসে একজন বিখ্যাত ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম।

অনেক পরীক্ষা আর টেস্টের পর ডাক্তার যা বললেন, শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। রূপন্তী মা হচ্ছে না, সেজন্য ও দায়ী নয়। দায়ী আমি। আমার স্পার্ম কাউন্ট কম, ফলে আমি কোনদিন বাবা হতে পারব না।

আমাদের দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনগুলো কেটেছিল শঙ্খনদীর উজানের এই বন বাংলোয়। একদিকে খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, দুইদিকে সুউচ্চ পাহাড়, অন্যদিকে উপত্যকা– সত্যিকারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে বাংলোকে। বাংলোর দারোয়ান শ্যামলাল আর বাবুর্চি চন্দদ্বীপ দু'জনই মুরং উপজাতি। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যার মুরংদের বাস। প্রথম এক বছর রাতের প্রতিটি মুহূর্ত আমি রূপন্তীর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবার চেষ্টা করেছি। দু'বার তাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় মিরাজ চৌধুরীর কাছে গেছি। এক বছরের মধ্যে একটি রাতও রূপন্তীর দেহে কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি। মিরাজ চৌধুরী আশা ব্যক্ত করেছিলেন, রূপন্তীকে দেওয়া তাঁর ওষুধগুলো সঠিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বৃদ্ধের প্রতি বার বার শ্রদ্ধায় আমার মাথা অবনত হয়ে গেল। দেড় বছরের মাথায় আমার কেন যেন মনে হলো, রূপন্তী এখন পুরোপুরি সুস্থ। এই বাংলোয় আসবার প্রথম থেকে রাতের বেলা ঘরের ভিতর থেকে তালা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিতাম শ্যামলালের কাছে। চাবি দেওয়া-নেওয়ার সময় বার বার আমার চোখের দিকে অবাক ভাবে তাকিয়ে থাকত সে। এতে আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগত। রূপন্তীর সুস্থতার কথা অনুভব করে আস্তে আস্তে ঘরে

তালা দেওয়া বন্ধ করে দিলাম। নিবিড় সুখের ছোঁয়া নিয়ে প্রতিটি সকাল এসে দেখা দিল আমাদের জীবনে। আমার বুকের ভিতর থেকে যেন একটা বহুদিনের চেপে রাখা পাহাড় আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মত যন্ত্রণাদায়ক সেই অসুখের কথা এখন আমরা ভুলেও মুখে নেই না। সুখের দিন রাত আরও সুখময় হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিদিন বিকালে বাংলো থেকে বাইরে এসে আমরা বসে থাকি নদীর ধারে। অর্ধশত মাইল দূরের আকাশ ছোঁয়া মাউন্ট ফ্যাটিকের বুক থেকে বয়ে আসা পাহাড়ী স্রোতের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। কখনও কখনও রূপন্তীর হাত ধরে হাঁটি বাংলোর পশ্চিমের উপত্যকার সবুজ প্রান্তর ধরে। উপত্যকার সবুজ প্রান্তর রূপন্তীর খুবই পছন্দের স্থান। মাঝে মাঝে সে একা একা এসে ঘুরে বেড়ায় তৃণভূমির বুকের সবুজ প্রান্তরে। শুধু সুখ আর সুখ অনুভব করলাম আমার চারদিকে। কিন্তু সুখ পাখির ডানায় ভর দিয়ে উড়তে গিয়ে বার বার কী যেন এক অজানা ভয়ে দুলে উঠল আমার দেহ-মন। এক রাতে আমার সেই অজানা ভয় ঠিকই সত্যে রূপান্তরিত হলো। যে ঘটনার রেশ জনম জনম বয়ে বেড়াতে হবে আমাকে। পাহাড়ী রাতের এক নীরব ক্ষণে হঠাৎ বিছানার পাশে হাত পড়তেই দেখলাম রূপন্তী বিছানায় নেই। খোলা দরজা দিয়ে হুহু করে পূর্ণিমার আলোমাখা বাতাস ঢুকছে ঘরে। কী ঘটে গেছে বুঝতে পেরে আমার অন্তঃরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বাংলোর বাইরে ছুটে গেলাম। কোন দিকে যাব রূপন্তীর খোঁজে? প্রথমেই মনে পড়ল রূপন্তী সাঁতার জানে না। অবচেতন অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে নদীতে পড়ে গেলে নির্ঘাত মৃত্যু হবে তার। অবারিত জ্যোৎস্নার আলো খেলা করছে চারদিকে। সে আলোয় চারদিকে পরিষ্কার ভাবে দেখার সুযোগ পেলাম আমি। এক পাথরের উপর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে শঙ্খ নদীর তীর ধরে ছুটতে লাগলাম। কোথাও রূপন্তীকে দেখতে

পেলাম না। এবার পার ছেড়ে ছুটলাম উপত্যকার দিকে। তৃণভূমির সমতল চত্বর দিয়ে ছুটতে ছুটতে চাঁদের আলোয় রূপন্তীর সাদা রঙের নাইট গাউনের আভা আমার চোখে পড়ল। রূপন্তীর নিঃসাড় দেহটা পড়ে আছে তৃণভূমির ঠিক মাঝখানে। ঘাসের বুকে পড়ে থাকা দেহটার দিকে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো আমাকে। যা দেখলাম তাতে মনে হলো, নিজের চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করছে আমার সঙ্গে অথবা আমি যা দেখছি তা বাস্তব নয়, স্বপ্ন। সেই ছোটকাল থেকে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে গিয়ে জঙ্গলের সব বন্য প্রাণী আর সরীসৃপের জীবন প্রক্রিয়া আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে বন্দুক বা টর্চ নেই। তবু ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে মাটিতে পড়ে থাকা রূপন্তীর দেহটাকে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে একটা বিশাল অজগর। যে ভঙ্গিতে অজগরটা রূপন্তীকে পেঁচিয়ে ধরেছে কখনোই এরা এভাবে ভক্ষণরত শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে না। সঙ্গমরত অজগরদের পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রাখবার দৃশ্য আমি বহুবার দেখেছি। অতীতে দেখা দৃশ্যগুলো বার বার মাথার ভিতর ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমার সমস্ত শরীর রাগে কাঁপতে লাগল। কী করব আমি তখন? হাতে বন্দুক নেই। বন্দুক থাকলেও এ অবস্থায় অজগরটাকে গুলি করতে পারতাম কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পৃথিবীর সমস্ত অসহায়ত্ব আর দুর্বলতা যেন গ্রাস করল আমায়। রূপন্তী, আমার রূপন্তীর জীবনে এ কী নির্মম ঘটনা ঘটে চলেছে। মধুপুরে যাকে আমি ভয়ংকর মানুষখেকো চিতার হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম আজ সে শঙ্খনদীর উজানের জঙ্গলে আমার চোখের সামনে ধর্ষিত হচ্ছে এক অতিকায় সরীসৃপ দ্বারা, অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না। আমার অসহায়ত্ব আর দুর্বলতাকে ছাপিয়ে হঠাৎ দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল বুকের ভিতর। আর স্থির থাকতে পারলাম না।

উন্মাদের মত ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে ছুটলাম বাংলোর দিকে। বাংলোর আধমাইল পথ অতিক্রম করে বন্দুক নিয়ে কীভাবে আবার রূপন্তীর কাছে এসে পৌঁছলাম তা আমার মনে নেই। তবে সেখানে পৌঁছেই দেখলাম রূপন্তী একা পড়ে আছে। আশপাশে কোথাও অজগরটাকে দেখতে পেলাম না। রূপন্তীকে পেঁচিয়ে ধরে রাখবার সময় অজগরের দেহের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছিল, সেটাকে মনে গেঁথে নিয়ে রূপন্তীকে কোলে তুলে রওনা দিলাম বাংলোর দিকে। বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার পর তার দেহের কোথাও অজগরের দাঁতের আঘাত অথবা অন্য কোন আঘাতের চিহ্নই খুঁজে পেলাম না। শুধু বিশেষ একটা অঙ্গে অজগরটা তার মিলনের চিহ্ন রেখে গেছে।

ঝাড়া চব্বিশ ঘণ্টা পর রূপন্তী চেতনা ফিরে পেল। ভয়ার্ত চোখে তাকাল আমার দিকে।

তাকে কোন ভাবেই গত রাতের ঘটনা খুলে বলা যাবে না। অভয় আর সান্ত্বনা দিয়ে তাকে স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করলাম। জংলী কুকুরের তাড়া খাওয়া হরিণীর মত এক সময় রূপন্তী ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে। তাকে ডাক্তার বা মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম। ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিলাম জীবন। আবার শুরু হলো ভেতর থেকে ঘরে তালা ঝুলিয়ে রাখার পালা। আমি বুঝে গেলাম রূপন্তী আর কোন দিন সুস্থ হয়ে উঠবে না।

একঘেয়ে তালে কেটে যেতে লাগল দিনরাত। শঙ্খনদীর বুকে চলছে নিত্য স্রোতের খেলা। এক পড়ন্ত বিকালে নদীর তীর ধরে হাঁটছিলাম দু'জন। আজ বার বার কেমন যেন একটা রহস্যময় হাসি দেখতে পেলাম রূপন্তীর ঠোঁটে। এ হাসি আগে কখনও দেখিনি। এক সময় খিল খিল করে হেসে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরল সে। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, সে মা হতে চলেছে। খুব কাছে শক্তিশালী বোমা

বিস্ফোরিত হলে মানুষের মনের অবস্থা যা হয় ঠিক সে ধরনের অনুভূতিতে আমার প্রতিটি লোমকূপ খাড়া হয়ে গেল। গলা দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক আওয়াজ প্রায় বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু যথাসম্ভব দ্রুত নিজকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলাম। রূপন্তী টের পেল না, বাবা হওয়ার সংবাদ শুনে খুশিতে লাফিয়ে উঠবার বদলে কি এক ভয়ংকর আতংকের স্রোত বয়ে গেল আমার বুকের কন্দরে!

দিনের শান্তি আর রাতের ঘুম হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে। সময়ের ধারায় গড়িয়ে রূপন্তীর বাচ্চা প্রসবের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল। এক রাতে প্রচণ্ড প্রসব বেদনা শুরু হলো। বিকালের দিক থেকেই ব্যথা শুরু হয়েছিল। তাই দারোয়ান শ্যামলালের বউ এবং আরেকজন দাইকে খবর দিয়ে এনে রেখেছিলাম বাংলোয়। সারারাত আমি বাংলোর বারান্দায় পায়চারি করে কাটালাম। মনের পর্দায় বারবার ভেসে উঠল সেই ভয়ংকর রাতের কথা, যে রাতে নিজের সঙ্গিনীর মত এক অজগর জড়িয়ে ধরে রেখেছিল রূপন্তীকে। আমি জানতাম রূপন্তীর গর্ভে কোন দিন সন্তান আসবে না। কারণ আমি বাবা হওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছি অনেকদিন আগে। তাই রূপন্তী গর্ভবতী হয়ে উঠবার পর থেকে মানসিক বিপর্যয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। পায়চারি করতে করতে বার বার ভাবছি, কে আসবে আজ পৃথিবীতে? কী হবে তার চেহারার ধরন।

সারারাত বাচ্চা প্রসব করানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল দাই আর শ্যামলালের বউ। শেষ রাতের দিকে জ্ঞান হারাল রূপন্তী। সকালে তার অজ্ঞান দেহটাকে স্পিডবোটে তুলে বান্দরবান স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলো। রোগিণীর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তাররা। তাঁরা আমাকে দ্রুত চট্টগ্রাম রওনা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অ্যামবুলেন্সে তুলে দেয়া হলো অচেতন রূপন্তীকে। পাহাড়ী উঁচু-

নিচু রাস্তা ধরে ছুটে চলল গাড়ি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গাড়ি এসে থামল চট্টগ্রামের সাউথল্যান্ড নার্সিংহোমের সামনে।'

কথা থামিয়ে ইমতিয়াজ হঠাৎ তাকাল প্রফেসরের দিকে। হাঁ হয়ে আছে বৃদ্ধের মুখ, দুই চোখে বিস্ময়। তাঁর চোখ দুটিতে ইমতিয়াজ দেখতে পেল অজানাকে জানবার এক তীব্র আগ্রহ। জ্ঞানী-অভিজ্ঞ বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে ইমতিয়াজ আবার কথা বলা শুরু করল, 'রূপন্তীর মৃতপ্রায় অবস্থা দেখে আপনি নিজে সেদিন অপারেশনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু আপনার সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে অপারেশনের টেবিলে মারা গিয়েছিল সে। মৃত রোগিণীর পেটে ছুরি চালাতে গিয়ে এক সময় আপনার চোখ পড়ে অদ্ভুত এক মানব শিশুর ওপর। সাপ আর মানুষের দেহের এক অবাক করা সমন্বয় নিয়ে যে এসেছে পৃথিবীতে, এক কথায় তাকে বলা যায় সর্প মানব। সেদিন আমি সেই অদ্ভুত আকৃতির বাচ্চাটাকে দেখে কেন আঁতকে উঠিনি, আজ নিশ্চয় তা বুঝতে পারছেন, প্রফেসর। এই ব্যতিক্রমধর্মী শিশু যে আপনার জীবনে একটা মহাচিন্তার বিষয় হয়ে উঠবে সেটা আমি সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম সব খুলে বলব আপনাকে। তবে তার আগে শেষ করতে হবে অব্যক্ত এক প্রতিশোধের জ্বালা।

'রূপন্তীর মৃতদেহ সমাহিত করার পর সব খুলে বলেছিলাম নাজিম লোহানীকে। তারপর সোজা এসে উপস্থিত হয়েছিলাম শঙ্খনদীর উজানের সেই বাংলোয়। রূপন্তীর মৃত্যুর পর সেই সর্প মানবটাকে এক নজর দেখে আপনাকে আমি বলেছিলাম একটা কাজ শেষ করে এসে সব কিছু খুলে বলার কথা। গতকাল আমি কাজটা শেষ করেছি। আগেই বলেছি বনের জীবজন্তু আর সরীসৃপের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। তাই সেই অমঙ্গলের রাতে অজগরটার দিকে তাকিয়ে সেটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছিল। কোন কারণে সাপের লেজটা গোড়া

থেকে কাটা পড়েছিল। খেপা শার্দুলের মত পাহাড়ের ঝোপ জঙ্গল আর গুহা উপগুহায় গত এক মাস আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরেছি লেজ কাটা অজগরটাকে। গতকাল বাংলো থেকে প্রায় নয় মাইল দূরের এক পাহাড়ের গুহায় খুঁজে পাই লেজকাটা অজগরকে। শুধু বন্দুক-রাইফেল তীর-ধনুক, বল্লম-ফাঁদ ইত্যাদি ব্যবহার করেও আমি জীবনে বহু জীবজন্তু শিকার করেছি। সেই ক্ষণে মৃত রূপন্তীর সুন্দর মুখখানা ভেসে উঠল আমার মনের পর্দায়। বর্বর, আদিম এক হিংস্র জিঘাংসায় জ্বলে উঠল আমার শিরা উপশিরা। বন্দুকটা হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে পিঠে ঝোলানো শিকারের ব্যাগ থেকে দড়ির ফাঁসটা বের করে কৌশলে তা পরিয়ে দিলাম অজগরের গলায়। হেঁচকা টানে অজগরের মাথাটাকে গর্তের বাইরে বের করে এনে বেঁধে ফেললাম একটা পাহাড়ী চাম্বল গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। বার বার চেষ্টা করে গলায় এঁটে থাকা নাইলনের শক্ত রশিটা ছিঁড়তে ব্যর্থ হলো সে। রশিটা শক্ত করে আটকে গেল অজগরের গলায়। ব্যর্থ অজগর প্রচণ্ড আক্রোশে পেঁচিয়ে ধরল চাম্বল গাছের গুঁড়ি। এবার কোমরের খাপ থেকে ভোজালী আকারের শিকারের ছুরি হাতে ক্ষিপ্র গতিতে অজগরটাকে আক্রমণ করলাম আমি। অজগরটা যত বেশি কষ্ট পেয়ে মরবে ততই আমি বেশি আনন্দ পাব। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম লেজের দিক থেকে কাটতে শুরু করব। প্রথম কোপ দিলাম ভোঁতা লেজের এক হাত উপরে। ভোঁতা লেজের ডগাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকটিকির লেজের মত লাফাতে লাগল। রক্তে ভেসে গেল চারদিক। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল আহত অজগর। প্রথম কোপ দিয়ে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিলাম আমি। সুযোগ বুঝে আবার দ্রুত লাফিয়ে সামনে এসে অজগরের দেহ থেকে আরও এক হাত অংশ খসিয়ে দিলাম। এসব আঘাতে অজগরটা মারা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তার দেহ থেকে একটার পর একটা অংশ ছুরির কোপে খসে পড়ছে। এদিকে হত্যার

আনন্দে আমি যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। অজগরের ঘাড় বরাবর এঁটে থাকা দড়ির কাছে শেষ কোপ দিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। অদ্ভুত এক আনন্দে আর সীমাহীন ক্লান্তি চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল আমায়।'

চুপ হয়ে গেল ইমতিয়াজ। এবার প্রফেসর যখন কিছু বলবার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই ইমতিয়াজ তাঁকে কোন রকমের বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দেহ ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দরজার পাশের বুক শেলফের উপর কাঁচের জারে তরল ফরমালিনে ডুবিয়ে রাখা সর্প মানবের ক্ষুদ্র সংস্করণের দিকে। তারপর হঠাৎ দ্রুত হেঁটে দরজা পার হয়ে লম্বা করিডর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও ইমতিয়াজকে পিছু ডাকবার সাহস খুঁজে পেলেন না প্রফেসর। এই মুহূর্তে নিজের সমস্ত আত্মপরিচয় ভুলে গেলেন তিনি। আজ সবকিছুকে ছাপিয়ে নিজেকে তাঁর মনে হলো একজন সৌভাগ্যবান–গর্বিত শ্রোতা।

সরওয়ার পাঠান

বিদ্বেষিণী

সে সময় তেমন একটা রমরমে অবস্থা ছিল না নিউরেমবার্গের। পর্যটকদের মধ্যে খুব কম লোকেই জানত এই পুরানো শহরটা সম্পর্কে। আমরা বেরিয়েছিলাম হানিমুনে। তখন দ্বিতীয় সপ্তা চলছে, স্বভাবতই এই অচেনা জায়গায় তৃতীয় কারও সঙ্গ কামনা করছিলাম। ঠিক এসময় হাসিখুশি আগন্তুক এলিয়াস পি. হাচেসনের সাথে দেখা। ব্লীডিং গাল্‌শের ইস্‌থমেইন সিটি থেকে এসেছে সে। জায়গাটা ম্যাপ্‌ল ট্রী কাউন্টিতে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্টেশনে আমাদের পরিচয়। কথাপ্রসঙ্গে টের পেলাম, ইউরোপের একটি শহরের সবচেয়ে প্রাচীন জায়গা পরিদর্শন করতে যাচ্ছে সে। আর আকারে-ইঙ্গিতে এলিয়াস এটাও বোঝাল, একটা লোক যতই বুদ্ধিমান আর কর্মঠ হোক, একাকী দীর্ঘ ভ্রমণে বেরোলে একটা পর্যায়ে বিষণ্নতা ছেঁকে ধরে তাকে। তার ইঙ্গিতটাকে লুফে নিলাম আমরা এবং প্রস্তাব দিলাম, সে ইচ্ছে করলে যোগ দিতে পারে আমাদের সাথে। দলটা ভারী হবে আমাদের।

শুরুতে কথাবার্তায় আমাদের মধ্যে একটা দূরত্ব ছিল। কিংবা জড়তাও বলা যায় একে। কিন্তু উভয়ের আন্তরিকতার গুণে কেটে যায় এই জড়তা। এবং এলিয়াস পি. হাচেসন আমাদের দলেরই একজন হয়ে যায়। এতে অ্যামেলিয়া আর আমার বেশ লাভই হলো। হাচেসনের কল্যাণে আনন্দমুখর হয়ে উঠল আমাদের সময়। আমার আর ওর মধ্যে শেষদিকে যে ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছিল, তৃতীয় পক্ষের আগমনে অবসান ঘটল তার। যে সব ব্যাপার নিয়ে

অ্যামেলিয়া আর আমার মধ্যে মতের মিল হত না, হাচেসন আসার পর থেকে দেখলাম, ওসব ব্যাপারে চমৎকার বোঝাপড়া হয়ে যাচ্ছে আমাদের স্বামী-স্ত্রী'র। এক সময় অ্যামেলিয়া তো ঘোষণাই দিয়ে বসল, যে দারুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে ও ফিরে যাচ্ছে, ওর সব বন্ধু পরামর্শ দেবে, হানিমুনে গেলে তারা যেন এক বন্ধুকেও সাথে নিয়ে যায়।

পুরো নিউরেমবার্গ একসঙ্গে ঘুরলাম আমরা। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আসা বন্ধুটির প্রাণচাঞ্চল্য চাঙা করে তুলল আমাদের। বাকপটু হাচেসন অ্যাডভেঞ্চারের বিস্ময়কর এক ভাণ্ডার। এইটুকু জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে। লিখতে বসলে উপন্যাস হয়ে যাবে।

নিউরেমবার্গে আমাদের শেষ পরিদর্শনের জায়গা হিসাবে নির্ধারিত ছিল দ্য বার্গ। যথাসময়ে তিনজন বেরিয়ে পড়লাম শহরের পুব দিকের দেয়াল বরাবর বাইরের পথ ধরে।

দ্য বার্গ। শহরের পাহাড়ী এলাকায় জায়গাটা। উত্তর দিকে গভীর এক খাদ। নিউরেমবার্গের মানুষ একটা দিক দিয়ে সুখী যে, এখানে লুটতরাজ হয়নি কখনও। যদি সেরকম অরাজকতামূলক কিছু ঘটত, তা হলে আর এখনকার মত নিখুঁত সৌন্দর্যের অধিকারী হতে পারত না এ শহর। খাদটা দীর্ঘদিন অব্যবহৃত ছিল। তা কয়েকশো বছর তো হবেই। এখন সুন্দর চা-বাগান গড়ে উঠেছে খাদটাতে। বেড়া দেওয়া ফলের বাগানও ছড়িয়ে পড়েছে বেশ। এখানকার কিছু গাছপালা খুবই দামী। জুলাইয়ের তেজী রোদ মাথায় নিয়ে নগর দেয়ালের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে প্রায়ই আমাদের থমকে দাঁড়াতে হচ্ছিল অপার মুগ্ধতা নিয়ে। আমাদের সামনে যে দৃশ্যাবলী একের পর এক আছে, তা সত্যিই অপরূপ! বিশেষ করে সুবিশাল সমতল জুড়ে গড়ে ওঠা শহর আর গ্রামগুলো। সেগুলো আবার নীল রেখার মত পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ঠিক যেন ক্লদ লরিয়েনের আঁকা ল্যান্ডস্কেপ।

রীতিমত মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমরা। নতুন এক আনন্দে ভরে উঠল মনটা। জমির পর জমি জুড়ে সারি সারি বাড়ি। একই ধাঁচের। একের পর এক কারুকাজ করা লাল ছাদের সমাবেশ। আমাদের অল্প একটু ডান ধারেই দ্য বার্গ-এর টাওয়ারগুলো দাঁড়িয়ে। আর সেই ভীমদর্শন অটল অবিচল টর্চার টাওয়ারটাও বেশ কাছে। এটাই এ শহরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আগেও ছিল, এখনও আছে। টর্চার টাওয়ারের মূল প্রাণ হচ্ছে আয়রন ভার্জিন। অত্যাচারের জীবন্ত প্রতীক এই শাস্তি। শত শত বছর ধরে জিইয়ে আছে নিউরেমবার্গের এই আয়রন ভার্জিনের ঐতিহ্য। নাম শুনলেই নিষ্ঠুরতার একটা আতঙ্ক তাৎক্ষণিক ভাবে নাড়া দিয়ে যায় সবাইকে। একটা মানুষের পক্ষে যতটুকু হজম করা সম্ভব, ততটুকুই এই আতঙ্কের তীব্রতা। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে উদ্গ্রীব আয়রন ভার্জিনকে দেখার জন্য। এবং অবশেষে তার বাড়িতে এসে পৌঁচেছি।

চলার পথে মাঝেমধ্যে থেমে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম আমরা। যাত্রাবিরতিতে একবার খাদের প্রান্ত ঘেঁষে দাঁড়ানো দেয়ালের উপর দিয়ে তাকালাম নীচের দিকে। বাগানটা আমাদের কাছ থেকে পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুট নীচে। গনগনে সূর্যের আলো জ্বলন্ত চুলোর মত তাপ ছড়াচ্ছে বাগানটাতে। ধূসর এবং ভারী অসম্ভব উঁচু দেয়ালটি। ডান আর বাঁ দিকে দুটি বুরুজের মাঝে হারিয়ে গেছে। নীচে বিলীন হয়েছে ঢালু পার্শ্বদেশে। গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে প্রায় ঢেকে আছে দেয়ালটা। এরই মাঝ দিয়ে আবার দেখা যাচ্ছে উঁচু উঁচু দালানগুলো, সেগুলোর গুরুগম্ভীর সৌন্দর্যকে ধরে রেখেছে দীর্ঘ সময়। এ মুহূর্তে গরমটাও যেমন পড়েছে, তেমনি আলিস্যিতেও পেয়ে বসেছে আমাদের। প্রচুর সময় আমাদের হাতে। এবং সময়টা হেলায় ফেলায় কাটাচ্ছি। ঝুঁকে আছি দেয়ালের উপর।

ঠিক আমাদের নীচেই–সুন্দর একটি দৃশ্য। বিশাল এক কালো

বেড়াল লম্বা হয়ে শুয়ে আছে রোদে গা পেতে। তার চারদিকে তিড়িংবিড়িং করে নেচে বেড়াচ্ছে ছোট্ট এক বেড়াল ছানা। এটাও কালো। অর্থাৎ, মা আর তার দুষ্টু খোকা আমাদের মতই অলসভাবে সময় কাটাচ্ছে। ছানাটিকে খেলায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য লেজ নাড়ছে মা। আর যখন ওটা একদম মায়ের কাছে চলে আসছে, তখন পা দিয়ে ছানাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে মা, যাতে ছানাটি আবার একইভাবে কাছে আসে। দেয়ালের একদম কাছ ঘেঁষেই রয়েছে বেড়াল আর তার ছানাটি। তাদের কাণ্ড দেখে এলিয়াস পি. হাচেসনের মাথায়ও দুষ্টু বুদ্ধি গজাল। পথ থেকে ছোট একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিল সে।

'দেখো!' বলল সে। 'এই পাথরটা ঠিক আমি বেড়ালছানার সামনে ফেলব। মা আর বাচ্চা দুটোই বেশ চমকে উঠবে। অবাক হয়ে ভাববে—আরে, এটা আবার এল কোত্থেকে?'

'তবে খুব সাবধান,' বলল আমার স্ত্রী। 'সুন্দর ওই বেড়ালছানার মাথায়ও কিন্তু লাগতে পারে পাথর!'

'আরে, না, ম্যাডাম,' বলল এলিয়াস। 'অত কাঁচা ভাববেন না আমাকে! অত্যন্ত সতর্ক লোক আমি। দেখবেন, ঈশ্বরের দয়ায় সামান্য ভড়কে দেয়া ছাড়া একটুও আঘাত করব না ওই বেড়ালছানাটিকে। এ ব্যাপারে আপনি আপনার রঙিন মোজা জোড়া দিয়ে বাজি ধরতে পারেন। দেখুন, এই যে পাথরের টুকরোটা ফেলছি আমি। এটা আমি ওদের যথেষ্ট দূর দিয়ে ফেলব, কাজেই আঘাত করার প্রশ্নই ওঠে না। হে ঈশ্বর, আঘাত যেন না লাগে। ছুঁ মন্তর ছুঁ!'

এই বলে দেয়ালের উপর ঝুঁকে নীচের দিকে সজোরে পাথরটা ছুঁড়ে মারল সে। জানি না এই ঢিলের ভিতর অজানা কী আকর্ষণ শক্তি ছিল, যা ছোট্ট একটি ব্যাপারকে মুহূর্তেই গুরুতর করে তুলল। খুব সম্ভব দেয়ালটি খাড়া না হয়ে নীচের দিকে খানিকটা ঢালু হয়ে যাওয়ায় নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি

হাচেসন। ওই ঢালু অংশটির উপর থেকে দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় পাথরটা ওখানে লেগে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। তা যাই হোক, গরম বাতাস ভেদ করে নীচ থেকে থেকে যে শব্দটা এল, তা মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়। পাথরটা সোজা গিয়ে আঘাত হেনেছে বেড়ালছানাটির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফেটে চৌচির। ছোট্ট মগজটা ছড়িয়ে ছত্রখান।

কালো বেড়ালটি চকিতে উপরের দিকে তাকাল। ওটার চোখ দুটি সবুজ আগুনের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল আমাদের সামনে। মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি স্থির হলো এলিয়াস পি. হাচেসনের উপর। পরমুহূর্তে চোখ দুটি নামিয়ে নিল ওটা। স্থির হলো ছানাটির উপর। মৃত্যু-যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ওটার খুদে শরীর। মাথায় ক্ষতের হাঁ থেকে বয়ে চলেছে রক্তের সরু নহর। ঠিক একটা মানুষের মতই চাপা আর্তনাদ ছেড়ে ছানাটির উপর ঝুঁকে পড়ল বেড়ালটি। গোঙাতে গোঙাতে চাটতে লাগল ছানার ক্ষত। সহসা যেন সে টের পেয়ে গেল, তার বুকের ধন আর বেঁচে নেই। এবং আবার চোখ তুলে তাকাল আমাদের দিকে। দৃষ্টিতে নিখাদ ঘৃণা। জীবনে কোনদিন ভুলব না এই দৃশ্য। প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করছে একজোড়া সবুজ চোখে। রক্তমাখা মুখ আর গোঁফের ফাঁক দিয়ে ঝিলিক দিচ্ছে সুতীক্ষ্ণ সাদা দাঁত।

দাঁত খিঁচিয়ে বিদ্বেষ প্রকাশ করতে লাগল কালো বেড়ালটি। প্রতিটি থাবা থেকে বেরিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ নখর। সহসা বেড়ালটি সবেগে ছুটে এল দেয়ালের দিকে। উপরের দিকে ঝেড়ে দিল লাফ, যেন আমাদের পাকড়াও করতে চায় ওটা। কিন্তু লাভ হলো না কোন। বরং উল্টো পড়ে গেল বেড়ালটি। পরমুহূর্তে আরেক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করল আক্রোশে অন্ধ বেড়ালটি। সোজা মৃত ছানাটির উপর পড়ে গিয়েছিল ওটা। যখন উঠে দাঁড়াল, পিঠের রোমগুলো মগজ আর রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।

এদিকে বেড়ালের কাণ্ড দেখে একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে

অ্যামেলিয়া। ওকে দেয়াল থেকে সরিয়ে আনলাম আমি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাছগুলোর ছায়ায় একটা বসার জায়গায় নিয়ে গেলাম। কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেল ও। এবার ফিরে গেলাম আবার হাচেসনের কাছে। একদম নট নড়নচড়ন হয়ে দেয়ালের উপর ঝুঁকে আছে সে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিদ্বেষী বেড়ালটির দিকে।

পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই হাচেসন বলল:

'জানেন, ঠিক এরকম চরম বিদ্বেষ দেখেছিলাম এক অ্যাপাচি মেয়ের মাঝে। স্প্লিন্টার্স নামে একজনের মা-কে পুড়িয়ে মেরেছিল অ্যাপাচিরা। লোকটা হাফ-ব্রীড। তো, এই স্প্লিন্টার্স এক রেইড থেকে চুরি করল ওই অ্যাপাচি মেয়ের শিশুকে। মেয়েটি মনের ভেতর গেঁথে রাখল স্প্লিন্টার্সের চেহারা। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে মেয়েটি ধাওয়া করল স্প্লিন্টার্সকে। তারপর যখন খোঁজ পেল, অ্যাপাচিরা গিয়ে পাকড়াও করল তাকে। তুলে দিল ওই বিদ্বেষিণীর হাতে। সবাই বলে, সাদা বা কালো যেই হোক না কেন, এর আগে কাউকে এমন নির্মম শাস্তি ভোগ করে মরতে হয়নি অ্যাপাচিদের হাতে। ওই বিদ্বেষিণীকে শুধু একবারই আমি মৃদু হাসতে দেখেছি, যখন তাকে শেষ করে দিই। আর আমি ওই ক্যাম্পে যখন পৌঁছি, তখন স্প্লিন্টার্সেরও শেষ সময় হাজির। বিশ্বাস করুন, স্প্লিন্টার্সকে যে নরক যন্ত্রণা দেয়া হয়, তার চিহ্ন স্বরূপ তার গা থেকে খসে পড়া এক টুকরো চামড়া রেখে দিয়েছি আমি। আমার সাথে পকেট বুকের ভেতর আছে ওটা!' কোটের বুক পকেটে চাপড় মেরে দেখাল সে।

হাচেসন যখন আমাকে এসব বলছে, তখন কিন্তু থেমে নেই প্রতিশোধপরায়ণ বেড়ালটি। দেয়াল টপকে উপরে ওঠার জন্য উন্মত্তের মত লাফিয়ে চলেছে ওটা। প্রথমে কিছুটা পিছিয়ে যাচ্ছে, তারপর সবেগে ছুটে এসে দিচ্ছে লাফ। একদম সর্বশক্তিতে। মাঝেমধ্যে অবিশ্বাস্য রকমের উচ্চতায় উঠে আসছে ওটা।

প্রতিবারই দড়াম করে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মালুম করছে না। পড়েই আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ছুটে আসছে আরেকবার লাফ দিতে। আর ক্রমেই যেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ওটার লম্ফ। হাচেসন মানুষটা দয়ালু। আমার স্ত্রী এবং আমি দু'জনেই তার এই গুণটির ছোটখাট প্রমাণ পেয়েছি জীবজন্তু এবং মানুষের প্রতি আচরণ দেখে। বেড়ালটির বেপরোয়া ভাব দেখে উদ্বিগ্ন মনে হলো তাকে।

'মনে হচ্ছে,' বলল হাচেসন। 'মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে বেচারীর। আহ, বেচারী, এটা তো নিছকই একটা দুর্ঘটনা! কিন্তু ব্যাপারটা ওকে বোঝাই কী করে? ওর বাচ্চাটিকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। বলুন, কর্নেল, এরকম অঘটন আমি চেয়েছিলাম! কেমন অপদার্থ লোক আমি–সামান্য এক বেড়ালের সাথে খেলতে পারি না! বলুন, কর্নেল, বলুন!' এটা একটা ভাল দিক যে, স্বচ্ছন্দে আমার কাছে খেদ প্রকাশ করতে পারছে সে। 'আশা করি, আপনার স্ত্রী আমার প্রতি কোন রাগ পুষে রাখবেন না। দেখলেনই তো, এটা স্রেফ একটা দুর্ঘটনা। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটা করিনি আমি।'

অ্যামেলিয়ার কাছে এসে করজোড়ে মাফ চাইল হাচেসন। অ্যামেলিয়া ওর স্বভাবসুলভ দয়া দেখাতে কার্পণ্য করল না। সঙ্গে সঙ্গে হাচেসনকে নিশ্চিত করল, ব্যাপারটা যে নিছক দুর্ঘটনা–এটা ভাল করেই জানে ও।

আমরা সবাই আবার ফিরে গেলাম দেয়ালটার কাছে। উঁকি দিলাম নীচে।

হাচেসনকে দেখতে না পেয়ে পেছনে ফিরে গিয়ে এমনভাবে বসে আছে বেড়ালটি, যেন আবার লাফ দেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব। এবং হাচেসনকে দেখা মাত্র লাফ দিল ওটা। অন্ধ একটা অযৌক্তিক আক্রোশ। অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এটাই এখন একমাত্র বাস্তব। ভয়ঙ্কর বাস্তব! বেড়ালটা এখন আর

আগের মত তেড়ে আসছে না দেয়ালের দিকে। ওখানে বসে বসেই আক্রোশ ঝাড়ছে। যেন ঘৃণা আর বিদ্বেষ দুটো পাখা ধার দিয়েছে বেড়ালটিকে। আর সে পাখা দুটোতে ভর করে হাচেসনের উপর ক্রমাগত ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে ওটা।

মেয়েদের মন এমনিতেই নরম, বেড়ালের কাণ্ড দেখে অ্যামেলিয়া বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। হাচেসনকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'খুব সাবধানে থাকতে হবে আপনাকে। বাগে পেলে আপনাকে মেরে ফেলতে দ্বিধা করবে না ওই জানোয়ার। খুনের নেশায় জ্বলছে ওটার চোখ দুটো!'

হো হো করে হেসে উঠল হাচেসন। বলল, 'মাফ করবেন, ম্যাডাম। আমি হাসলাম ঠিকই কিন্তু আপনাকে হাসাতে পারছি না। কল্পনা করুন তো একবার, যে লোক গ্রিজলি ভালুক মেরেছে, ইন্ডিয়ানদের সাথে ফাইট করেছে, একটা সামান্য বেড়ালের থাবায় মারা পড়ার ভয়ে তার সাবধান হওয়া কি সাজে!'

হাচেসনের হাসি শুনে বেড়ালটির আচরণ যেন বদলে গেল সহসা। আগের মত আর দেয়ালের দিকে তেড়ে আসার কোন চেষ্টা করল না বা লাফ দিল না। শান্তভাবে ফিরে গেল নিজের মৃত বাচ্চাটির কাছে। বাচ্চাটির গা চেটে চেটে এমনভাবে আদর করতে লাগল, যেন এখনও বেঁচে আছে ওটা।

'সত্যিকারের পৌরুষ থাকলে যা হয় আর কী,' বললাম হাচেসনকে। 'চূড়ান্ত রকমের আক্রোশ নিয়েও জন্তুটা ঠিকই চিনতে পেরেছে ওস্তাদ লোকের কণ্ঠ, এবং হাল ছেড়ে দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে!'

'হ্যাঁ, করেছে—আমার দেখা সেই অ্যাপাচি বিদ্বেষিণীর মত!' শুধু এটুকু মন্তব্যই বেরোল এলিয়াস পি. হাচেসনের মুখ থেকে। আবার রওনা হলাম আমরা। নগর দেয়াল ধরে এগোতে লাগলাম ধীরে ধীরে। চলার পথে যখনই মাঝেমধ্যে দেয়ালের উপর দিয়ে উঁকি দিলাম, দেখি—আসছে বেড়ালটি। অনুসরণ করছে

আমাদেরকে।

প্রথম দিকে অনুসরণের ধরনটা ছিল এমন–কিছুদূর এসে আবার এক ছুটে মৃত ছানাটির কাছে চলে যেত ওটা। তারপর দূরত্ব যখন বেড়ে চলল, ওটা ছানাটিকে মুখে তুলে নিল একসময়। এরপর আর ফেরাফিরি নেই, একটানা অনুসরণ। খানিক পরে ছানাটি উধাও হয়ে গেল তার মুখ থেকে। নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। এখন শুধু একাকী পিছু নিয়েছে আমাদের।

বেড়ালটির জেদ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল অ্যামেলিয়া। বার বার হাচেসনকে সতর্ক করে দিতে লাগল। কিন্তু আমেরিকানটা প্রতিবারই হেসে উড়িয়ে দিল অ্যামেলিয়ার কথা। শেষে যখন দেখল, অ্যামেলিয়া সত্যিই ভীষণ শঙ্কিত, বলল, 'আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি, ম্যাডাম, ওই বেড়াল নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনই কারণ নেই আপনার। এই যে, দেখুন, ওটাকে মেরামত করার জিনিস আছে আমার কাছে!' কোমরের পেছনে পিস্তলের খাপে চাপড় মারল সে। 'সেরকম বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালে, গুলি করব ওটাকে। যদিও একজন আমেরিকাবাসী হিসেবে এখানে অস্ত্র বহন করা আমার জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ। আইনের প্যাঁচে ফাঁসিয়ে দিতে পারে পুলিশ!'

এভাবে কথা বলতে বলতে হাচেসন আবার যেই ঝুঁকেছে দেয়ালের উপর, দেখে–দিব্যি আছে বেড়ালটি, একদম তার দিকে তাকিয়ে। হাচেসনের চোখে চোখ পড়ায় 'গরর' করে বিদ্বেষ ঝাড়ল ওটা, পরমুহূর্তে গা ঢাকা দিল লম্বা লম্বা এক ধরনের ফুলগাছের ঝোপে। হাচেসন বলে চলল, 'এখন বেড়ালটির মাথায় শুভবুদ্ধির উদয় হলেই ভাল! মনে হচ্ছে, বেড়ালটির সাথে এটাই আমাদের শেষ দেখা! আমি বাজি ধরে বলতে পারি, বেড়ালটি এখন ফিরে যাবে মৃত বাচ্চাটির কাছে। নিজস্ব পদ্ধতিতে পালন করবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।'

অ্যামেলিয়া কোন কথা বলল না। পাছে হাচেসন বেড়ালটিকে সত্যিই নির্দয়ভাবে গুলি করে বসে, এ ভয়েই হয়তোবা তাকে ঘাঁটাল না সে। কাঠের ছোট্ট সেতু পেরিয়ে গেটওয়ের দিকে এগোলাম আমরা। ওখান থেকে নুড়ি বিছানো রাস্তা খাড়া চলে গেছে দ্য বার্গ আর পঞ্চভুজ আকৃতির টর্চার টাওয়ারের দিকে। সেতু পেরোবার সময় নীচে আবার বেড়ালটিকে দেখা গেল। আমাদের দেখা মাত্র আক্রোশ ফিরে এল ওটার, এবং খাড়া দেয়াল পেরোবার জন্য উন্মত্তের মত লাফালাফি শুরু করল আগের মত। হাচেসন ওটার কাণ্ড দেখে হেসে বলল, 'বিদায়, বুড়ো খুকি। তোমার মনটাকে ক্ষত-বিক্ষত করার জন্যে আমি দুঃখিত। তবে এক সময় এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারবে তুমি। বিদায়!'

লম্বা, অনুজ্জ্বল খিলান ঢাকা পথ পেরিয়ে দ্য বার্গের প্রবেশ পথে এসে গেলাম আমরা।

অত্যন্ত চমৎকার একটি পুরাকীর্তি দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে বেরিয়ে এলাম তিনজন। চল্লিশ বছর আগে পুনরুদ্ধার করা এই পুরাকীর্তি গথিক স্থাপত্যের নিদর্শন। কোন যত্ন-আত্তি না থাকায় আগের সেই জৌলুস আর নেই। অথচ একসময় এটা ছিল ঝকমকে সাদা। দ্য বার্গের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এতই বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম, সকালের দুঃখজনক ঘটনাটি কথা ভুলেই গেলাম একরকম। দেখার মত অনেক কিছুই আছে এখানে। একটি লেবু গাছ আছে প্রায় নয়শো বছর আগের। বিশাল ওটার গুঁড়ি। তাতে আবার কালের সাক্ষী হয়ে আছে গ্রন্থিল জট। পাহাড়ের ঠিক মাঝ বরাবর রয়েছে গভীর এক কূপ। পুরানো দিনের বন্দীদের দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কূপটা। নগর দেয়াল থেকে এই সুন্দর দৃশ্য দেখার কথা এর আগে শুনেছিলাম আমরা, এবার প্রাণ ভরে উপভোগ করতে লাগলাম। প্রায় মিনিট পনেরো এখানেই কাটিয়ে দিলাম তিনজন। আর দ্য বার্গের এই বিচিত্র সৌন্দর্য আমাদের মন থেকে পুরোপুরি মুছে দিল

বেড়ালছানাটির অপমৃত্যুর ঘটনা।

এরপর টর্চার টাওয়ারে ঢুকলাম তিনজন। এই সকালে আমরাই শুধু এর দর্শনার্থী–অন্তত দেখভালের কাজে নিয়োজিত বুড়ো লোকটার ভাষ্য অনুযায়ী তাই ; ফলে গোটা জায়গাটাই যেন এক মিনিটের মধ্যে আমাদের দখলে চলে এল। আর যেহেতু এমুহূর্তে আমরাই শুধু দর্শনার্থী, কাজেই অন্যান্য যে-কোন সময়ের চেয়ে এখনকার পরিদর্শন আমাদের জন্য একটু সহজতর হয়ে উঠেছে।

টর্চার টাওয়ার সত্যিকার অর্থেই একটি ভয়ঙ্কর জায়গা। এমনকী এখনও, এই যে হাজার হাজার দর্শনার্থীর পা পড়ছে এখানে, বয়ে যাচ্ছে উচ্ছল প্রাণের বন্যা, এরপরেও চূড়ান্ত রকমের একটা ভয় লুকিয়ে আছে জায়গাটার মধ্যে। অন্তত এমুহূর্তে পরিবেশটা ঠিক তাই। যুগ যুগ ধরে জমে থাকা ধুলোর স্তর যেন গ্যাঁট হয়ে বসেছে জায়গাটায়। প্রগাঢ় অন্ধকারের সাথে আতঙ্কের সেই স্মৃতিগুলো এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়।

নীচের কুঠুরিতে আছি আমরা। এটার স্বাভাবিক যা চেহারা, তাতেই হিম হয়ে আসে বুক, আর যখন শাস্তির জন্য ব্যবহৃত হত, তখন না জানি কী করালদর্শন ছিল এটা! পুরো প্রকোষ্ঠ জুড়ে এমন অন্ধকার, যেন মুঠি করলে ধরা যাবে নিরেট কালো পিণ্ড। দরজা দিয়ে গরম রোদ আসছে ঠিকই, কিন্তু মালুম হচ্ছে না। কুঠুরির দেয়ালগুলোর ব্যাপক পুরুত্ব শুষে নিচ্ছে যেন সব আলো। এরপরেও দালানের নিখুঁত কারুকাজ নজর এড়াল না। অল্প একটু খুঁত যা আছে, রাজমিস্ত্রীরা কাজ শেষে তাঁদের মাচান নামানোর পর টুকটাক যা মেরামত করেছে–তাই। দেয়ালের এখানে ওখানে ধুলো জমে থাকা কালো কালো ছোপ। যদি দেয়ালগুলো কথা বলতে পারত, তা হলে ওগুলো রোমন্থন করতে পারত ভয় আর যন্ত্রণার ভয়াবহ সেই স্মৃতি।

আমরা এবার হৃষ্টচিত্তে কাঠের সিঁড়িটার দিকে এগোলাম। একগাদা ধুলো জমে আছে সিঁড়িটায়। তত্ত্বাবধায়ক লোকটা বাইরের একটা দরজা খোলা রাখল খানিকটা আলো আসার জন্য। দেয়ালের এক জায়গায় একটা বাতিদানে মোম জ্বলছে। কিন্তু ওটার অপর্যাপ্ত আলো আঁধার দূর করার বদলে আরও ভূতুড়ে করে তুলেছে পরিবেশ। হাঁটতে হাঁটতে যখন আমরা একটা ট্র্যাপ ডোর দিয়ে উপরে চলে এলাম, অ্যামেলিয়া আমাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরল, পরিষ্কার শুনতে পেলাম ওর হৃৎকম্পন। নীচ থেকেই জানালার একটা খাপছাড়া ব্যাপার লক্ষ করে আসছি। মধ্যযুগীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থায় প্রাচীন দুর্গগুলোতে যেমন সরু ধাঁচের ছোট ছোট জানালা দেখা যায়, ঠিক তেমনি এই টাওয়ারের জানালাগুলো আকারে বেশ ছোট। তাও হাতে গোনা অল্প ক'টি রয়েছে। জানালা না বলে বরং সরু ক'টি আলো আসার পথ বললেই যেন ভাল মানায়। আর জানালাগুলো দেয়ালের এত উঁচুতে–ওগুলো ভেদ করে আকাশ দেখার কোন উপায় নেই। দেয়ালের তাকে এবং এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে জল্লাদের একগাদা তলোয়ার। প্রতিটি তলোয়ার এত ভারি, দু'হাত ছাড়া চালানোর যো নেই। আর বেশ ধারাল ওগুলো। কাছেই কয়েকটি শিরচ্ছেদের ব্লক, যেখানে ভিক্টিমদের ঘাড়গুলো পেতে দ্বিখণ্ডিত করা হত। ব্লকগুলোর কাঠের গায়ে গভীর কাটা দাগ ফুটে আছে। তলোয়ারের ধারাল ফলা সাজাপ্রাপ্ত অভাগাদের মাংস ভেদ করে এসে লাগার ফলেই দাগগুলোর সৃষ্টি। এ ছাড়া গোটা কুঠুরি জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শাস্তিদানের আরও হরেক রকমের উপকরণ।

এই কুঠুরিতে আতঙ্ক সৃষ্টির যত রকমের উপকরণ রয়েছে, এগুলোর শিরোমণি হচ্ছে আয়রন ভার্জিন। যন্ত্রটি ঘরের প্রায় মাঝখানে। এটা কর্কশ আদলে তৈরি একটি নারীমূর্তি। অনেকটা ঘণ্টার মত গড়ন। তুলনাটা আরেকটু জোরাল হয় ছোটদের

খেলনা পুতুল মিসেস নোয়া'র সাথে দাঁড় করালে। তবে নোয়ার মত ক্ষীণ কটি এবং সুগঠিত নিতম্ব নেই এটার। আসলে এটা যে একটা নারীমূর্তি, চিনে নেওয়া বড় কষ্টের ব্যাপার। মরচে ধরা যন্ত্রটার উপর ধুলো জমে আছে একগাদা। মূর্তিটির যেখানে কোমর থাকার কথা, সেখানে একটা রিঙের সাথে দড়ি বাঁধা। আর দড়িটা একটা কপিকলের মাধ্যমে চলে গেছে একটা কাঠের পিলারে। টাওয়ারের তত্ত্বাবধায়ক লোকটি দড়ি টেনে দেখাল, আয়রন ভার্জিনের সামনের একটা অংশ কব্জা লাগানো ডালার মত খোলা যায়। পরে দেখলাম, যন্ত্রটির ভিতরটা নিরেট নয়। একটা মানুষ ঢোকা যাবে–এমন পরিসর নিয়ে তৈরি। আর ডালাও একখান বটে। দড়ি টেনে ওটা তুলতে গিয়ে বারোটা বেজে গেল তত্ত্বাবধায়কের। কপিকলের সুবিধে থাকা সত্ত্বেও সর্বশক্তি খাটাতে হলো তাকে। ডালাটি ভারি রাখা হয়েছে বিশেষ কারণে। যখন দড়িতে ঢিল দেওয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে ওটা নিজের ভারেই নেমে আসবে নীচে।

যন্ত্রটার ভিতর মৌচাকের মত বাসা বেঁধেছে মরচে। সময়ের প্রবাহে গভীরভাবে খেয়ে দিয়েছে দেয়ালগুলো। মরচের নিঠুর দাগগুলো ফুটে আছে প্রকটভাবে।

আমরা যখন যন্ত্রের ভিতরটা ভাল করে দেখার জন্য দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম, এটার নারকীয় উদ্দেশ্যটা পুরোপুরি ধরা পড়ল আমাদের চোখে। কয়েকটি বড়বড় লোহার কাঁটা রয়েছে যন্ত্রটার ডালায়। পুরু কাঁটাগুলো গোড়া থেকে বর্গাকার হয়ে উঠে এসেছে। তারপর ক্রমশ সরু হতে হতে একদম ছুঁচাল হয়ে থেমেছে ডগায়। কাঁটাগুলো ডালাতে এমনভাবে সাজানো, ভিক্টিমকে ভিতরে রেখে ডালাটা ছেড়ে দিলে উপরের কাঁটা দুটো সরাসরি চোখে গিয়ে বিঁধবে। এরপর যে কাঁটাগুলো রয়েছে, এগুলো ছেঁদা করবে হৃৎপিণ্ড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দুর্বলচিত্ত অ্যামেলিয়ার জন্য দৃশ্যটা এতই অসহ্য হয়ে দাঁড়াল যে

সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা গেল বেচারি।

অ্যামেলিয়াকে পাঁজাকোলা করে নীচে নিয়ে গেলাম। বাইরে এনে শুইয়ে দিলাম একটা বেঞ্চিতে। রাখলাম ওভাবেই জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত। পরে অবশ্যি জানা গেছে অ্যামেলিয়ার এই তাৎক্ষণিক ভাবে মূর্ছা যাওয়ার কারণ। আমার বড় ছেলে জন্ম নেয় বুকে বিকট এক জন্মদাগ নিয়ে। বাড়ির সবার ধারণা, এটা নিউরেমবার্গ ভার্জিনের অশুভ প্রভাবেই হয়েছে। অ্যামেলিয়া যখন মূর্ছা যায়, তখুনি ওর দেহাভ্যন্তরে ঢুকে যায় এই প্রভাব।

আমরা সবাই যখন আবার সেই কুঠুরিতে এলাম, হাচেসন তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আয়রন ভার্জিনের মুখোমুখি। এবার সে নিঠুর যন্ত্রটা নিয়ে তার দার্শনিক চিন্তাভাবনা আমাদের কাছে ঝেড়ে দিল একটা ভূমিকার মাধ্যমে।

'ম্যাডাম যখন মূর্ছার ধকলটা কাটিয়ে উঠছিলেন, তখন কিছু একটা খেলে গেছে আমার মাথায়। আসলে সত্যিকারের রোমাঞ্চ থেকে অনেকটা দূরে আছি আমরা। আমাদের মত একজন মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্যে ইন্ডিয়ানদের যে তৎপরতা, আইন-কানুনের নামে মধ্যযুগীয় বর্বরতার তুলনায় ওসব কিছুই নয়। স্প্লিন্টার্স তবু নিখুঁতভাবে ধোঁকা দিয়েছিল ওই অ্যাপাচি বিদ্বেষিণীকে, কিন্তু এখানে এই লৌহকুমারীকে ফাঁকি দেয়ার বিন্দুমাত্র যো নেই। এদের অত্যাচারের অধ্যায় শেষ হয়েছে সেই কতকাল আগে, অথচ এখনও এখানকার বাতাসকে ধারাল করে রেখেছে মরচে-পড়া এই লোহার কাঁটাগুলো। আমাদের দেশে ইন্ডিয়ানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্যে যে বিভাগটি রয়েছে, ওরা যদি এখান থেকে অল্প কিছু নমুনা সংগ্রহ করতে পারে, তা হলে বুঝতে পারবে এই বর্বরতার তুলনায় ইন্ডিয়ানরা কতটা নস্যি। তা ছাড়া অ্যাপাচিরাও এসব দেখে বুঝতে পারবে, বর্বরতার কত প্রাচীন ঐতিহ্যকে চূড়ান্তভাবে ধারণ করে আছে তারা। তা যাই হোক, আমি এখন এক মিনিটের জন্যে ঢুকব এই

বাক্সে। স্রেফ মজা আর কী। দেখব কেমন লাগে!'

'হায়, হায়, না-না!' আঁতকে উঠল অ্যামেলিয়া। 'খুবই বিপজ্জনক এটা!'

'দেখুন, ম্যাডাম, অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে কোন কিছুই অতটা বিপজ্জনক নয়। আপনি জানেন না, কিছু কিম্ভূত জায়গায় গিয়ে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। মন্টানা টেরিটোরিতে একবার যখন আগুন লাগল প্রেয়ারী অঞ্চলে—ওরে-ব্বাস, সে কী ধাওয়া খেলাম আগুনের! প্রাণ বাঁচাতে কী করেছি তখন, জানেন? পুরো একটি রাত কাটিয়েছি এক মৃত ঘোড়ার ভিতর। আরেকবার খেলাম কোমাঞ্চিদের ধাওয়া। উপায়ান্তর না দেখে শেষে ঢুকলাম এক মৃত মোষের পেটে। ওই মোষের পেটেই ঘুমোলাম এক রাত। আরও শুনুন। নিউ মেক্সিকোতে একবার বিলি ব্রঙ্কো সোনার খনিতে কাজ করার সময় দু'দুটো দিন আটকা পড়ে ছিলাম সুড়ঙ্গে। আরেকবার বাফেলো ব্রিজের ফাউন্ডেশন গড়ার সময় পানিতে আমরা আটকা পড়লাম চারজন। একটা দিনের চারভাগের তিনভাগ সময় ছিলাম ওখানে। এই যে এতগুলো বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কখনও ভড়কে যাইনি আমি। কাজেই এখনও পিছিয়ে যাব না!'

বেশ বুঝতে পারলাম, পরীক্ষাটা না করে ছাড়বে না সে। তাই বললাম, 'ঠিক আছে, শীঘ্রি তা হলে শুরু করে দিন আপনার এক্সপেরিমেন্ট।'

'হ্যাঁ, করছি,' বলল সে। 'কিন্তু আমার প্রস্তুতি এখনও খানিকটা বাকি রয়ে গেছে। যন্ত্রটার ভেতরে যখন ঢুকবই, একটু কড়া ভাবেই ঢুকি না কেন। তত্ত্বাবধায়ক আমাকে একেবারে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলুক। তারপর ঠিক সত্যিকারের বন্দীর মত ঢুকে যাই ভেতরে। কী বলেন?'

কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক লোকটা হাচেসনকে বাঁধতে রাজি হলো না প্রথমে। শেষে চাপাচাপিতে কাজ হলো। তার উপর হাচেসন

তাকে একটি সোনার মোহর দিয়ে কিছু তোষামুদে মিষ্টি বুলি ঝাড়ল, ব্যস, অমনি কাত হয়ে গেল তত্ত্বাবধায়ক।

কোত্থেকে পুরানো কিছু দড়ি জোগাড় করে হাচেসনকে বাঁধতে শুরু করল বুড়ো লোকটা। উপরের অংশ বাঁধা শেষ হলে হাচেসন বলল, 'এবার একটু থামুন দয়া করে। এখুনি পা বাঁধলে আমাকে যন্ত্রটায় ঢোকাবেন কী করে? এত বড় দেহ তো বয়ে নিতে পারবেন না। এরচে' আমি আগে ভেতরে ঢুকি, তারপর নীচের অংশ বাঁধুন ভাল করে।'

যন্ত্রটার ভিতর ঢুকে গেল হাচেসন। যন্ত্রটা যেন তার দেহের মাপেই তৈরি। একেবারে খাপে খাপে পূরণ হয়েছে জায়গা। এদিকে দু'চোখে রাজ্যের ভয় নিয়ে হাচেসনের কাণ্ডকারখানা দেখছে অ্যামেলিয়া। কিন্তু মুখে কিছু বলছে না। বোঝাই যাচ্ছে, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ওর।

বুড়ো এবার পা বাঁধার কাজ শেষ করল হাচেসনের। আমাদের আমেরিকান বন্ধুটি সত্যিই এখন অসহায়। এবং তার স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণের কাজও শেষ। ভাবেসাবে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছে হাচেসন। তার ঠোঁটে স্বভাবসুলভ মৃদু বাঁকা হাসি। এবং সে সত্যি সত্যি ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে, এখানকার ঈভকে গড়া হয়েছিল কোন বামনের পাঁজর থেকে। বাপরে, এই যন্ত্রের যা সাইজ–বাড়তি একটুও জায়গা নেই ভেতরে! একদম হাঁসফাঁস অবস্থা! আর আমাদের ওখানে, ইডাহো টেরিটোরিতে যে কফিনগুলো গড়া হয়, সেগুলো এটার চেয়ে কত বড়! হ্যাঁ, এবার–বুড়ো বাবা, ডালাটা খুব আস্তে আস্তে নামিয়ে আনুন। দেখি, কাঁটার ঘা খাওয়ার আগে সেই বন্দীদের মনের অবস্থা কী হত!'

'মা গো–না! না! না!' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত চিৎকার দিয়ে উঠল অ্যামেলিয়া। 'ভয়ঙ্কর আমি কিছুতেই এ দৃশ্য সহ্য করতে পারব না! কিছুতেই না! কিছুতেই না!'

কিন্তু আমেরিকানটি দিব্যি অটল।

'বলুন তো, কর্নেল,' আমাকে বলল সে। 'ম্যাডাম কেন এই ব্যাপারটাকে আমাদের প্রমোদ ভ্রমণের একটা অংশ হিসেবে নিচ্ছেন না? আমি তার মনে কোন দুঃখ দিতে চাই না। কিন্তু আমার কথা একবার ভেবে দেখুন। সুদীর্ঘ আট হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ঘুরতে এসেছি এখানে। এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা নেয়ার সুযোগ হাতছাড়া করা সম্ভব আমার পক্ষে? খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হবে এই কৌতুকপর্ব। তারপর আমরা একসঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে খুব মজা করব, আর হাসব।'

বুড়ো তত্ত্বাবধায়ক এবার লোহার ডালার পিঠে লাগানো দড়িটা ঢিল দিতে লাগল ইঞ্চি-ইঞ্চি করে। অ্যামেলিয়া আমার এক বাহু আঁকড়ে ধরেছিল প্রবলভাবে। ভয়ে এবার কাঁপতে শুরু করল ও। এদিকে লোহার কাঁটাগুলো প্রথমবার নড়ে উঠতেই চোখমুখ পরিষ্কার উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাচেসনের। আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বলল, 'নিউ ইয়র্ক ছেড়ে আসার আগে যে জম্পেশ ভোজ হয়েছিল, আমি মনে করি, এই মুহূর্তের উত্তেজনার কাছে ওই আনন্দটুকু কিছুই নয়। ওটা ছিল বারে বসে এক ফরাসী নাবিকের সাথে গণ্ডেপিণ্ডে পানভোজন। বড় জোর পিকনিক বলা যায় ওটাকে। এরকম একটি নীরস জায়গায়, যেখানে কোন বার নেই, ইন্ডিয়ানদের তাড়া নেই, লোকজনের ছুটোছুটি নেই—সেখানে এরকম একটি জীবন্ত প্রদর্শনীর প্রকৃত আনন্দ উপভোগ—উফ, তুলনা হয় না এর!'

'আস্তে, বুড়ো বাবা!' তত্ত্বাবধায়ককে বলল হাচেসন। 'এত শীঘ্রি খেল খতম করবেন না! আমি চাই, টাকার বিনিময়ে মজার একটা খেলা উপভোগ করতে—আর করছিও তাই!'

এই মৃত্যুপুরীতে আগে যারা এরকম বন্দীদের প্রাণ সংহারের কাজ সারত, তাদের কিছু রক্ত অবশ্যই আছে তত্ত্বাবধায়কের শরীরে। তা নইলে এরকম ঠাণ্ডা মাথায় যন্ত্রণাদায়ক ধীর গতিতে

দড়ি ঢিল দিতে পারত না। যেখানে এতক্ষণে কয়েক ইঞ্চি নেমে আসার কথা ডালাটির, সেখানে এর অর্ধেকও নেমে এসেছে কিনা সন্দেহ। ইতিমধ্যে উত্তেজনার ধকল কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে অ্যামেলিয়া। আমার বাহুতে ওর হাতের বজ্রআঁটুনি শিথিল হয়ে এসেছে। তবে ঠোঁট জোড়া বড় সাদা দেখাচ্ছে ওর। কোথাও ওকে শোয়াতে পারলে ভাল হত। চকিতে ঘরের চারদিকে সেরকম একটা জায়গা খুঁজে বেড়ালাম। নেই। আবার যখন অ্যামেলিয়ার উপর আমার দৃষ্টি ফিরে এল, দেখি, ওর চোখ দুটি স্থির হয়ে আছে আয়রন ভার্জিনের এক জায়গায়। তাকালাম ওদিকে। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। সেই কালো বেড়াল! হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। আঁধারের পটভূমিতে ওটার সবুজ চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে বিপদ-সঙ্কেতের মত। চোখেমুখে রক্ত লেগে থাকায় এই বিপদ-সঙ্কেতের দীপ্তি যেন বেড়ে গেছে আরও।

আমি সহসা চিৎকার দিয়ে উঠলাম, 'বেড়াল! ওই যে–দেখো, সেই কালো বেড়াল!'

অমনি ঝট করে উঠে দাঁড়াল বেড়ালটি। এমুহূর্তে ঠিক একটা পিশাচের মত লাগছে ওটাকে। উল্লসিত পিশাচ! প্রচণ্ড হিংস্রতা নিয়ে জ্বলছে চোখ দুটি। দাঁড়িয়ে গেছে গায়ের সবগুলো রোম। ফলে স্বাভাবিক আকৃতির চেয়ে এখন দ্বিগুণ লাগছে ওটাকে। আর লেজটাকে নাড়ছে, বাঘ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগে যেভাবে নেড়ে থাকে।

এলিয়াস পি. হাচেসন বেড়ালটিকে দেখে একটুও ঘাবড়াল না। বরং কৌতুকের ঝিলিক দেখা দিল তাঁর চোখে। বলল, 'বেড়ালটি যদি যুদ্ধংদেহী মনোভাব না ছাড়ে তা হলে ওটাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হোক। এখন ওটা আক্রমণ করে বসলে বিপদে পড়ে যাব। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এমুহূর্তে একদম নিরুপায় আমি। বুড়ো বাবা, ব্যাপারটাকে আপনি সহজভাবে নিন! ঘাবড়ে গিয়ে দড়িটা আবার ছেড়ে দেবেন না যেন! তা হলে কিন্তু

আমি শেষ!'

ঠিক এমন সময় জ্ঞান হারাল অ্যামেলিয়া। সময়মত ওর কটি জড়িয়ে না ধরলে ঠিক পড়ে যেত মেঝেতে। এভাবে আমি যখন অ্যামেলিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখন কালো বেড়ালটি লাফ দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। এবং দিয়েও ফেলল লাফ।

ভেবেছিলাম, হাচেসনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওটা। আর এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নারকীয় গর্জন ছেড়ে বেড়ালটি ঝাঁপ দিল মুখোমুখি দাঁড়ানো তত্ত্বাবধায়ক বুড়োর মুখের উপর। চীনাদের চিত্রকর্মে যেমন পেছনের দু'পায়ে ভর করা আক্রমণরত ড্রাগনের ছবি দেখা যায়, ঠিক তেমনি করে বুড়োর মুখের উপর আক্রমণ চালাল বেড়ালটি। ধারাল নখর দিয়ে চোখমুখ খামচে একাকার করে দিল। ফিনকি দিয়ে ছুটল তাজা রক্ত। ভেসে যেতে লাগল বুড়োর মুখ।

তীব্র আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠল বুড়ো। এমনকী তার যন্ত্রণা অনুভবের বোধশক্তির চেয়েও দ্রুত বেরোল এই চিৎকার। লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল সে। হাত থেকে ছুটে গেল লোহার ডালাটির দড়ি। শেষ মুহূর্তে আমি লাফ দিলাম দড়িটা ধরার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ-গতিতে কপিকল দিয়ে ছুটে গেল দড়িটা। নিজের ভারেই লোহার ডালাটি দড়াম করে গিয়ে আছড়ে পড়ল আয়রন ভার্জিনের উপর।

লোহার যন্ত্রে বন্দী হাচেসনের মুখটা তাৎক্ষণিক ভাবে ভেসে উঠল চোখে। নিশ্চয়ই আতঙ্কে জমে গেছে সে। হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখে কোন কথা সরছে না।

কিন্তু ডালাটা যখন টেনে তুললাম, সে এক নারকীয় দৃশ্য! লোহার কাঁটাগুলো নিখুঁতভাবেই কাজ শেষ করেছে। একদম উপরের দুই কাঁটা হাচেসনের দুই চোখ ভেদ করে একেবারে খুলির ওপাশটাতে গিয়ে আটকে আছে। কাঁটাগুলো সত্যিকার অর্থেই ছিঁড়েখুঁড়ে চুরমার করে দিয়েছে হাচেসনকে। যেহেতু তার

পুরো শরীরটা এখনও বাঁধা, কাজেই টান মারতেই খাড়া এসে ধপ্ করে মেঝেতে পড়ল লাশটা। এবং পড়ার সময় ঘুরে চিৎ হয়ে গেল।

আমি ছুটলাম অ্যামেলিয়ার দিকে, মেঝেতে পড়ে আছে ও। পাঁজাকোলা করে ওকে বাইরে নিয়ে গেলাম। জ্ঞান ফেরার পর যদি এ দৃশ্য ও দেখে, তা হলে আরও ভয়াবহ হবে পরিণতি। অ্যামেলিয়াকে একটা বেঞ্চিতে শুইয়ে উপরে ফিরে এলাম আবার। কাঠের পিলারে ঠেস দিয়ে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে বুড়ো তত্ত্বাবধায়ক। চোখে চেপে ধরা রুমালটা লাল হয়ে উঠেছে রক্তে।

এদিকে হতভাগ্য আমেরিকানটির কপালের উপর এসে বসেছে সেই কালো বেড়াল। হাচেসনের ফাঁকা দুই চোখের কোটরে টইটম্বুর হয়ে থাকা রক্ত পান করছে ওটা। সশব্দে-চুক্‌চুক্ করে।

চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে সাজানো জল্লাদের পুরানো তলোয়ারগুলো থেকে একটা উঠিয়ে নিলাম দ্রুত। তারপর সোজা গিয়ে তলোয়ারটা চালিয়ে দিলাম বেড়ালটির উপর। বসা অবস্থায়ই দ্বিখণ্ডিত হলো ওটা। আশা করি, আমার এই কাজটির জন্য আমাকে পাষণ্ড বলে ভর্ৎসনা করবে না কেউ।

মূলঃ ব্রাম স্টোকার-এর 'দ্য স্ক'
রূপান্তরঃ শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

অশরীরী

চিঠি বিলি করতে বেরিয়েছে ডাকপিয়ন মেডেরিক। এটা তার রোজকার কাজ। আজও কাঁটায় কাঁটায় ভোর ছটায় বেরিয়েছে মেডেরিক। শহরের ইঁট-কাঠ ছাড়িয়ে খোলা মাঠ, মাঠ পার হয়ে বৃন্দিলা নদী, নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পৌঁছে গেল কার্ভেলীন গ্রামের সীমানায়।

কলকল করে বয়ে চলেছে ছোট নদী বৃন্দিলা। দুই পাড়ে ঝাঁকড়ামাথা উইলো গাছের সারি। নদীর উপর ঝুঁকে আছে গাছগুলো, গাছের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে চলেছে বৃন্দিলার শীতল কালো জল। বাঁকের কাছে চওড়া হয়েছে নদী, গভীরতা এখানে কম। পরিষ্কার দেখা যায় তলার বালু, স্বচ্ছ পানিতে খেলে বেড়াচ্ছে পোনা মাছের ঝাঁক।

মেডেরিক এসব দেখেও দেখে না। সময় কোথায় ডাকপিয়নের? কাঁধে তার চিঠির বোঝা, মাথায় সারাক্ষণ চিন্তা, সময়মত পৌঁছে দিতে হবে চিঠিগুলো।

আজকের প্রথম চিঠিটা ছিল পভ্রন্দের। সেটা বিলি করা হয়ে গেছে। এখন সে চলেছে মঁসিয়ে রেনার্দের বাড়ি। বাড়িটা জঙ্গলের ওপারে। তার মানে, সাতসকালে এখন তাকে টানা দু'মাইল জঙ্গলের পথ পাড়ি দিতে হবে।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল মেড়েরিক। যৌবনে সে ছিল সৈন্যদলে, এখনও জোর কদমে এগিয়ে চলল বুড়ো, সৈনিকের মতই বুক টান করে। মনে মনে আওড়াচ্ছে 'কুইক মার্চ! কুইক মার্চ।'

মেডেরিকের পরনে ডাকপিয়নের নীল পোশাক। কোমরে কালো বেল্ট, হাতে লম্বা লাঠি। সরু সাঁকো পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকল নীল পোশাকের ডাকপিয়ন।

জঙ্গলটা মঁসিয়ে রেনার্দের সম্পত্তি। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিল এ-অঞ্চলের ডাকসাইটে জমিদার। জঙ্গলের একেবারে শেষ প্রান্তে বিশাল জমিদারবাড়ি। জমিদারী এখন আর নেই, তবু লোকে বলে জমিদারবাড়ি। বাড়িটা অন্তত দু'শো বছরের পুরানো। সূর্য ডোবার পর সূর্যাস্তের আকাশ যেমন বিদায়ী আলোর শেষ রেশটুকু ধরে রাখে, জমিদারী হারিয়ে জমিদারবাড়ির অবস্থাও হয়েছে অনেকটা সেই রকম। আগেকার সেই ঠাট-বাট আর নেই, থাকার মধ্যে আছে কেবল বাড়িটা আর নদীর ধারের এই জঙ্গল।

মেডেরিক একটু দাঁড়াল। রীতিমত ঘামছে সে। সকাল ন'টাও বাজেনি, এরই মধ্যে তেতে উঠেছে সূর্য। জঙ্গলের ভিতরটায় গুমোট। টুপি খুলে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে আবার হাঁটা দিল মেডেরিক। দু'পাও যায়নি, চোখে পড়ল পথের ধারে ঝরাপাতার উপর কিছু একটা চকচক করছে। একটু এগিয়ে দেখল পেন্সিল কাটার ছোট্ট একটা ছুরি। কৌতূহলী মেডেরিক সেটা তুলে নিতে গিয়ে দেখে অদূরে পড়ে আছে সুচ, সুতো এবং একটি অঙ্গুষ্ঠানা। সেলাইয়ের সময় আংটির মত যে জিনিসটা মেয়েরা আঙুলে পরে, সেই অঙ্গুষ্ঠানা। জিনিসগুলো কুড়িয়ে পকেটে রাখতে রাখতে মেডেরিক ভাবল, 'ভালই হলো, জমিদারবাড়িতেই তো যাচ্ছি, ওখানে জমা দিয়ে দেব।' আবার চলতে শুরু করল মেডেরিক, কিন্তু এবার মনটা তার কেন যেন খুঁতখুঁত করতে লাগল।

জঙ্গলের ভেজা মাটিতে পুরু হয়ে জমেছে ঝরাপাতার স্তর। বহু বছরের ঝরাপাতা আর মরাডালের টুকরো মিলেমিশে তৈরি হয়েছে ক্ষয় আর পচনের বুনো এক গন্ধ। বনের বাতাসে সেই গন্ধ টের পেল মেডেরিক।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। তার সামনে হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে আছে একটি মেয়ে। সম্পূর্ণ নগ্ন। মুখটা রুমালে ঢাকা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মেডেরিক, নিঃশব্দে, যেন একটু শব্দ হলেই ঘুম ভেঙে যাবে মেয়েটার।

প্রথমে তার মনে হয়েছিল মেয়েটা বুঝি সত্যিই ঘুমাচ্ছে। একটু পরেই ভুলটা বুঝতে পেরে নিজেকে আস্ত একটা আহাম্মক মনে হলো তার। এভাবে বনের মধ্যে নগ্নদেহে ভেজা মাটির উপর কেউ কখনও ঘুমোয়? পুরো ব্যাপারটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল মেডেরিকের কাছে। বৃদ্ধ সৈনিক বাতাসে টের পেল মৃত্যুর গন্ধ।

মেয়েটাকে হত্যা করা হয়েছে। তার উরুর উপর জমাট বেঁধে আছে কালো রক্ত। খুন! কথাটা ভাবতেই ঠাণ্ডা একটা ঘামের ফোঁটা সড়সড় করে নেমে গেল প্রাক্তন সৈনিকের মেরুদণ্ড বেয়ে।

চোখে দেখেও ব্যাপারটা তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এমন ঘটনা এদিকটাতে আগে কখনও ঘটেনি। ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল মেডেরিক। কে এই মেয়ে? কিভাবে মারা হয়েছে তাকে এবং কেন?

আশেপাশের দু'দশ গ্রামের অনেক মানুষকেই চেনে মেডেরিক। মেয়েটা তার পরিচিত কেউ না তো? ঝুঁকে পড়ে মুখের উপর থেকে রুমাল সরাতে যাবে, হঠাৎ তার মনে হলো কাজটা কি ঠিক হবে? আগে পুলিস আসুক, তারাই যা করার করবে। পুলিসের উপর অগাধ আস্থা মেডেরিকের। কে জানে, হয়তো রুমালের নিচেই তারা খুঁজে পাবে খুনীকে ধরার একমাত্র সূত্র। আনাড়ী হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি করে মেডেরিক সেটা নষ্ট করতে চায় না।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, রওনা দেবে, তখন আবার মনে হলো মেয়েটা বেঁচে নেই তো? এখনও যদি এর দেহে প্রাণ থেকে থাকে? নিশ্চিত না হয়ে এভাবে একে ফেলে রেখে চলে যাওয়া

যায় না। হাঁটু মুড়ে বসল মেডেরিক। হাত বাড়িয়ে মেয়েটার পায়ের পাতা ছুঁলো। হিমশীতল অনুভূতিটা তার হাত বেয়ে উঠে ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। মৃত···কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যুর শীতল কোলে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে মেয়েটা। এক মুহূর্তও আর সময় নষ্ট করল না মেডেরিক, ছুটল রেনার্দের বাড়ির দিকে। তাকেই আগে খবরটা জানান দরকার, কারণ রেনার্দে কার্ভেলীন গ্রামের বর্তমান মেয়র।

মেয়রের বাড়িটা বিরাট। এত বিরাট যে ওটার পঁচানব্বই ফিট উঁচু গম্বুজের চূড়া থেকে নিচের দিকে তাকালে সবকিছুই খুব ছোট্ট মনে হয়। গাছগুলোকে দেখায় বেঁটে বেঁটে। বিশাল জঙ্গলটাকে মনে হয় বাড়ির সামনের বাগান, আর গম্বুজের ভিত ঘেঁষে বয়ে চলা বৃন্দিলাকে মনে হয় সরু একটা সাদা ফিতে।

অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছে মেডেরিক। হাঁপাতে হাঁপাতে সে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়র সাহেব কোথায়? তাকে আমার জরুরী দরকার।'

নাস্তা শেষ করে দাঁত খোঁচাচ্ছিল দারোয়ান। ডাকপিয়নকে দেখে ধীরেসুস্থে আড়মোড়া ভাঙল, তারপর বিকট এক হাই তুলে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কি দরকার?'

অধৈর্য মেডেরিক বলল, 'খুব দরকার। দরজা খোলো। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। জলদি··· ।'

মেডেরিকের তাড়া দেখে হাসল দারোয়ান। 'আরেব্বাস! ঘোড়ায় চড়ে এসেছ মনে হচ্ছে?' শেষ পর্যন্ত সে ভেতরে গেল খবর দিতে। ফিরল পাক্কা আধঘণ্টা পর। জানাল, 'সাহেব এইমাত্র উঠেছেন। অপেক্ষা করতে হবে।'

আরও আধঘণ্টা অপেক্ষার পর ডাক এল। ড্রইংরূমে বসে খবরের কাগজ পড়ছে মেয়র, সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ।

বছর চল্লিশেক বয়স লোকটার। গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। ঘাড়ে-গর্দানে ষাঁড়ের মত—সবল এবং হৃষ্টপুষ্ট। ভীষণ বদরাগী। একবার

এক গাড়োয়ানকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল ঘোড়ার গাড়ির সীট থেকে। বেচারার দোষ সে তার গাড়ির চাকা তুলে দিয়েছিল রেনার্দের প্রিয় কুকুরের গায়ে। কুকুরটার লেজের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল চাকা। কেঁউ কেঁউ করতে করতে ঘুরপাক খাচ্ছিল কুকুরটা। সেদিকে একনজর দেখে নিয়েই একলাফে ঘোড়ার গাড়ির পাদানীতে উঠে গেল রেনার্দে। গাড়োয়ানকে টেনে নামিয়ে এক লাথিতে ফেলে দিল কুকুরটার উপর। লেজের যন্ত্রণায় কুত্তা তখন পাগল। আঁচড়ে-কামড়ে গাড়োয়ানকে ফালাফালা করে ফেলেছিল কুকুরটা। আরেকবার ভিনদেশী এক শিকারী ঢুকেছিল রেনার্দের জঙ্গলে শিকার করতে। রেনার্দে তাকে ভদ্রভাবে জঙ্গল ছেড়ে চলে যেতে বলে। লোকটা তাকে পাত্তাই দিল না, উল্টো ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ শুরু করে দিল। আচমকা এক ঘুসিতে বন্দুকধারী লোকটাকে ধরাশায়ী করে তাকে ফুটবলের মত লাথি মারতে মারতে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে এসেছিল রেনার্দে। তার এই রগচটা স্বভাবের জন্যে লোকে তাকে সম্‌ঝে চলে, সহজে ঘাঁটায় না।

কাগজের পাতা থেকে চোখ তুলে তাকাল মেয়র। কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার, পোস্টম্যান?'

'আপনার জঙ্গলে একটা মরা মানুষ পড়ে আছে, হুজুর।' উত্তর দিল উত্তেজিত মেডেরিক।

'মরা মানুষ?'

'মরা মেয়েছেলে।'

'মেয়েছেলে?'

'জ্বী, হুজুর। যুবতী মেয়েছেলে। একেবারে উদোম গায়ে পড়ে আছে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মেয়র। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'এটা নিশ্চয়ই রুথিয়াদের সেই মেয়েটা। গতরাতে তার মা

এসেছিল। মেয়েটাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না...'

মেডেরিককে প্রশ্ন করল সে, 'কোথায় দেখেছ তাকে?'

হড়বড় করে জায়গাটার বর্ণনা দিল মেডেরিক। শেষে বলল, 'চলেন, হুজুর। আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে।'

'আমি নিজেই যেতে পারব,' নিরুত্তাপ গলায় উত্তর দিল মেয়র। 'তুমি তোমার ডিউটিতে যাও। যাওয়ার পথে থানায় খবর দিয়ে যাবে। ডাক্তার আর পাদ্রীকেও খবর দেবে। বলবে এক্ষুণি যেন সবাই ঘটনাস্থলে হাজির হয়। আমি সেখানে যাচ্ছি।'

মেডেরিকের আশা ছিল হুজুর তাকে সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে যাবেন। মেয়রের কথা শুনে সে একটু দমে গেল, কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করল না। অবিলম্বে হুকুম তামিল করতে ছুটল।

রেনার্দেও টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে এল। একমুহূর্ত ভাবল সে। তারপর বাঁধানো সড়ক ছেড়ে জঙ্গলের পথ ধরল।

জুলাই মাসের সূর্য তখন গনগন করছে। ক্রমেই তেতেপুড়ে উঠছে চারদিক। অর্ধেকটা পথ যাওয়ার পর রেনার্দে দেখল বাঁ দিকের সরু পায়েচলা পথ ধরে এগিয়ে আসছে ডাক্তার। এককালে আর্মির ডাক্তার ছিল লোকটা। যুদ্ধের সময় পায়ে গুলি লেগেছে, সেই থেকে খুঁড়িয়ে হাঁটে। রেনার্দে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'খবর শুনেছ, ডাক্তার?'

'হ্যাঁ, শুনলাম। মেডেরিক নাকি ডেডবডি আবিষ্কার করেছে!' ডাক্তার উত্তর দিল।

আরেকটু এগোতেই পাদ্রীর দেখা পাওয়া গেল। তার সঙ্গে গির্জার কেরানী প্রিন্সেপ আর গ্রামের চৌকিদার ম্যাক্সিম। কিছুটা পথ নিরবে চলার পর ডাক্তার বলল, 'মেডেরিকের কথা শুনে যা বুঝলাম, তাতে তো মনে হয় জায়গাটা এখানেই কোথাও হবে...দেখুন তো ওদিকে...ওটা কি?'

সবাই একসঙ্গে এগিয়ে গেল এবং একসঙ্গেই থমকে দাঁড়াল, যেন অদৃশ্য কোন দেয়াল তাদের বাধা দিয়েছে। একটু দূরে

দু'হাত মাথার উপরে তুলে অনেকটা 'হ্যান্ডস-আপ' ভঙ্গীতে সটান শুয়ে আছে নগ্ন এক নারীদেহ। রুমালের নিচে মুখটা তার বৃন্দিলার দিকে ফেরানো।

গভীর মনোযোগ দিয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করল ডাক্তার। পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর আলগোছে মুখের উপর থেকে রুমালটা সরাল।

দেখা গেল বীভৎস এক দৃশ্য–জিভটা বেরিয়ে আছে, কালো হয়ে গেছে ওটা। চোখ দুটো আতংকে বিস্ফারিত।

'ধর্ষণ এবং হত্যা।' এমনভাবে বলল ডাক্তার, যেন অ্যানাটমির ক্লাসে লেকচার দিচ্ছে। 'শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। মারা গেছে অন্তত বারো ঘণ্টা আগে। থানায় একটা ডায়েরী করা দরকার। এছাড়া আর কিছুই করার নেই আমাদের।' মুখটা আবার রুমালে ঢেকে দিল সে।

'কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা!' মৃতের মুখের দিকে না তাকিয়ে বলল রেনার্দে। 'কিন্তু এর কাপড়গুলো গেল কোথায়?'

ডাক্তার তখনও লাশের পাশে বসা। বলল, 'নদীতে গোসল করতে এসেছিল। কাপড়চোপড় নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও আছে।'

কেরানী আর চৌকিদারকে নির্দেশ দিল মেয়র, 'প্রিন্সেপ, তুমি দেখো কাপড়গুলো কোথায়। আর ম্যাক্সিম...তুই শহরে যা। থানার দারোগাকে খবর দিবি, বলবি আমি ডেকেছি। ছুটে যাবি আর ছুটে আসবি, দেরি হয় না যেন।' সাথে সাথে ছুটল ম্যাক্সিম আর প্রিন্সেপ।

ডাক্তারের দিকে ফিরল রেনার্দে। 'তোমার কি মনে হয় ডাক্তার, কে ঘটাতে পারে এমন নৃশংস ঘটনা?'

'যে কেউ ঘটাতে পারে,' নির্বিকারভাবে উত্তর দিল ডাক্তার। 'তবে আমার মনে হয়, স্থানীয় কোন লোক এ কাজ করেনি। সম্ভবত এটা বহিরাগত কারও কীর্তি।'

'আমারও তাই মনে হয়,' সায় দিল মেয়র। 'হয়তো ভবঘুরে কিংবা বাউণ্ডুলে কোন লোক এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটাকে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। চান্স নিতে গিয়ে অঘটন ঘটিয়েছে।'

'চান্স?' হাসল ডাক্তার। 'হতে পারে। নির্জন দুপুরে স্নানরতা নগ্নিকা–সুযোগ পেয়ে চান্স তো নিতেই পারে।' কথা বলতে বলতে মৃতের হাতের আঙুলগুলোতে ছড়ির ডগা দিয়ে চাপ দিচ্ছিল ডাক্তার, যেন ওগুলো মানুষের আঙুল নয়, হারমোনিয়ামের রীড। 'আচ্ছা, মেয়েটা যে নিখোঁজ সেই খবর কি আপনাকে দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, গতরাতে ওর মা এসেছিল,' বলল মেয়র। 'রাত তখন প্রায় দশটা। এসে জানাল মেয়ে বাড়ি ফেরেনি। দুশ্চিন্তায় বেচারির পাগল হওয়ার দশা। হাজার হোক মায়ের মন। কিন্তু অত রাতে কোথায় খুঁজি? তবু এদিক-ওদিক লোক পাঠালাম, মাঝরাত পর্যন্ত চলল খোঁজাখুঁজি। সবই বৃথা। তখন কি জানি অন্ধকার জঙ্গলে লাশ পড়ে আছে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেনার্দে।

'সিগারেট চলবে, মেয়র সাহেব?' সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিল ডাক্তার।

'নারে ভাই, ইচ্ছা করছে না।'

মৃতদেহের শরীরে কালো একটা পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডাক্তার এবং রেনার্দে দুজনেই গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে কালো বিন্দুটাকে। 'দৃশ্যটা কিন্তু চমৎকার,' মন্তব্য করল ডাক্তার। 'সাদা ত্বকের ওপর কালো পোকার নড়াচড়া–এটা হচ্ছে রঙের কনট্রাস্ট।...একটা ফ্যাশান চালু ছিল আগেকার দিনে, জানেন নাকি?...গত শতাব্দীতে। ফর্সা মুখে নানা রঙের ছোপ লাগাত মেয়েরা, চেহারায় বৈচিত্র্য আনার জন্যে। খুব পপুলার ছিল ফ্যাশানটা।...জানেন বোধহয়?'

আপন ভাবনায় মগ ছিল মেয়র। কথাটা শুনতেই পেল না।

এমন সময় সরু পথ বেয়ে ছুটতে ছুটতে এল বৃদ্ধা এক মহিলা। তার মাথায় সাদা স্কার্ফ জড়ানো। দূর থেকে চিৎকার করতে করতে এল সে। 'কোথায় আমার মেয়ে?...কোথায়?...কোথায়??'

মাটিতে পড়ে থাকা মৃতদেহের দিকে আতঙ্ক আর অবিশ্বাস নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে, তারপর তীরবিদ্ধ পাখির মত তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিল মৃত সন্তানের দিকে। ছোঁ মেরে তুলে নিল মেয়ের মুখের উপর থেকে সাদা রুমাল। ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা এক মুহূর্তের জন্যে আটকে রাখল তাকে। তারপর ধীরে ধীরে নিরব কান্নায় বিকৃত হয়ে গেল মায়ের মুখ। মৃত সন্তানকে বুকে জড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শোকার্ত জননী। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার শীর্ণ শরীর।

ডাক্তারের চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল। করুণ মুখে সে বারবার বলতে লাগল, 'আহা বেচারি! আহা বেচারি!' রেনার্দেও রুমালে চোখ মুছল।

প্রিন্সেপ ফিরে এল। হাবার মত তাকিয়ে থেকে হাত উল্টে জানাল, 'পাওয়া গেল না।' মেয়র অন্যমনস্ক ছিল, কথাটা হঠাৎ বুঝতেই পারল না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি পাওয়া গেল না?'

'কাপড়। মেয়েটার কাপড়গুলো।'

'ও! পাওয়া গেল না? তাহলে আরও খোঁজো।' খেঁকিয়ে উঠল মেয়র। 'পাওয়া যাতে যায়, সেই ব্যবস্থা করো।' ধমক খেয়ে আবার ছুটল প্রিন্সেপ। মেয়রকে সে ভাল করেই চেনে, একবার খেপলে আর রক্ষে নেই।

জঙ্গলের চারদিক থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল। গ্রামবাসীরা আসছে। অভাবনীয় খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। শুরু হয়েছে নানারকম জল্পনা-কল্পনা। কৌতূহলী মানুষেরা আসছে ঘটনাস্থলের দিকে, আসছে দলে দলে,

পঙ্গপালের মত। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল মৃতদেহটাকে ঘিরে।

ডাক্তার হাঁটু গেড়ে বসল ক্রন্দনরতা মায়ের পাশে। মৃদুকণ্ঠে শোকার্ত মা-কে সান্ত্বনা দিতে লাগল। সান্ত্বনার কথা শুনে বৃদ্ধা আরও জোরে কান্না জুড়ে দিল, সেই সাথে বিলাপের সুরে বলতে লাগল তার জীবনের করুণ কাহিনী। বিধবার বুকফাটা আর্ত বিলাপে ভারি হয়ে উঠল বনের বাতাস।

দূরে দেখা দিল একদল ঘোড়সওয়ার। জনতার মধ্যে শোরগোল উঠল, 'পুলিস! পুলিস!!' সবার আগে দারোগার ঘোড়া। ঘোড়া থেকে নামল দারোগা, হ্যান্ডশেইক করল ডাক্তার আর মেয়রের সাথে। রেনার্দে পুরো ঘটনা বর্ণনা করল তার কাছে। দারোগা সেটা নোট করে নিল। আশেপাশে খুঁজে দেখা হলো কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা। তেমন কিছুই পাওয়া গেল না।

মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্যে নিয়ে যাওয়া হবে। দারোগার নির্দেশে দুজন সেপাই এগিয়ে গেল মৃতদেহের দিকে। তাদের দেখেই চিলের মত চিৎকার দিয়ে মৃত সন্তানকে আঁকড়ে ধরল বৃদ্ধা। রেনার্দে তাকে বোঝাতে লাগল, 'শোনো, তুমি কি চাও না তোমার মেয়ের হত্যাকারী ধরা পড়ুক? তাকে ধরতে হবে। ধরে সাজা দিতে হবে। সেজন্যেই লাশটাকে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

ম্যাক্সিম এসে দাঁড়াল। খবর দিল কাপড়গুলো এখনও পাওয়া যায়নি। কাপড়ের কথা কানে যেতেই মৃতার মা আবার কান্না জুড়ে দিল, 'ওরে...আমার সোনামানিকের কাপড়গুলান কইরে...! আমারে আইনা দাও...!!' যতই তাকে বোঝানো হয় সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে না, ততই সে জোরে চ্যাচায়, 'আমার মেয়ের কাপড়, আমারে আইনা দাও...।'

এই সময় পাদ্রী এগিয়ে আসায় সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। শোকসন্তপ্ত মহিলাকে সঁপে দেয়া হলো পাদ্রীর হাতে। তিনি তাকে ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে মিষ্টি মিষ্টি বুলি দিয়ে ভোলাতে

লাগলেন। ফাঁকতালে লাশ উঠে গেল ঘোড়াগাড়িতে। রেনার্দের বাড়িতে ভরপেট লাঞ্চ সেরে দারোগা ফিরে গেল শহরে।

পরদিন সকালে জানা গেল রাতের অন্ধকারে কে বা কারা বুড়ির কুটিরের সামনে একটা পোঁটলা ফেলে রেখে গেছে। পোঁটলার ভিতরে ছিল মৃত মেয়েটার হারিয়ে যাওয়া জামাকাপড়।

যথারীতি তদন্ত শুরু হলো এবং চলল অনেকদিন ধরে। কিন্তু হত্যাকারীর কোনো হদিস পাওয়া গেল না। মৃত মেয়েটার কাপড়গুলো বুড়ির দরজায় ফেলে যাওয়ার ঘটনা থেকে পুলিস বুঝতে পেরেছে হত্যাকাণ্ডটি স্থানীয় কোনো লোকের কাজ এবং লোকটা সেদিন ভিড়ের মধ্যেই ছিল। হয়তো শোকার্ত মায়ের আহাজারি শুনে তার পাষাণ হৃদয়ও ক্ষণিকের জন্য গলেছিল। তাই রাতের অন্ধকারে কাপড়গুলো সে বুড়িকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এতকিছু বুঝেও পুলিস কিন্তু কিছুই করতে পারল না। খুনীকে ধরতে পারা দূরের কথা, তার টিকিটিরও সন্ধান পেল না। শুধু শুধু হয়রানির শিকার হলো গ্রামের নিরীহ মানুষ।

গ্রামবাসীদের নিস্তরঙ্গ জীবনে বড় রকমের আলোড়ন তুলেছে খুনের ঘটনাটা। সবাই কেমন ভীত আর সন্ত্রস্ত। তাদের মাঝেই বাস করছে একজন খুনী, নিরীহ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবতেই কেমন অস্বস্তি লাগে। এতকালের চেনা গ্রামটাকে আর আগের মত নিরাপদ মনে হয় না। সাঁঝের আগেই আজকাল সবাই বাড়ি ফেরে, যত কাজই থাক। জঙ্গলের ওদিকটায় ভুলেও কেউ যায় না। গুজবও ছড়াতে শুরু করেছে—রুথিয়ার প্রেতাত্মাকে নাকি দেখেছে অনেকে, কাঁদতে কাঁদতে বৃন্দিলার দিকে যাচ্ছে সে, এলো চুলে নগ্নদেহে অপ্সরার মত সুন্দরী রুথিয়া…মাটিতে তার চরণ পড়ে না…।

প্রকৃতির নিয়মে তবু দিন কেটে যায়। গ্রীষ্মের পরে আসে পাতাঝরা হেমন্তকাল। ঝরঝর করে সারাদিন ঝরতে থাকে গাছের পাতা, যেন অরণ্যের অশ্রুপাত। এই অরণ্যে অকারণে হত্যা করা

হয়েছে ফুলের মত নিষ্পাপ এক মেয়েকে, অথচ উদাসীন বৃন্দিলা বয়ে চলে নিরবধি কালের মত—শীতল ও স্রোতস্বিনী। হেমন্তের গোধূলিতে মেঘেদের লাল রং আবীর ছড়ায় বৃন্দিলার কালো জলে, যেন আগুন জ্বলে নদী ও নীলিমায়।

একদিন শোনা গেল গাছ কেটে জঙ্গল সাফ করছে রেনার্দে। শুধু কানে শোনাই নয়, চোখেও দেখল গ্রামের লোক, গাছ কাটছে করাতী ও কাঠুরেরা। একের পর এক ধপাধপ পড়ছে গাছগুলো। দিন যাচ্ছে গাছ কমছে, ক্রমশ ফাঁকা হচ্ছে ঘন বনভূমি।

কদিন ধরে নাওয়া-খাওয়া ভুলে এই কাজে মেতে আছে রেনার্দে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চরকির মত ঘুরছে সে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছে প্রতিটা গাছের পতন। বৃক্ষহত্যাযজ্ঞে তার উৎসাহের অন্ত নেই।

দিনের শেষে সেদিন ক্লান্ত কাঠুরেরা এসে দাঁড়াল সেই মহীরুহের নিচে, যেখানে ঘটেছে রুথিয়ার হত্যাকাণ্ড, মাত্র কিছুদিন আগে। আবছা অন্ধকারে জায়গাটা কেমন ভুতুড়ে দেখায়। রেনার্দেও আছে দলের সঙ্গে। হঠাৎ তার মনে হলো রুথিয়ার প্রেতাত্মা এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো? বিশাল মহীরুহের দিকে তাকিয়ে কাঠুরেদের সর্দার বলল, 'আজ থাক। কাল এটাকে শোয়াব।'

রেনার্দে বলল, 'না, আজই।' ভূতে পেয়েছে যেন তাকে, জেদ চেপে গেছে মাথায়।

মনিবের হুকুম, কি আর করা, তড়িঘড়ি কাজে লেগে গেল কাঠুরেরা। দেখতে দেখতে ডালপালা কেটে ন্যাড়া করে ফেলা হলো গাছটাকে। গোড়া কোপানোও শেষ। গাছের ডগায় দড়ি বেঁধে টানছে পাঁচজন জোয়ান কাঠুরে, 'হেঁইয়ো মারোট্টান...', হেঁইয়ো মারোট্টান...!' মড়মড় করতে করতে হেলে পড়েছে বিশাল মহীরুহ। এমন সময় ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। ঘনায়মান অন্ধকারে রেনার্দেকে দেখা দিল নগ্ন এক নারীমূর্তি...রুথিয়ার

প্রেতাত্মা। এলো চুলে অন্ধকারে গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। সম্মোহিতের মত এগিয়ে গেল রেনার্দে। হৈহৈ করে উঠল কাঠুরেরা। গাছটা পড়ছে রেনার্দের মাথার উপর, সেদিকে তার খেয়ালই নেই। শেষ মুহূর্তে সামান্য একটু হেলে গেল গাছটা, প্রাণে বেঁচে গেল রেনার্দে। তার গা ঘেঁষে পড়ল গাছটা। মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে রেনার্দে দেখল খিলখিল করে হাসছে রুথিয়া।

কাঠুরেরা তাকে টেনে তুলল। তেমন কিছু হয়নি রেনার্দের, কাঁধে সামান্য চোট লেগেছে। অবাক চোখে মনিবকে দেখছে কাঠুরেরা। এ কেমন পাগলামি লোকটার, পড়ন্ত গাছের নিচে কেন গেল সে? কাঠুরেদের সর্দার দ্বিধা কাটিয়ে প্রশ্নটা করেই ফেলল।

'মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল,' দুর্বল গলায় বলল রেনার্দে। 'ঠিকমত নাওয়া-খাওয়া নেই তো, বোধহয় তাই।' কথাটা বলে আর দাঁড়াল না, বিস্মিত কাঠুরেদের জিজ্ঞাসু চোখের সামনে থেকে দ্রুত সরে গেল।

ঘরে ফিরে সটান ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল রেনার্দে। এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল সে। ঘটনাটা তাকে বেশ ভড়কে দিয়েছে। টেবিল ল্যাম্পের আলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল রেনার্দে, এসবের মানে কি? ভাবতে ভাবতে একসময় উঠে দাঁড়াল সে। ঘড়িতে সময় দেখল, সন্ধ্যা সাতটা। হাত বাড়িয়ে ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা টেনে বের করল, তারপর আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের মত দেখাচ্ছে তাকে, দেয়ালে নড়ছে তার ভুতুড়ে ছায়া।

হঠাৎ ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়াল রেনার্দে। রিভলভারটা ডান হাতে চেপে ধরে নলটা ছোঁয়াল কপালের রগে, ট্রিগারে আঙুল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, একচুল নড়ছে না, যেন বিবেকের রায় শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে—হ্যাঁ কিংবা না?

শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলাল না। ইস্পাতের নলের ঠাণ্ডা ছোঁয়া

তাকে তপ্ত সীসার কথা মনে করিয়ে দিল। আঙুলে চাপ পড়ার সাথে সাথেই তপ্ত সীসা ঢুকে যাবে খুলির ভিতর। ভাবতেই শিউরে ওঠে রেনার্দে। না, এভাবে আত্মহত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, অন্য কিছু ভাবতে হবে।

বেঁচে থাকা ইদানীং অসহ্য হয়ে উঠেছে রেনার্দের কাছে, অন্তহীন নরকবাসের মত হয়ে উঠেছে। এভাবে বাঁচা যায় না, দুহাতে মাথার চুল খামচে ধরে ভাবতে লাগল সে। কি করা যায়…কি করা যায়?

'হুজুর, ডিনার প্রস্তুত,' দরজার ওপাশ থেকে ভৃত্যের গলা শোনা গেল।

অসম্ভব চমকে উঠল রেনার্দে। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল, 'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

দু'চামচ খেয়েই উঠে পড়ল সে, খিদে নেই। ফিরে এসে ড্রইংরুমে বসে কাটাল অনেকক্ষণ, একটার পর একটা সিগারেট পোড়াল, টেবিল ল্যাম্পের আলোর দিকে একদৃষ্টে মূর্তির মত তাকিয়ে পার করে দিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যখন সে তার শোবার ঘরে ঢুকল তখন নিশুতি রাত, চারদিক নির্জন, শোনা যায় শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক।

চোরের মত চুপিসারে নিজের ঘরে ঢুকল রেনার্দে। কেমন যেন ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে। দরজা বন্ধ করে একে একে উঁকি মারল বিছানার নিচে, বাথরুমে, দেয়াল আলমারিতে এবং কাবার্ডের ভিতর। কোথাও কেউ নেই। থাকবে না জানে রেনার্দে। তবু প্রতিরাতে ঘরের আনাচ-কানাচ খুঁজে দেখে সে। তারপর অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে ঘামতে থাকে। শুরু হয় রাতের বিভীষিকা।

বাগানে ফলের গাছে ডানা ঝট্‌পটিয়ে উড়ে যায় বাদুড়। তখন সে আসে…রুথিয়ার প্রেতাত্মা। বৃন্দিলার পাড় থেকে হাওয়ায় ভেসে ভেসে আসে। মাটিতে তার চরণ পড়ে না। অন্ধকার

বাগানের পথ ধরে আসে অশরীরী। রেনার্দের জানালার কাছে এসে থামে, জ্বলতে থাকে ফসফরাসের আলোর মত। একসময় জানালা পার হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে, বিছানার পাশে এসে স্থির হয়ে ভাসতে থাকে, ঘষাঘষা গলায় প্রশ্ন করে, 'কেন?...কেন??...কেন???'

মাসকয়েক আগের কথা। দিনটা ছিল প্রচণ্ড গরম। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় গড়াচ্ছিল রেনার্দে, ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে শেষে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সে। বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলের পথে। তার নিয়তি সেদিন তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বৃন্দিলার পাড়ে। নদীর দিক থেকে ভেসে আসছিল ঠাণ্ডা বাতাস, শরীর জুড়িয়ে যায়। ঝোপের পাশে ঘাসের উপর সটান শুয়ে পড়ল রেনার্দে। আরামে চোখ বুজে এসেছিল তার, হঠাৎ কিসের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল।

রেনার্দের মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে। নদীতে স্নান করছে এক অপ্সরা, খেলছে পানি ছিটিয়ে। খিলখিলিয়ে হাসছে। তার হাসির জলতরঙ্গ নির্জন চরাচরে ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ছে দূর থেকে দূরান্তে। কে এই মেয়ে? এ কি পৃথিবীর কেউ, নাকি মায়াবিনী? এসবই কি মায়ার খেলা? মন্ত্রমুগ্ধ রেনার্দে হাঁ করে দেখতে লাগল মেয়েটাকে। যেন জাদু করেছে কেউ তাকে, টানছে চুম্বকের মত মেয়েটার দিকে।

অসাধারণ রূপসী মেয়েটা, জলপরীর মত। স্বচ্ছ টলটলে পানিতে দোল খাচ্ছে তার প্রতিবিম্ব। পিঠ ছাপিয়ে নেমেছে লম্বা ভেজা চুল। খানিক পরে নদী থেকে উঠে এল সে। এগিয়ে আসছে রেনার্দের দিকেই। ঝোপের ঠিক সামনে এসে থেমে গেল, হাত বাড়িয়ে দিল ঝোপের উপরে রাখা কাপড়ের দিকে। রেনার্দের ঘোর তখনও কাটেনি। তার মনে হলো এই মেয়ে মানবী নয়, অপার্থিব অশরীরী, স্নান সেরে এখনি উধাও হবে।

আবার সেই অপ্রতিরোধ্য চুম্বকের টান অনুভব করল রেনার্দে

দেহে এবং মনে, রক্তের ভিতরে, শিরায় শিরায়। অকস্মাৎ দু'হাতে ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে এল সে এবং বুনো জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটার উপর।

সভয়ে চিৎকার দিল মেয়েটা। ঝরে পড়ল একরাশ পাতা, ঝরাপাতার উপর দিয়ে সড়সড় শব্দ তুলে ছুটে গেল একটা সরীসৃপ। মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল মায়াবী অপরাহ্ন। ঘোর কেটে গেল রেনার্দের।

তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে মেয়েটা। উদ্‌ভ্রান্ত রেনার্দে চেপে ধরল তার মুখ। চিৎকার তাতে থামল না, উল্টে বেড়ে গেল। এবার গলা টিপে তার কণ্ঠরোধ করতে চাইল রেনার্দে, কিন্তু কাজ হলো না। উন্মত্তের মত দু'হাতে মেয়েটার কণ্ঠনালী চেপে ধরল সে, জোরে...আরও জোরে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মেয়েটার গলা চেপে ধরেছে রেনার্দে। একসময় জান্তব একটা ঘর্ঘর শব্দ তুলে ছট্‌ফটিয়ে স্থির হয়ে গেল মেয়েটার দেহ।

সম্বিত ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াল রেনার্দে। দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা মানুষের মত অবাক চোখে অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে থাকল মাটিতে পড়ে থাকা মেয়েটার দিকে। তারপর আতঙ্ক তাকে গ্রাস করল। সর্বগ্রাসী সেই আতঙ্কের হাত থেকে ছুটে পালাতে চাইল রেনার্দে। কিন্তু তাকে থামাল তার সহজাত প্রবৃত্তি। বিপদ টের পেয়ে সজাগ হয়ে উঠল তার সবকটা ইন্দ্রিয়। সতর্ক শিকারীর মত দ্রুত ভেবে নিল সে। তারপর কাজে লেগে গেল।

প্রথমে ভেবেছিল লাশটাকে নদীতে ফেলে দেবে। কি ভেবে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। তার বদলে মৃত মেয়েটার কাপড়গুলো দলা পাকিয়ে বান্ডিল বানালো। নদীর ধার দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়াল সে। কাণ্ডের ছোট্ট ফোকর গলে বান্ডিলটা ফেলে দিল ভিতরে। এরপর নদীর অপর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল জঙ্গলের একেবারে উল্টো দিকে। সেখান থেকে আরও খানিকটা গেলে ফসলের মাঠ। মাঠে

পৌঁছে নিজের বর্গা চাষীদের সাথে কথা বলল জমিদার রেনার্দে। চাষবাসের খবর নিল। মসিঁয়ে রেনার্দে সেদিন জমি দেখতে এসেছিলেন, বেশ কিছু বর্গাচাষীর চোখে এটা ফলাওভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাড়ির দিকে ফিরল রেনার্দে। সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি ফিরে যথাসময়ে ডিনার করল। বাড়ির চাকর-বাকরও জানল মনিব সেদিন জমি দেখতে গিয়েছিলেন।

সে রাতে ঘুমের কোন ব্যাঘাত হলো না রেনার্দের। মরার মত ঘুমাল সে। একটানা একঘুমে পার করে দিল রাত। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল তার। চোখ খুলেই মনে পড়ল আগের দিনের কথা। আড়ষ্ট হয়ে গেল সে, আজ নিশ্চয়ই জানাজানি হবে ঘটনাটা।

ব্রেকফাস্টের সময় মেডেরিক এসে খবর দিল—সে একটা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছে জঙ্গলের রাস্তায়।

সেদিন ঘটনাস্থলে হাজির হওয়া, ডাক্তারের সাথে কথা বলা, পুলিসের সঙ্গে আলোচনা করা এসবই করেছিল রেনার্দে একটা ঘোরের মধ্যে। গভীর রাতে বুড়ির দরজায় কাপড়গুলোও সে রেখে এসেছিল কোনকিছু চিন্তা না করেই।

এরপর তদন্তের পুরোটা সময় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণ করে গেল রেনার্দে। মেয়র হিসেবে যা যা তার করণীয় সবই সে করল অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। তাকে কেউ সন্দেহ করেনি, করার কোন কারণও নেই। পুলিসের বড়কর্তার সঙ্গে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হত রেনার্দের। মেয়র হিসেবে এটা তার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। তদন্তের গতিকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সুকৌশলে এটা-ওটা মন্তব্য করত রেনার্দে। তার কথায় দারোগা ভুল পথে এগোচ্ছে দেখে মনে মনে একধরনের মজাও পেত সে।

কিন্তু গোল বাধল তদন্ত মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পর। এতদিন আত্মরক্ষার তাগিদে চোখ-কান খোলা রেখে চলছিল রেনার্দে, প্রতিটা কাজ করছিল ভেবেচিন্তে। তদন্ত থেমে যাওয়ার পর স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলল সে, ভাবল, যাক বাঁচা গেল। সবদিক সামলে চলতে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিল রেনার্দে।

দু'একটা দিন ভালই কাটল। তারপর কেমন এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করতে লাগল সে। একটু শব্দ হলেই চমকে ওঠে, ভয় পায়। রাতে শোবার আগে ঘরের আনাচ-কানাচ খুঁজে দেখে নিদ্রাহীনতায় ভুগতে লাগল রেনার্দে। ক্রমশ খিটখিটে হয়ে উঠল তার মেজাজ।

সেদিন রাতে ঘুম আসছিল না, ইজিচেয়ারে বসে ছিল রেনার্দে, জানালার দিকে মুখ করে। হঠাৎ তার মনে হলো জানালার পর্দাটা যেন একটু নড়ে উঠল। ব্যাপারটা গুরুত্ব দেয়ার মত কিছুই না। বাতাসে নড়তে পারে জানালার পর্দা, মনের ভুলও হতে পারে। কিন্তু অকারণেই অস্বস্তিতে ভরে গেল রেনার্দের মন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে জানালার কাছে। পর্দাটা সরাল। রাতের অন্ধকার ঘুটঘুট করছে জানালার ওপাশে, কিছুই দেখা যায় না। বাড়ির পাশ ঘেঁষে বয়ে চলেছে বৃন্দিলা, নদীর কলকল শব্দ শোনা যায় শুধু। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রেনার্দে। দূরে আবছা একটুকরো আলো দেখতে পেল সে। আলোটা একটু একটু কাঁপছে। কেউ বোধহয় নদীতে মাছ ধরতে এসেছে, ভাবল রেনার্দে। পরমুহূর্তেই চমকে উঠল সে—আলো না, আবছা আলোর মত জ্বলছে একটা দেহ। মাটিতে শুয়ে আছে দেহটা, হাত-পা ছড়িয়ে, 'হ্যান্ডস-আপ' ভঙ্গিতে। সেই ভঙ্গিতেই উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে…রুথিয়ার মৃতদেহ।

কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এসে ধপ করে ইজিচেয়ারে বসে পড়ল রেনার্দে। সম্মোহিতের মত জানালার দিকে তাকিয়ে আছে সে। দুই চোখে আতঙ্ক আর অবিশ্বাস। জানালাটা টানছে তাকে চুম্বকের মত। ঘুমের ঘোরে লোকে যেভাবে হাঁটে, সেভাবে হেঁটে গিয়ে আবার দাঁড়াল রেনার্দে জানালার কাছে। অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। উঠে দাঁড়িয়েছে রুথিয়া। আবছা

আলো দিয়ে তৈরি তার দেহ, মোমের মত সাদা। হ্যান্ডস-আপ ভঙ্গিতে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এদিকেই এগিয়ে আসছে রুথিয়া।

ছুটে এসে বিছানার চাদরের নিচে ঢুকল রেনার্দে। থরথর করে কাঁপছে। টের পেল, আলোটা জানালার ওপাশে এসে থেমেছে। উজ্জ্বল কুয়াশার মত সেই আলো জানালার কাঁচ ভেদ করে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। চাদরের ভেতর থেকে দেখল রেনার্দে ঠিক তার মাথার ওপর হ্যান্ডস-আপ ভঙ্গিতে ভাসছে রুথিয়া। গোঙানির মত একটা শব্দ করে জ্ঞান হারাল রেনার্দে। জ্ঞান হারানোর আগে সে শুনতে পেল তীক্ষ্ণ খনখনে গলায় আলোটা প্রশ্ন করছে, *'কেন…? কেন…?? কেন…???'*

সেই থেকে শুরু। সেই থেকে বিভীষিকায় কাটছে রেনার্দের প্রতিটা রাত। আর দিনগুলো কাটছে রাতের আশংকায়—কখন রাত হবে, কখন শুরু হবে রাতের বিভীষিকা?

অবশ্য দিনের বেলা ভয়টা কখনও কখনও কেটে যায় সাময়িকভাবে। যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝায় রেনার্দে—রাতের ঘটনাগুলো আসলে অলীক, সত্যি নয়। উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। মরা মানুষ কি কখনও ভূত হয়ে আসতে পারে? কিন্তু যতই নিজেকে বোঝাক, সন্ধ্যা হতে না হতেই হাত-পা কাঁপতে থাকে রেনার্দের, এলোমেলো হয়ে যায় চিন্তা-ভাবনা, গুলিয়ে যায় সবকিছু। রাতের পর রাত অশরীরী রুথিয়াকে দেখে সে। দেখে...চিৎকার করে প্রশ্ন করছে রুথিয়ার প্রেতাত্মা, *'কেন?…কেন??…কেন???'* এক একদিন কঙ্কালের মত সাদা একজোড়া হাত এগিয়ে আসে রেনার্দের গলাটা চেপে ধরার জন্যে, ঠিক যেভাবে রেনার্দে চেপে ধরেছিল রুথিয়ার গলা।

এভাবে বাঁচা যায় না। মাথার চুল খামচে ধরে ভাবতে থাকে রেনার্দে। রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করার সাহস তার নেই। কিন্তু উপায় একটা কিছু বের করতেই হবে। হঠাৎ বিদ্যুৎ

চমকের মতই চিন্তাটা মাথায় এল তার।...হ্যাঁ, এটাই মুক্তির একমাত্র উপায়।

চিঠি লিখবে সে। তার অপকর্মের কথা সবিস্তারে জানিয়ে চিঠি লিখবে কোন বন্ধুকে। কিন্তু কাকে লেখা যায়? ডাক্তারকে? না, লোকটা বাচাল, তাকে দিয়ে হবে না। অন্য কাউকে লিখতে হবে, এমন একজনকে, যে তার অবস্থাটা বুঝবে। সহানুভূতির সাথে বিচার করবে তাকে। বিচার? তার তো একজন বিচারক বন্ধুই আছে—মঁসিয়ে পুঁতো। হ্যাঁ, পুঁতোকেই চিঠি লিখবে সে। ভোরবেলা চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দেবে। তারপর উঠে যাবে টাওয়ারের চূড়ায়। সেখান থেকে...। চিঠিটা একবার ডাকবাক্সে ফেলা হয়ে গেলে আত্মহত্যা না করে উপায় থাকবে না রেনার্দের। সেটাই সে চায়। নিজেকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করবে সে।...হ্যাঁ, এটাই উপায়।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেয়ার পর আশ্চর্য এক প্রশান্তিতে ভরে গেল রেনার্দের মন। সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। আগামীকাল সকালেই তার মৃত্যু হবে, সুতরাং দুশ্চিন্তা করার কোন মানে হয় না। চিঠি লিখতে বসে গেল রেনার্দে।

অনেক সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে চিঠিটা লিখল সে। পুঁতোকে সবিস্তারে জানাল কখন কিভাবে সে রুথিয়াকে হত্যা করেছে। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিল না। জানাল গত কয়েকটা মাস কিভাবে নরকযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কেটেছে তার দিন আর রাত। সবশেষে বন্ধুকে অনুরোধ করল সে যেন এই চিঠির কথা কাউকে না জানায়। রেনার্দে নিজেই নিজেকে চরম শাস্তি দিচ্ছে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে নিচ্ছে। সুতরাং তার অপরাধের কথা তৃতীয় ব্যক্তিকে জানানোর দরকার কি? বন্ধু হিসেবে পুঁতো যেন তার শেষ অনুরোধটুকু রক্ষা করে।

চিঠি লেখা যখন শেষ, বাইরে ভোরের কাক ডাকছে কা কা করে। চিঠিটা খামে ভরে খামের উপর ঠিকানা লিখল রেনার্দে।

আঠা দিয়ে খামের মুখ বন্ধ করে দিল। কাজ শেষ। এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাছারিঘরের দিকে রওনা দিল সে।

চারদিক আলো হয়ে গেছে। গাছে গাছে শুরু হয়েছে পাখিদের কিচিরমিচির। কাছারিঘরের পাশেই ডাকবাক্স। কাঁপা কাঁপা হাতে লাল বাক্সটার মধ্যে চিঠি ফেলে দিল রেনার্দে।

বাড়ি ফিরে সোজা টাওয়ারে উঠে গেল সে। এখন অপেক্ষার পালা। মেডেরিক তার মৃত্যু-পরোয়ানা নিয়ে রওনা দিলেই এখান থেকে লাফিয়ে পড়বে রেনার্দে। ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল সে। এত উঁচু থেকে বৃন্দিলাকে মনে হচ্ছে সরু একটা সাদা ফিতে, গাছগুলোকে দেখাচ্ছে বেঁটে বেঁটে, দূরের ঘরবাড়িগুলোকে মনে হচ্ছে পুতুলের ঘরবাড়ি।

প্রাণ জুড়ানো ঠাণ্ডা বাতাস আসছে নদীর দিক থেকে। বড় করে নিঃশ্বাস নিল রেনার্দে। আহ্...অনেকদিন এমন প্রাণ জুড়ানো বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়নি সে। এমন সূর্যোদয়ও দেখেনি। পুবের আকাশটাকে রাঙিয়ে সূর্য উঠেছে—ভোরের সূর্য। রেনার্দের মনে হলো এই প্রথম সে সূর্যোদয় দেখছে।

নিচে শান বাঁধানো চত্বর। একটু পরে এই চত্বরে আছড়ে পড়বে রেনার্দের শরীর। কল্পনায় দলাপাকানো রক্তাক্ত দেহটাকে দেখতে পেল রেনার্দে। মনে মনে শিউরে উঠল সে।

আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে রেনার্দে। কিন্তু কেন? ভূতের ভয়ে! সামান্য এক ভূতের ভয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে দুর্দান্ত জমিদার রেনার্দে! দিনের আলোয় কথাটা মনে হতেই হো হো করে হাসতে লাগল রেনার্দে। পুরানো যুক্তিগুলো আবার ফিরে আসতে লাগল তার মাথায়। মরা মানুষ কখনও ভূত হয়ে আসতে পারে না, এটা সে ভাল করেই জানে। ভূত হচ্ছে মস্তিষ্কের কল্পনা...মনের ভয়। আর সেই ভয়ে সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে আহাম্মকের মত!

ভোরের সূর্যের দিকে আবার তাকাল রেনার্দে। হঠাৎ একরাশ আনন্দের স্মৃতি ভিড় করে এল তার মনে...শীতের সকালের

আমেজ, শিকারের উত্তেজনা, বিকেলে বাগানে পায়চারি…এসবই সে ছেড়ে চলে যাবে? ছেড়ে যাবে ভোরের বাতাস…সোনালি সূর্যোদয়? সব ছেড়ে চলে যাবে কাল্পনিক এক ভূতের ভয়ে?…না, তা হয় না।

তার আছে প্রচুর সম্পত্তি, অনেক টাকা। এসব ভোগ করার বয়সও আছে তার। আসলে মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে, ব্যস্ত রাখতে হবে কোন কাজে। ভ্রমণেও বেরিয়ে পড়তে পারে রেনার্দে। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াবে সে। কোথায় পালাবে তখন ভূত!

গতরাতেই তো…চিঠি লেখার কাজে ব্যস্ত ছিল সে। ভূত-টূত কিছুই তো আসেনি। এটাই আসল সমাধান–মনটাকে ব্যস্ত রাখতে হবে। তাই করবে রেনার্দে। মরবে না এখনি। কেন মরবে?

ডাকপিয়ন আসছে–নীল পোশাকের ডাকপিয়ন। দূরে একটা নীল বিন্দুর মত দেখাচ্ছে তাকে। ক্রমশ বড় হচ্ছে বিন্দুটা। বড় হতে হতে একসময় মানুষের আকার নিল ওটা। এখন তাকে চেনা যাচ্ছে–ডাকপিয়ন মেডেরিক। দ্রুত এগিয়ে আসছে সে। হাতে তার লাঠি, কাঁধে ঝোলা। জঙ্গল পেরিয়ে কাছারিঘরের দিকে রওনা দিল মেডেরিক।

হঠাৎ চমকে উঠল রেনার্দে–এখনি ডাকবাক্সের কাছে পৌঁছে যাবে মেডেরিক। এতক্ষণ যেন ঘোরের মধ্যে ছিল সে। এবার দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। ঘোরাল সিঁড়ি, মাথা ঘুরছে তার। কিন্তু থামল না, গতিও কমাল না। টাওয়ার থেকে নেমে সদর দরজা খুলে উদ্‌ভ্রান্তের মত দৌড়াতে লাগল রেনার্দে কাছারিঘরের দিকে। মেডেরিকের আগে তাকে সেখানে পৌঁছাতে হবে।

দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে দুদিক থেকে পৌঁছাল ডাকবাক্সের কাছে। 'সুপ্রভাত, মেডেরিক!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রেনার্দে।

'সুপ্রভাত, মঁসিয়ে মেয়র।'

'ইয়ে…মেডেরিক…আমি, একটা চিঠি পোস্ট করেছি…ভুল

করে।' আমতা আমতা করছে রেনার্দে। 'চিঠিটা আমার দরকার। ফেরত নিতে চাই।'

'বেশ তো, নেবেন।' ডাকবাক্সের তালা খুলতে খুলতে সহজভাবে বলল মেডেরিক।

চিঠিগুলো ব্যাগে ভরছিল সে। সাদা একটা খাম দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রেনার্দে, 'ওই যে, ওটা…! ওটা…!!'

খামটা হাতে নিল মেডেরিক, মেয়র সাহেবকে দেবে, এমন সময় মেয়রের মুখের দিকে তাকাল সে। তাকিয়েই চমকে উঠল—এমন দেখাচ্ছে কেন মেয়রকে? চোখ দুটো লাল, চুল উষ্কখুষ্ক। বোঝাই যাচ্ছে সারারাত ঘুমায়নি লোকটা। ব্যাপার কি? 'আপনার শরীর ভাল তো, মঁসিয়ে মেয়র?' সাবধানে প্রশ্নটা করল পোস্টম্যান। 'রাতে ঘুম হয়েছে তো?'

'ইয়ে…শরীর? হ্যাঁ…শরীর ভালই আছে।' প্রথমে থেমে থেমে, তারপর হড়বড় করে কথা বলতে লাগল মেয়র। 'ঘুম হবে না কেন? ভালই ঘুম হয়েছে। চিঠিটা দাও।'

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা দিতে গিয়েও দ্বিধায় পড়ে গেল মেডেরিক। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে তার মন। কিছু একটা গণ্ডগোল আছে চিঠিটায়…সাত সকালে চিঠির খোঁজে মেয়র সাহেব নিজে এসে হাজির…তা-ও আবার করমচার মত লাল লাল চোখে…। বাতাসে গণ্ডগোলের আভাস পেল বুড়ো সৈনিক।

মেডেরিক ইতস্তত করছে দেখে আচমকা ছোঁ মেরে তার হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল মেয়র। কিন্তু সময়মত হাতটা সরিয়ে নিয়েছে মেডেরিক। ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত আর হাস্যকর যে মেডেরিকের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। চিঠিটা ব্যাগে পুরে ফেলল পোস্টম্যান।

'চিঠিটা দাও, মেডেরিক।'

'তা হয় না, মঁসিয়ে মেয়র।'

'কি হয় না?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মেয়র।

‘চিঠি আমি আপনাকে দিতে পারি না,’ শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলল পোস্টম্যান।

‘ওটা আমি ভুল করে পোস্ট করেছি,’ মেডেরিককে বোঝাতে চেষ্টা করল মেয়র। ‘খামটা আমার দরকার। জরুরী একটা ডকুমেন্ট আছে ওতে…দাও।’ হাত বাড়াল মেয়র।

‘তা হয় না।’

‘কেন হয় না?’ ধমকে উঠল রেনার্দে। ‘আমি কার্ভেলীনের মেয়র। আমি বলছি, চিঠিটা দাও।’

‘যার নামে চিঠি, সে-ই পাবে,’ বলল অবিচলিত পোস্টম্যান। ‘আপনাকে আমি দিতে পারি না।’

‘মেডেরিক, ভাল হবে না,’ চেঁচিয়ে উঠল রেনার্দে। খেপে গেছে সে। ‘চিঠিটা দাও। নইলে…নইলে চাকরি খাব তোমার।’ বলতে বলতে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল মেয়র। এক হাতে সে খামচে ধরল পোস্টম্যানের শার্টের কলার, অন্যহাতে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল।

‘খবরদার!’ এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল পোস্টম্যান। বাঁ হাতে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছে চিঠির ব্যাগ, ডান হাতে উদ্যত লাঠি। ‘খবরদার! আর এক পা-ও এগোবেন না!’

মারমুখো মেডেরিককে দেখে চুপসে গেল রেনার্দে। বুঝল মেজাজ গরম করে কোন লাভ হবে না। এবার অন্য পথ ধরল সে। ‘মেডেরিক…চিঠিটা দাও।’ মানিব্যাগ খুলে একশো টাকার একটা নোট বের করল রেনার্দে। ‘এই নাও…। এটা রাখো। চিঠিটা দাও, প্লীজ…’

ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা দিল পোস্টম্যান। অনুনয় করতে লাগল রেনার্দে, ‘মেডেরিক, শোনো…। এক হাজার টাকা দিচ্ছি, চিঠিটা দাও।’

কোন কথা না বলে এগোতে লাগল মেডেরিক। পিছে পিছে

চলল রেনার্দে। শেষ চেষ্টা চালাল, 'মেডেরিক! ভাই, তোমাকে আমি বড়লোক বানিয়ে দেব। এক লাখ টাকা দেব...পাঁচ লাখ...দশ লাখ...! কত চাও বলো? মেডেরিক...!'

ঘুরে দাঁড়াল মেডেরিক। 'আপনার টাকা আমার চাইনে, মঁসিয়ে মেয়র।' শান্তভাবে বলল সে। 'আমি গরীব মানুষ। আমাকে আমার কর্তব্য করতে দিন।'

আর আশা নেই, সব শেষ—বুঝল রেনার্দে। আর কোনই আশা নেই, চলে যাচ্ছে পোস্টম্যান। চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছে সে। নিয়ে যাচ্ছে রেনার্দের মৃত্যু-পরোয়ানা।

ফিরে চলল রেনার্দে। কাঁধটা ঝুলে পড়েছে তার, বুড়ো দেখাচ্ছে তাকে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

একটা একটা করে সিঁড়ি বেয়ে আবার টাওয়ারের চূড়ায় উঠে গেল রেনার্দে। অবসন্ন চোখে শেষবার দেখে নিল চারপাশ। তারপর শানবাঁধানো চত্বর লক্ষ্য করে ডাইভ দিল, দু'হাত মাথার উপরে তুলে। অনেকটা 'হ্যান্ডস-আপ' ভঙ্গিতে।

মূলঃ গী দ্য মোপাসাঁ
রূপান্তরঃ খুররম মমতাজ

ঘৃণা

ফ্যাকাসে চাঁদের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে কালো মেঘের দল। এক আকাশ তারা অন্ধকার জমিনে বইয়ে দিয়েছে আলোর বন্যা। গাছগুলোর ছায়ার নাচন নির্জন রাস্তায়। ক্ষণে ক্ষণে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে একটা কুকুরের করুণ বিলাপ।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত সাড়ে বারোটা। সাধারণত এই সময়টাতেই দোকান বন্ধ করে বাসার পথ ধরি। রাস্তা প্রায় সময়ই নির্জন থাকে। মাঝে মাঝে দুয়েকটা স্কুটার ঝড় তুলে পাশ কাটায় কেবল।

আজ হঠাৎ একটা অস্বস্তিবোধ জড়িয়ে ধরল আমাকে। সাথে ভয়ের একটা জাল। ব্যাপারটা বেশ বিস্ময় জাগাল মনে। এমনতো হয় না কোনদিন। সাহসী পুরুষ বলে আমার একটা সুখ্যাতি আছে। অমাবস্যার ঘুটঘুটে আঁধারেও গোরস্থান কিংবা শ্মশানে যেতে বুক কাঁপে না একটুও। কিন্তু আজ....

পায়ে কীসের যেন বাধা পেয়ে আচমকা হোঁচট খেলাম। পেছন ফিরে তাকাতেই ধক করে উঠল বুকটা। অদ্ভুত কী যেন পড়ে আছে রাস্তায়। কাঁপা হাতে টর্চটা জ্বালতেই আতংকে একেবারে জমে গেলাম। গায়ের সবগুলো রোম দাঁড়িয়ে পড়ল সড়সড় করে। একটা লাশ! ক্ষত-বিক্ষত-রক্তাক্ত!

এটাকে মানুষের লাশ ভাবতে বেশ কষ্ট হলো। মৃতদেহটার এমন কোন স্থান নেই যেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়নি। ধারাল অস্ত্র দিয়ে নিখুঁতভাবে কেটে বের করা হয়েছে নাড়ি-ভুঁড়ি। একটা হাত

এবং পা নেই। যে দুটি আছে তাও অক্ষত নয়। কুচি কুচি করে কাটা অঙ্গ দুটো কোন রকমে লেগে আছে দেহের সাথে। মাথার অংশটাও গুঁড়ো গুঁড়ো। হলুদ মগজ, লাল রক্ত-কালো চুলের মিশ্রণে তৈরি একদলা কাদা যেন! চোখহীন কোটর আর দাঁতহীন থেঁতলে যাওয়া মুখ আরও ভয়ংকর করে তুলেছে লাশটাকে।

বিস্ফারিত চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে সম্মোহিতের মত কতক্ষণ যে তাকিয়েছিলাম লাশটির দিকে বলতে পারব না। একসময় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে দৌড়ুতে শুরু করলাম। কোন্‌দিকে কোথায় যাচ্ছি কিছুই জানি না। তবে অবচেতন মন ঠিকই সঠিক জায়গায় নিয়ে গেল।

থানার ইন্সপেক্টর যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'শফিক সাহেব, আপনার কী হয়েছে? আমাকে খুলে বলুন, প্লীজ।'

তখনও পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ হতে পারিনি। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনরকমে দুঃস্বপ্নকে হার মানানো বীভৎস দৃশ্যটার কথা খুলে বললাম।

সব শুনে চিন্তার ভাঁজ পড়ল ইন্সপেক্টরের কপালে। বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যেতে সাব ইন্সপেক্টরকে আদেশ করলেন। তারপর আমার উদ্দেশে বললেন, 'শফিক সাহেব, এরকম হত্যাকাণ্ডের খবর নতুন নয়। গত দুদিনে আরও তিনটি লাশের সন্ধান আমরা পেয়েছি। একটা শিশুর, একটা কিশোরের আর অন্যটা এক যুবকের। প্রতিটি লাশেই পাওয়া গেছে অমানবিক নির্যাতনের ছাপ। সত্যি বলতে কি, এসব খুন কারা করছে, খুনের মোটিভই বা কি—এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও করতে পারছি না আমরা। যাক, এ নিয়ে আপনার সাথে পরে আলাপ করব। বাড়ি যান। একা একা যেতে না পারলে একজন সেন্ট্রিকে সাথে দিচ্ছি।'

রাজি হয়ে গেলাম।

বাড়ি ফিরলাম ঠিক, কিন্তু ঘোরটা কিছুতেই কাটল না। ঘুমের

মধ্যে ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম বারবার। সকালে স্ত্রী বলল রাতে বেশ কয়েকবার নাকি আমার কণ্ঠ চিরে আর্তচিৎকারও বের হয়ে এসেছে।

দুই

আজ আর দোকানে বসতে ইচ্ছে হলো না। এগারোটার দিকে থানার পথ ধরলাম। গলির ভেতর ঢুকতেই পাল্লায় পড়লাম একদল বিকলাঙ্গ মানুষের। কী কুৎসিত, ভয়ংকর তাদের চেহারা! একেকজন অন্ধকার নরক থেকে উঠে এসেছে যেন!

গত তিন-চারদিন ধরেই বিকলাঙ্গদের বেশ উৎপাত চলছে। হঠাৎ করে সবাই দল বেঁধে হাজির হয়েছে এ শহরে। রাতদিন শহরের প্রতিটি গলিতে, রাস্তায়, স্ট্যান্ডে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা।

আমার বাঁয়ে যে বিকলাঙ্গটি 'একগা টাকা দেন, টাকা দেন' বলে চিৎকার করছে তার মাথা দুটি। গালে বিশাল একটি গর্ত। মাড়িসহ দাঁত, সাদা হাড়—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওই গর্ত দিয়ে। ডান পাশের বিকলাঙ্গ মানুষটার হাত দুটো শুকিয়ে রশির মত ঝুলে আছে। ইয়া বড় কানটা নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত। একটা কোটর শূন্য। একমাত্র চোখটাতে শীতল দৃষ্টি। এরকম অনেক বিকলাঙ্গ মানুষ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। প্রায় প্রত্যেকের চেহারাই হরর ছবির পিশাচকেও হার মানাবে নিশ্চিত।

একটা ব্যাপার কিন্তু বেশ অবাক করল আমাকে। আগে যেসব বিকলাঙ্গ মানুষ চোখে পড়ত তারা প্রায় সবাই-ই ছিল নিরীহ প্রকৃতির, চোখে থাকত করুণ দৃষ্টি। কিন্তু নতুন আসা বিকলাঙ্গদের মধ্যে কেমন যেন হিংস্র একটা ভাব দেখা যাচ্ছে।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই থানায় পৌঁছে গেলাম।

অফিসেই আছেন ইন্সপেক্টর সাহেব। আমাকে দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। বললেন, 'আসুন, আসুন, শফিক সাহেব। মনে মনে আপনাকেই চাইছিলাম।'

ইন্সপেক্টরের কথার ধরন দেখেই বুঝে গেছি–রহস্যময় খুনগুলোর কেসটা আমার ঘাড়ে চাপাবার মতলব এঁটেছেন। বেশ কয়েকবারই ইন্সপেক্টরকে বিভিন্ন জটিল রহস্যের সমাধানে সাহায্য করেছি। তাছাড়া অল্প হলেও শখের গোয়েন্দা হিসেবে সুখ্যাতি আছে আমার। চেয়ারে বসতে বসতে তাই মৃদু হেসে বললাম, 'তাই নাকি? সৌভাগ্য আমার। বলুন, কেন চাইছিলেন।'

'আপনি চালাক মানুষ,' সিগারেটের প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর সকৌতুকে বললেন। 'আশা করি আমার উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝে ফেলেছেন। কি, রাজি?'

'রাজি তো অবশ্যই,' সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বললাম। 'এমন একটা রহস্য হাতের কাছে পেয়েও দূরে থাকব, এমন বোকা তো আমি নই। অতএব, সবকিছু খুলে বলতে পারেন।'

ইন্সপেক্টর নিজের জন্যও একটা সিগারেট ধরালেন। ওটাতে লম্বা একটা টান দিয়ে, নাকমুখ দিয়ে ভুস ভুস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'গত তিনদিনে সাত জন মানুষ নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। প্রতিটি লাশের দিকে তাকালেই এটা বোঝা গেছে–অসহনীয় কষ্ট পেয়ে মারা গেছে তারা। সাথে এটাও স্পষ্ট হয়–খুনীরা কত ভয়ংকর পিশাচ! প্রথমদিন একজন, দ্বিতীয়দিন দুইজন এবং তৃতীয়দিন মানে গতকাল চারজনের লাশ পাওয়া গেছে। বুঝতেই পারছেন–ক্রমশ বাড়ছে খুনের সংখ্যা। অথচ আমরা খুনীকে ধরব দূরে থাক, ছোট্ট কোনও সূত্রও পাচ্ছি না।' থেমে, কিছুক্ষণ ভেবে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ভুল বললাম, শফিক সাহেব, একটা সূত্র অবশ্য পেয়েছি। তবে সূত্রটা পেয়েছি না বলে খুনীরাই দিয়েছে বলা উচিত।'

'কী সেটা?' সাগ্রহে জানতে চাইলাম।

'একটুকরো কাগজ।' ইন্সপেক্টর একটা সুখটান দিয়ে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে রেখে দিলেন। 'পাওয়া গেছে প্রতিটি লাশের পাশেই। তাতে মাত্র চারটি শব্দ–আমরা সুন্দরকে ঘৃণা করি। এটা থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট–খুনী একজন নয়, একাধিক। বড় দলও হতে পারে।'

রহস্যময় বাক্যটা আমার ভাবনাকে দ্রুত অন্যদিকে প্রবাহিত করল। জানতে চাইলাম, 'এ পর্যন্ত যারা খুন হয়েছে তাদের সবার স্বাভাবিক ছবি কি আপনার কাছে আছে?'

ইন্সপেক্টর কোন কথা না বলে ড্রয়ার থেকে বেশ কিছু ছবি বের করে আমার হাতে দিলেন। ছবিগুলোর দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়েই একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, প্রতিটি মানুষের চেহারাই সুন্দর।

'এদের প্রায় সবাই বাজার থেকে নিখোঁজ হয়েছে। শুধু শিশু এবং কিশোরী দুজন বাড়ি থেকে।' নীরবতা ভেঙে ইন্সপেক্টর বললেন। 'তদন্তের অগ্রগতি খুবই লজ্জাজনক, শফিক সাহেব। আচ্ছা, আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন?'

'ভাবতে হবে, ইন্সপেক্টর সাহেব,' চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে বললাম। 'শান্ত মনে ভেবে দেখি কিছু বের করতে পারি কিনা। এখন তাহলে আসি?'

'আসুন, শফিক সাহেব। আপনার উপর কিন্তু ভরসা রাখছি।' ইন্সপেক্টর আন্তরিকতার সাথে কথাগুলো বলে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। আমি মৃদু একটি হাসির মাধ্যমে তাকে আশ্বাস দিয়ে থানা থেকে বের হয়ে এলাম।

তিন

মাথার ভেতরটায় কেমন যেন জ্যাম হয়ে আছে। খোলা বাতাসে কিছুটা পরিষ্কার হবে হয়তো। কেসটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হলে নির্জন স্থানেরও প্রয়োজন। হাঁটতে হাঁটতে তাই পার্কে ঢুকে পড়লাম। ভরদুপুর বলে পার্কটা একদম খালি। কোথাও জন-মনুষ্যির চিহ্নও নেই। একটা বেঞ্চে গা'টা এলিয়ে দিয়ে আরাম করে বসে ব্যস্ত করে তুললাম মাথাটাকে।

সুন্দরের প্রতি তীব্র ঘৃণা থেকেই যে খুনীরা ভয়ংকরভাবে, পৈশাচিক কায়দায় খুনগুলো করছে এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। খুনী যারাই হোক তারা যে খুব দুঃসাহসী, এটাও স্পষ্ট। দুঃসাহসিক বলেই লাশ গুম করার চেষ্টা করছে না। উপরন্তু প্রকাশ্যে ফেলে রেখে সবাইকে একহাত নিচ্ছে। মনে জাগিয়ে তুলছে প্রচণ্ড আতংক। মানুষকে আতংকিত হতে দেখে ওরা প্রচুর আনন্দ পাচ্ছে বোধহয়। এ থেকে বোঝা যায়–খুনীরা সুস্থ মস্তিষ্কের নয়। নিশ্চয়ই বিকৃত মানসিকতার অধিকারী তারা। কোন সুস্থ মানুষ–সুন্দরকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করতে পারে না।

যদি তাই হয়, তবে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ পড়ে পাগলদের উপর। কিন্তু পাগলদের পক্ষে তো এমন নিখুঁত হত্যাকাণ্ড ঘটানো সম্ভব নয়। করলে ভূরি ভূরি ভুল করে ফেলত তারা। অথচ দেখা যাচ্ছে–খুনীরা অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার সাথে খুন করছে, পেছনে কোন সূত্র না রেখেই। অতএব সন্দেহের তালিকা থেকে পাগলদের বাদ দিতেই হয়। শহরের মাস্তান-সন্ত্রাসীদের সন্দেহ করা যায়। কিন্তু তারাই বা হঠাৎ সুন্দরকে এত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে কেন? নাহ, কিছুই মিলছে না।

'একটা টাকা দিবেন, সাব, একটা টাকা?' আচমকা বিকৃত একটা কণ্ঠ আমাকে ভাবনার জগৎ থেকে তুলে আনল। সামনে তাকাতেই কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা। ভয়ানক কুৎসিত একটা বিকলাঙ্গ মানুষ ভিক্ষা চাইছে। মানুষটার পা বেঁকে আছে অদ্ভুতভাবে। বিশাল দুটো টিউমার গলাটাকে ঢেকে ফেলেছে পুরোপুরি। ভাল বলতে শুধু হাত দুটো–যার একটা বাড়িয়ে রেখেছে আমার দিকে।

হঠাৎ মাথায় রাগ চড়ে গেল। 'যা ভাগ এখান থেকে' বলে ধমকে উঠলাম।

আমার ধমকে লোকটা ভয় তো পেলই না বরং চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠল প্রচণ্ড আক্রোশে। সে কাটাছেঁড়া ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে চলে গেল ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে।

লোকটা চলে যাওয়ার পর বেশ খারাপই লাগল। নিজেকে শাসালাম–অসহায় মানুষটাকে এভাবে ধমক না দিলেও পারতে। অপরাধবোধটা আমাকে পার্কের বাইরে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু মানুষটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন!

চার

আরও দুটো দিন কেটে গেছে। কেসটা নিয়ে যে তিমিরে ছিলাম এখনও সেখানেই আছি। আমার দ্বারা যেমন কিছু হচ্ছে না তেমনি কিছু করতে পারছে না পুলিসও। অথচ খুনীদের তৎপরতা বাড়ছে। গত দুদিনে আরও দশজন হতভাগ্য মানুষ শিকার হয়েছে নির্মম মৃত্যুর। ভয়ে শহরের মানুষ হাসতে ভুলে গেছে। সবাই কেমন যেন গম্ভীর, বিচলিত, হতাশ।

দুপুরে ছাদে বসে এসব ভাবছিলাম, এসময় আমার স্ত্রী মিনু

এসে বলল, ‘এই, তোমার একটা চিঠি এসেছে।’

‘কে পাঠিয়েছে?’ ম্লানকণ্ঠে জানতে চাইলাম।

‘ময়মনসিংহ থেকে সোহেল,’ বলে মিনু চিঠিটা আমার হাতে দিল। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ছি। হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল সোহেলের কিছু কথা। প্রায় বছরখানেক আগে সোহেল একটা চিঠিতে লিখেছিল–ওদের শহরে নাকি হঠাৎ করে অসংখ্য বিকলাঙ্গ মানুষ এসে হাজির হয়েছে। এর পরের চিঠিতে লিখেছিল–নির্মমভাবে খুন হচ্ছে মানুষ। কে বা কার এই হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে পুলিস বুঝতেই পারছে না। ব্যাপারটা কি কাকতালীয়?

ময়মনসিংহে বিকলাঙ্গরা উপস্থিত হওয়ার পর পরই খুন হয়েছিল মানুষ। এখানেও ঘটছে ঠিক তাই। নাহ, এটা কিছুতেই কাকতালীয় হতে পারে না। কুৎসিত বিকলাঙ্গ মানুষরাই সুন্দর মানুষগুলোকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করবে–এটা তো দিবালোকের মতই স্পষ্ট। ধুত, এত সহজ সমাধানটা আরও আগে মাথায় আসা উচিত ছিল। তাহলে অকালে ঝরে পড়তে হত না ফুলের মত সুন্দর মানুষগুলোকে। রাগে নিজের মাথার চুল নিজেই ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো আমার।

আর দেরি না করে দ্রুত কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকগুলোই খুনী–প্রথমে এ সন্দেহের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ চাই। তারপর পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

শহরের মধ্যে আস্তানা গেড়েছে বিকলাঙ্গ মানুষেরা। মাঝারি ধরনের একটা কুঁড়ে ঘরে সবাই গাদাগাদি করে থাকে। এখন বিকেল। ওরা সবাই ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। ঘরের পাহারায় আছে মাস্তান টাইপের একটা ছেলে।

বড় কয়েকটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নজর রাখছি ছেলেটির উপর। সম্পূর্ণ কুঁড়েটা খুঁজতে হবে আমাকে। প্রমাণের জন্য এটা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আজ আমার ভাগ্যটা সত্যিই

সুপ্রসন্ন। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ছেলেটা প্রকৃতির ডাকে বেশ দূরের একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসল। এই সুযোগে টুক করে ঢুকে পড়লাম কুঁড়ের ভিতর।

আলো আঁধারির খেলা কুঁড়ের মধ্যে। আসবাবপত্রের ছায়াও নেই কোথাও। এককোণে কেবল কয়েকটি বাক্স পড়ে আছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে একটা বাক্সের ঢাকনা তুললাম। ছ্যাঁত করে উঠল বুকের ভিতরটায়। গলা শুকিয়ে মুহূর্তে কাঠ। অসংখ্য ধারাল অস্ত্রে বাক্সটা ভর্তি। নিজেকে সামলে নিয়ে খুললাম আরেকটি বাক্স। বাক্সের ভিতরের জিনিসগুলো যে কি প্রথমে বুঝতেই পারলাম না। বুঝতেই থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো শরীর।

শত শত শুকনো চোখ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে যেন। কোটর থেকে তুলে আনা চোখ যে এত ভয়াল, কুশ্রী হতে পারে–তা ছিল আমার ধারণার বাইরে। শুকনো চোখগুলো আমাকে এতই আতংকিত করে তুলল যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাগলের মত একটার পর একটা বাক্সের ঢাকনা উল্টাতে লাগলাম। বাক্সগুলোর কোনটাতে শুকনো হাত, কোনটাতে হৃৎপিণ্ড, কান ইত্যাদি। বুঝতে অসুবিধা হলো না–শয়তানগুলো এ পর্যন্ত যত মানুষকে হত্যা করেছে–তার সবগুলো থেকে একটা-দুটো অঙ্গ রেখে দিয়েছে স্যুভেনির হিসেবে।

অনেকক্ষণ মিশ্র একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রাখল আমাকে। হঠাৎ মাথার উপর একটা লাঠি নেমে আসতে দেখে সম্বিত ফিরে পেলাম। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পাহারাদার ছেলেটা প্রচণ্ড আঘাতে থেঁতলে দিল মাথার একটি অংশ। সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে হৃৎপিণ্ডভরা বাক্সটার উপর লুটিয়ে পড়লাম।

পাঁচ

পুরোপুরি চেতনা যখন ফিরে এল তখন নিজেকে দুটো গাছের মধ্যে পেরেক দিয়ে গাঁথা অবস্থায় দেখতে পেলাম। দুই হাত এবং পায়ের তালুতে চারটি পেরেক। হাত-পা থেকে রক্ত পড়ে নিচে সৃষ্টি হয়েছে ছোটখাট পুকুরের। শরীরের প্রতিটি কোষে অনুভব করলাম অসহ্য ব্যথার হিংস্র শিহরণ।

আকাশে রূপালী চাঁদ। চারদিকে ফুটফুটে জোছনার স্নিগ্ধতা। এই অসীম সুন্দরের মাঝে সামনে দাঁড়ানো কুৎসিত বিকলাঙ্গ মানুষগুলোকে আরও কুৎসিত লাগছে। ওরা সবাই আগুনের কুণ্ডলীকে ঘিরে মেতে উঠেছে রীতিমত উৎসবে। মানুষখেকো জংলীদের মত চোখে-মুখে তাদের নারকীয় আনন্দের ঝিলিক, উল্লাস! আর এদিকে পিশাচগুলোর বর্বরতার কথা স্মরণ করে আমিসহ আর ছয়জন বন্দি শিউরে উঠছি আতংকে। এ মুহূর্তে ওরা বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী যেন আলাপ করছে। হয়তো আমাকে দিয়েই শুরু হবে শয়তানগুলোর আজ রাতের পৈশাচিকতা!

যা ভেবেছি, ঠিক তাই। ওই তো একটা বিকলাঙ্গ মানুষ এগিয়ে আসছে হাতে চোখা একটি শিক নিয়ে। কাছে এসে লোকটা আমার চোখের দিকে শিকটা বাগিয়ে ধরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তোদের এই চোখই তো আমাদের দেখতে পারে না, ঘৃণা করে, ব্যঙ্গ করে। এবার মজা বোঝ!'

ভয়ংকর একটা হাসি হেসে আমার ডান চোখে সে শিকটা সরাসরি ঢুকিয়ে দিল। অবর্ণনীয় কষ্টে হাঁসফাঁস করে উঠল প্রাণটা। ব্যথার তীব্র ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়তে লাগল সারা দেহে। শয়তানটা শুধু শিক ঢুকিয়েই থেমে থাকেনি, কিছুক্ষণ

নাড়িয়ে বের করে আনল মণিটা। বিস্ফারিত অন্য চোখ দিয়ে এইমাত্র তুলে ফেলা চোখটা ফ্যালফ্যাল করে দেখছি আমি। ওই রক্তাক্ত চোখটা আমার? যেটা নিয়ে এখন ওরা লোফালুফি করছে আদিম উল্লাসে? শূন্য কোটর থেকে গলগল করে টাটকা রক্ত বেরিয়ে আসতেই কেবল ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হলো নিজের কাছে।

পার্কে যে বিকলাঙ্গ লোকটাকে ধমক দিয়ে ভাগিয়েছিলাম সেই টিউমারওয়ালাটা এগিয়ে এল এবার। পাহারাদার ছেলেটা তাকে উপরে তুলে ধরল। হাতের চকচকে ছুরিটা নাড়তে নাড়তে সে বিকৃত কণ্ঠে বলল, 'তোর জিহ্বাটা কাটব আমি! হেঃ হেঃ হেঃ। ওটা দিয়েই তো ধমক দিস আমাদের।'

আমি কিছু বুঝে উঠার আগেই লোকটা এক হাত দিয়ে আমার জিহ্বাটা টেনে বের করে–ঘ্যাঁচ করে প্রায় অর্ধেকটা কেটে নিয়ে নিজের মুখে পুরে কচকচ করে চিবোতে লাগল।

দৃশ্যটা দেখে এত কষ্টের মাঝেও এসে গেল মুখভর্তি বমি। রক্তের সাথে একাকার হয়ে তা ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ল থুতনি বেয়ে।

এবার যে এগিয়ে এল তার হাতে ধারাল একটা করাত। 'এই হাত দিয়েই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিস আমাদের।' বলেই মানুষটা করাত দিয়ে আমার বাম হাতটি কাটতে শুরু করল। মাংস কাটার প্যাচ প্যাচ শব্দ শেষ হতেই পাওয়া গেল হাড্ডি কাটার শব্দ। বেশিক্ষণ লাগল না শরীর থেকে হাতটা আলাদা করতে। তারপর সে একটা পা, একটা কান কাটল। এতে শরীরটা বেশ কিছুটা হেলে পড়ল আমার। অমানুষিক কষ্টে ঠোঁট কামড়ে ধরেছি দাঁত দিয়ে। একমাত্র চোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা। কাটা স্থান দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে অবিরাম।

অনেকক্ষণ আর কেউ এল না। ভাবলাম এখানে বোধহয় ইতি টানবে পিশাচগুলো। কিন্তু আমার ভাবনা ভুল প্রমাণ করে দিয়ে

সবচেয়ে লম্বা, টিঙটিঙে বিকলাঙ্গটা এগিয়ে এল। বেঁকে যাওয়া হাতে একটা হাতুড়ি। 'সুন্দর মুখের জন্য অহংকার করিস তোরা। এবার দ্যাখ, সুন্দরের কী অবস্থা করি।' বলে লম্বুটা প্রচণ্ডবেগে আমার মুখে হাতুড়িটা নামিয়ে আনল। একবার, দুইবার, তিনবার—অসংখ্যবার।

হাতুড়ির আঘাতে ঝরে পড়ল সবগুলো দাঁত। গাল, নাক, ঠোঁট থেঁতলে সমান হয়ে গেল প্রায়।

ক্রমে ঝাঁপসা হয়ে আসছে পৃথিবীটা। মনে মনে কামনা করছি এই নারকীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই, মুক্তি চাই আমি!

পরিশেষে যে এল, সে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে ঠিক, কিন্তু মুক্তি দিল যাবতীয় যন্ত্রণা থেকে। ধারাল কাঁচি দিয়ে মাথার খুলিটা কাটতেই মগজে যেন আগুন ধরে গেল। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল থ্যাঁতলানো নাক দিয়ে। সাথে সাথে নিকষ আঁধারে ঢেকে গেল পৃথিবীটা। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি নাকি জ্ঞান হারাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ছয়

কতদিন চৈতন্যহীন ছিলাম জানি না। একসময় এলাম চেতনার মাঝামাঝি স্তরে। এ অবস্থায় ডাক্তারদের কণ্ঠ থেকে যেসব কথাবার্তা শুনেছি তা একত্র করলে দাঁড়ায়—মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এসেছি আমি। খুনীরা মরে গেছি ভেবে ফেলে রেখেছিল রাস্তায়। সেখান থেকে এনে হাসপাতলে ভর্তি করা হয়। পাঁচ-পাঁচটি মাস দেশের বড় বড় ডাক্তারদের চিকিৎসার ফলে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠেছি। ডাক্তাররা তো বিস্ময়ে হতবাক। তাঁদের ধারণা ছিল—এই অবস্থা থেকে কেউ বেঁচে উঠতে পারে না। অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে উঠছি আমি।

পুরোপুরি জ্ঞান ফেরার পর বিস্মিত হলাম আমি নিজেও। কিভাবে যে বেঁচে উঠলাম! বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুঃস্বপ্নকে হার মানানো ভয়াল দৃশ্যগুলো। জিভ নেই, কথা বলতে পারি না। একমাত্র হাত দিয়ে পুলিশকে লিখে জানালাম সব। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিকলাঙ্গ মানুষগুলো দল ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। মিশে গেছে অন্যান্য বিকলাঙ্গদের মাঝে। শত চেষ্টা করেও পুলিশ তাদের টিকিটিও ছুঁতে পারছে না।

একসময় ডাক্তাররা বাসায় পাঠিয়ে দিল আমাকে। বিছানায় উঠে বসার মত শক্তি অর্জন করলাম আরও কিছুদিন পরে।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরে কাউকে দেখতে পেলাম না। কোন রকমে শরীরটাকে নিয়ে উঠে বসলাম বিছানার উপর। দৃষ্টি গেল খাটের পাশে ঝুলানো আয়নার দিকে। সাথে সাথে বিদ্যুতের শক খেলাম যেন। কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি নিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। যে মুখটা আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে তা কি আমার? এ যে অন্ধকার নরক থেকে উঠে আসা ভয়ংকর এক পিশাচের মুখ। পৃথিবীর সবচেয়ে কদাকার মুখ। এ মুখ আমার হতে পারে না, কিছুতেই না!

বেশ সময় লাগল কঠিন বাস্তবকে মেনে নিতে। আয়না থেকে দৃষ্টিটা সরে একগুচ্ছ টকটকে লাল, তাজা গোলাপের উপর গিয়ে পড়ল। বিষিয়ে ওঠা মনটাকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। হাত দিয়ে সুন্দর ফুলগুলোকে কচলে একদলা কাদার মত করে ফেললাম। এতে মন শান্ত হলো কিছুটা।

এসময় ঘরে ঢুকল আমার একমাত্র ছেলে সিন্ধু। সবেমাত্র আড়াই বছরে পা দেয়া সিন্ধুর গোলগাল মুখটা ভারী সুন্দর। শরীরটাও বেশ তরতাজা, নাদুস-নুদুস। সে ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল 'এই, কে তুমি? তুমি কি ভূত?'

রক্তটা আবারও চড়ে গেল মাথায়। নিশপিশ করে উঠল হাতটা। 'আমি? আমি জান্তব বিভীষিকা! সুন্দরকে ঘৃণা করাই হবে এখন আমার একমাত্র কাজ। আমি সুন্দরকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি!' মনে মনে কথাগুলো বলে সিন্ধুর গলাটা মুঠো করে ধরলাম। তারপর চাপ দিলাম শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে। দম আটকানো কষ্টে, আতংকে সিন্ধুর অপরূপ সুন্দর চোখ দুটো কোটর থেকে বের হয়ে আসতে চাইল। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে নেমে এল লাল রক্ত।

সিন্ধুর ছোট্ট শরীরটা নিস্তেজ হতে বেশি সময় লাগল না। ওকে গলা টিপে হত্যা করেও ঘৃণাটা গেল না পুরোপুরি। এবার লাশটাকে সজোরে মেঝেতে আছড়াতে লাগলাম। সিন্ধুর হাড় ভাঙার মড়মড় শব্দ বড় সুমধুর লাগল কানে। থেতলানো মাংস, হলুদ মগজ–দেখে মনে বয়ে গেল আনন্দের বন্যা। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল তৃপ্তির ঢেকুর, মুখে ফুটল ভয়ংকর কুৎসিত একটা হাসি।

মিজানুর রহমান মিজান

ভ্যাম্পায়ার

স্টীমারটা কন্সট্যান্টিনোপল থেকে ছাড়ে, ঘুরিয়ে দেখায় আশেপাশের দ্বীপগুলো। সেবার বেড়াতে বের হয়ে ওই স্টীমারেই চেপে বসলাম আমি। স্টীমার আমাদের নিয়ে এলো প্রিঙ্কি-পো দ্বীপে। সেটা ঠিক বেড়াবার মরসুম নয়, কাজেই ট্যুরিস্টদের তেমন ভীড় নেই। যাত্রীদের মধ্যে ছিল একটা পোলিশ পরিবার। চারজন এসেছে তারা। স্বামী-স্ত্রী, তাদের মেয়ে এবং মেয়ে-জামাই। গোল্ডেন হর্ন ছাড়িয়ে কন্সট্যান্টিনোপল যাবার সময় জাহাজে উঠল এক গ্রীক যুবক। তাকে নিয়ে স্টীমারের আরোহী হলাম আমরা ছয়জন।

এখানে গ্রীক যুবকের বর্ণনা না দিয়ে পারছি না। কাঁধের ওপর নেমে এসেছে তার দীর্ঘ চুল। মুখটা মড়ার মতো ফ্যাকাসে, কালো চোখ দুটো কুতকুতে, কোটরে বসানো। হাতে একটা পোর্টফোলিয়ো ব্যাগ। হাবভাব দেখে শিল্পী বলে মনে হয়।

এলাকাটা সে ভাল চেনে। নতুন যারা এসেছে তাদের কোথায় কোথায় দর্শনীয় জিনিস দেখতে যাওয়া দরকার সে-ব্যাপারে পরামর্শ দেয় সুযোগ পেলেই। প্রথমে এ কারণে তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালই লাগছিল, কিন্তু একটুক্ষণ আলাপের পরই বুঝলাম, বড় বেশি বাচাল এই গ্রীক যুবক। ফালতু বকবকানি আমার মোটেই সহ্য হয় না, ফলে তার কাছ থেকে সাধ্যমতো দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগলাম আমি।

পোলিশ পরিবারটি অত্যন্ত ভদ্র এবং রুচিবান। দুঃখীও

বোধহয়। যুবতী মেয়েটি সুস্থ নয়। দেখে মনে হয় কোন কঠিন রোগ থেকে উঠেছে, অথবা কোন কঠিন রোগ তার দেহে বাসা বেঁধেছে। শুনলাম ডাক্তার নাকি তাকে হাওয়া বদল করার পরামর্শ দিয়েছেন। সে কারণেই সুদূর পোল্যান্ড থেকে প্রিঙ্কি-পো দ্বীপে এসেছে পরিবারটি।

যুবতী অত্যন্ত দুর্বল। সামান্য হাঁটলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন স্বামীর শরীরে ভর দেয় সে। মাঝে মাঝেই বসে পড়ে অবসন্ন হয়ে। খানিক বিশ্রাম না নিয়ে আর নড়তে পারে না। এমন সময়গুলোতে ওর যুবক স্বামী তাকায় ওর দিকে, দৃষ্টিতে ঝরে গভীর আন্তরিক সহানুভূতি আর সমবেদনা। খানিক সুস্থ হলে যুবতী তাকায় যুবকের চোখে, নীরব চোখের ভাষায় যেন বলে, আমার জন্যে ভেবো না। কিচ্ছু হয়নি আমার। তুমি পাশে আছো, আর আমার চিন্তা কি! ভাল হয়ে যাব আমি।

দ্বীপে পৌঁছানোর আগেই হোটেলের খোঁজ নিয়েছিলাম গ্রীক যুবকের কাছে। বেশ কয়েকটা হোটেল আছে প্রিঙ্কি-পো দ্বীপে। একটা হোটেলের কথা বারবার করে বলল যুবক। তার কথায় সেখানেই ঘর নিলাম। হোটেলটা পাহাড়ের ওপর। চমৎকার পরিবেশ। মালিক ফরাসি। ফরাসি রুচি অনুযায়ী সাজিয়েছে হোটেল। অত্যন্ত রুচিসম্মত।

দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম হোটেলেই। বাইরে যেন আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য। চারদিক উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। বুঝলাম এখন বিশ্রাম নিতে হবে। রোদের তাপ একটু না কমলে বেড়াতে বের হওয়া ঠিক হবে না।

বিকেলে সূর্য হেলে পড়তেই তাপ কমে গেল। হোটেল থেকে বের হলাম। পোলিশ পরিবারটাও এই একই হোটেলে উঠেছে। তারাও আমার সঙ্গে যোগ দিল। অল্প সময়ের আলাপেই পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল আমার। পাহাড়ে উঠলাম আমরা। ওপরের দিকে পাইন গাছের অগভীর সবুজ অরণ্য।

সেখানেই গাছের নিচে বসলাম আমরা। অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মনটা প্রশান্ত হয়ে গেল। দু'চোখ ভরে চারপাশটা দেখলাম। মনে হলো যেন পৃথিবীতে নয়, বেহেস্তে চলে এসেছি।

একটু পর এলো সেই গ্রীক যুবক। আমাদের কাছে এসে অভিবাদন জানাল, তারপর সামান্য দূরে গিয়ে বসল। আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসেছে। হাতে পেন্সিল, সামনে কাগজ। বুঝলাম ছবি আঁকছে।

'ছবি যাতে দেখতে না পাই সেজন্যেই পিছু ফিরে বসেছে,' নিচু স্বরে মন্তব্য করলাম আমি।

'চারপাশের দৃশ্য এতো সুন্দর যে ওর আঁকা ছবি আমাদের না দেখলেও চলবে,' বলল পোলিশ যুবক।

'তা ঠিক,' সায় দিলাম আমি।

'গ্রীক শিল্পী বোধহয় আমাদের ছবিই আঁকছে,' খানিক পর বলল পোলিশ যুবক।

আমি কিছু বললাম না। দু'চোখ ভরে চারপাশ দেখছি। এতো অপূর্ব দৃশ্য যে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এ সৌন্দর্যের বুঝি কোন তুলনাই হয় না। চিত্রকর আমাদের ছবি আঁকলে ভালই করছে। কোন চিত্রকরের সাধ্য নেই তুলির আঁচড়ে এ সৌন্দর্যকে প্রকৃত ভাবে ফুটিয়ে তোলে।

সম্রাট চার্লসের সমসাময়িক প্রাক্তন রোম সম্রাজ্ঞী আইরিনকে নির্বাসন দণ্ড দেয়া হয়েছিল। সেসময় তাঁকে এক মাস এই প্রিঙ্কি-পো দ্বীপে থাকতে হয়েছিল। আমার মনে হলো আমিও যদি এখানে একমাস থাকতে পারতাম তাহলে জীবনে কোনদিন দ্বীপটার সৌন্দর্যের কথা ভুলতে পারতাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হৃদয়টা আমার জুড়িয়ে দিয়েছে দ্বীপের অসাধারণ প্রাকৃতিক রূপ।

চমৎকার বাতাস বইছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন আদর করে আলতো ভাবে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শরীরে। মন উদাস করে দেয়া

একটা পরিবেশ। কঠিন বাস্তব যেন এখানে কল্পনার কাছে পরাজিত। মনটা দূর থেকে দূরে হারিয়ে যেতে চায়।

ডানদিকে গাঢ় নীল সমুদ্র। সমুদ্রের ওপারে আবছা ভাবে দেখা যায় এশিয়া মাইনরের বাদামী পাহাড়-চুড়ো। বাঁদিকে ইউরোপের লালচে সৈকত। কাছে দূরে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চাল্কী দ্বীপটাকে। সাইপ্রাস গাছ ঘিরে রেখেছে ওটাকে। গাছগুলো মৃত্যু এবং শোকের প্রতীক। দ্বীপটার দিকে তাকালে মনটা কেমন যেন বিষাদে ছেয়ে যায়। হৃদয় তন্ত্রীতে বেজে ওঠে করুণ সুর।

নীল সাগর শান্ত। মৃদু মৃদু ঢেউয়ের দোলা তাতে। অবশ্য পাহাড়ের ওপর থেকে দেখলে মনে হয় ঢেউই নেই। বিকেলের রোদে সাগরের পানিতে নানা রঙের খেলা। অনেক দূরে তাকালে পানির রং দেখতে লাগছে দুধের মতো সাদা। আরও একটু কাছে যেখানে সূর্যের আলো কাত হয়ে পড়ছে সেখানে পানির রং গোলাপী। আবার দুই দ্বীপের মাঝখানে সাগর কমলা রং গায়ে মেখেছে। কাছের সাগরের রং নীল মেশানো সবুজ। পাহাড়ের ওপর থেকে সাগরের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে হাজার হাজার দামী রত্ন দিয়ে ওটাকে সাজানো হয়েছে। ঝিলমিল করছে কতো রং!

সাগরে বড় কোন জাহাজ দেখলাম না। ছোট ছোট নৌকো আছে দুটো, তীরের কাছ দিয়ে পাল তুলে যাচ্ছে, যেন পেখম মেলা রাজহাঁস। মাঝিরা দাঁড়ও বাইছে। দাঁড় ওঠালেই ওগুলো থেকে পানি পড়ছে, দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে গলিত রুপো ঝরছে। উদাস মনে জানতে ইচ্ছে করে, কোথায় চলেছে মাঝিরা? কোন স্বপ্নলোক লক্ষ্য করে পাড়ি দিচ্ছে এই বিস্তৃত সাগর?

গাঢ় নীল মেঘশূন্য আকাশে উড়ছে ঈগল। এশিয়া আর ইউরোপের মাঝের সাগরের দূরত্ব তাদের কাছে অতি নগণ্য।

যেখানে আমরা বসেছি তার ঠিক নিচে পাহাড়ের পাদদেশে

গোলাপের বাগান। নানারঙের অসংখ্য গোলাপ ফুটেছে বাগানে। বাতাসে ফুলের সুগন্ধ ভাসছে। দূরে সাগর তীরে কফির দোকান। গান হচ্ছে সেখানে। বাতাসে ভেসে মৃদু আওয়াজ আসছে তার, হারিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

মানুষের মনের ওপর বোধহয় প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত জোরাল। চারপাশের এতো সুন্দরের মাঝে মনে হচ্ছে যেন পঙ্কিলতায় ভরা পৃথিবীতে আমরা আর নেই, চলে এসেছি স্বর্গে। তন্ময় হয়ে প্রকৃতির রূপসুধা পান করছি আমরা, কথা হচ্ছে না।

নরম ঘাসের গালিচায় শুয়ে আছে যুবতী। মাথা এলিয়ে দিয়েছে স্বামীর বুকের ওপর। বিকেলের নরম আলো এসে পড়েছে তার মুখে। খুব কোমল আর প্রশান্ত লাগছে যুবতীকে দেখতে। তার নীল চোখে টলটল করছে দু'ফোঁটা জল। যুবতীর মনের কথা যেন বুঝতে পারল ওর স্বামী। ঝুঁকে চুমু খেল প্রেয়সীকে।

যুবতীর মা'র চোখেও অশ্রুবিন্দু দেখলাম। আমার মনটাও কেমন বিষণ্ন, উদাস হয়ে গেল।

'দেখো,' মৃদু কণ্ঠে বলল যুবতী। 'এখানে থাকলে আমার অসুখ সেরে যাবে। বড় সুন্দর জায়গাটা।'

'ঈশ্বর জানেন আমার কোন শত্রু নেই,' কাঁপা গলায় বলল যুবতীর বাবা। 'পরম কোন শত্রু থাকলেও এখানে এসে তাকে ক্ষমা করতে পারতাম আমি।'

আবার নীরবতা নামল আমাদের মাঝে। কথা এখানে নিষ্প্রয়োজন। প্রগাঢ় শান্তি বজায় থাকুক।

গ্রীক যুবকের ছবি আঁকা বোধহয় শেষ হয়েছে। চলে গেল যুবক। আমরা এতোই তন্ময় হয়ে আছি যে ভাল মতো তাকে লক্ষ করলাম না।

অনেকক্ষণ আমরা ওখানেই চুপ করে বসে থাকলাম। তারপর অস্তগামী সূর্যটা দিগন্তে ডুব দিতে আঁধার ঘনাতে শুরু করল।

'ফিরতে হয়,' মৃদু স্বরে বললেন যুবতীর মা।

উঠলাম আমরা। সত্যি ফিরতে হয়। আঁধারে অসুস্থ দুর্বল যুবতীকে নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে সমস্যা হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে গেলাম আমরা। ঘরে কারও মন টিকল না। দোতলার ঝুল বারান্দায় এসে বসলাম সবাই।

নিচ থেকে ভেসে এলো তর্কাতর্কি আর ঝগড়ার আওয়াজ। রেলিঙে হাত রেখে দেখলাম হোটেলমালিক আর সেই গ্রীক যুবকের মধ্যে লেগে গেছে। দু'জনই ক্ষিপ্ত। হোটেলমালিক চিৎকার করে বলল, 'আমার এখানে সম্ভ্রান্ত অতিথিরা আছেন, তা নাহলে তোমাকে দেখে নিতাম আমি। তোমাদের মতো লোকদের কি ভাবে টিট করতে হয় সেটা আমার ভাল করেই জানা আছে।'

উত্তরে গ্রীক যুবক কি যেন বলল, বুঝতে পারলাম না। দুপদাপ পা ফেলে হোটেলমালিক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো। বারান্দায় আমাদের দেখে এগিয়ে এলো সে। মাথা নিচু করে বাউ করল বিনয়ের সঙ্গে।

'ওই যুবক কে?' জিজ্ঞেস করল পোলিশ যুবক।

নাক কুঁচকাল হোটেলমালিক। 'কেউ জানে না ছন্নছাড়া লোকটা কোন্ জাহান্নাম থেকে এসেছে। ওর নামও জানি না।'

'তাহলে ওকে চেনেন না?' আবার জিজ্ঞেস করল পোলিশ যুবক।

'তা চিনি। ভাল করে চিনি। নাম না জানলেও চিনি। আমরা ওকে বলি রক্তচোষা।' যুবক শিল্পী যেখানে ছিল সেদিকে কড়া চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল হোটেলমালিক।

'রক্তচোষা?' একটু কেঁপে গেল যুবকের গলা।

'হ্যাঁ।'

'শিল্পী না লোকটা?'

'শিল্পী!' বিস্মিত প্রতিধ্বনি তুলল হোটেলমালিক।

'দেখে আমাদের তাই মনে হয়েছিল।'

'তা লোকটার আঁকার হাত খারাপ না। কিন্তু সত্যিকার শিল্পী কি কখনও শুধু মড়ার ছবি আঁকে?'

'শুধু মৃতদেহের ছবি?' অজানা আশঙ্কায় গলা কাঁপছে পোলিশ যুবকের।

'হ্যাঁ। শুধু মড়ার ছবি। নীচ এক ব্যবসায়ী ও। কেবল মৃতদেহের ছবি আঁকে। এখানে বা ধারেকাছে যদি কোন লোকের মৃত্যু আসন্ন হয় তাহলে সে চট করে তার ছবি এঁকে ফেলে। আত্মীয়স্বজনের কাছে সে-ছবির অনেক মূল্য। লোকটার আন্দাজ একেবারে নিখুঁত। কেউ জানে না কি করে সে টের পায় কে মারা যাবে। শকুন যেমন মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে দূর থেকে ধেয়ে আসে, ঠিক তেমনি এ লোকটাও সময় মতো হাজির হয়ে যায়। কোত্থেকে আসে, কি করে আসে তা কেউ বলতে পারবে না।'

একটা আর্তচিৎকারে চমকে উঠলাম আমরা। বয়স্কা পোলিশ মহিলা চিৎকার করে উঠেছেন। যুবতী জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে। মুখটা ফ্যাকাসে আর ম্লান। মেয়েকে ধরে আছেন মহিলা। পাশেই ভদ্রলোক, থরথর করে কাঁপছেন। দারুণ আশঙ্কা দু'জনেরই চোখে-মুখে।

ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল পোলিশ যুবক। গ্রীক যুবক লবিতে ছিল। তাকে দেখেই আক্রমণ করে বসল পোলিশ যুবক, ব্যাগটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

আমরাও ততোক্ষণে নিচে নেমে এসেছি। দেখলাম দুই যুবক পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। শিল্পী যুবকের ব্যাগের জিনিসপত্র সব ছিটিয়ে পড়েছে বাইরে।

সেসবের মধ্যে রয়েছে একটা ছবি। কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে আঁকা একটা নিমীলিত-চোখ মেয়ের মুখের স্কেচ।

মুখটা পোলিশ যুবতীর!

মূল: জে নেরুদার 'ভ্যাম্পায়ার'
রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

মিশ্র রক্ত

চাঁদের ওই আলোয় যেন টান পড়ছে কুট্টানের রক্তে, ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছে সে তার দাদার জন্যে। বাতাসে ভেসে বেড়ানো চাঁদের আলোর গন্ধেই ঘুম ভেঙেছে তার, গাঢ় রহস্যময় তরল একটা গন্ধ। বাড়ির পেছনে তাদের পারিবারিক মন্দির, দাদা সেখানে পুজো করে গভীর রাত পর্যন্ত। শুনতে পাচ্ছে সে মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ। সব চাঁদনী রাতের মত আজও জানালা দিয়ে তাকাতেই সে দেখতে পেল সেই মহিলাকে, গাছের নিচে বসে ধীরে সুস্থে চুল আঁচড়াচ্ছে।

মহিলা বসে আছে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে, যেন দাদার পুজো শেষের অপেক্ষায় আছে সে। মন্দিরের ভেতরে ধোঁয়ার সোনালি আভা, বাইরে আঁধার প্রাণ পেয়ে যেন নেচে নেচে উঠছে দাদার মন্ত্রপাঠের তালে তালে। জানালার বাইরে প্রকৃতি স্নান করছে চাঁদের আলোয়, কিন্তু মন্দির ঘেরা নারিকেলগাছের সারিতে নিবিড়, অনড় অন্ধকার।

পা পর্যন্ত লম্বা মহিলার চুল, আঁচড়িয়ে চলেছে সে ধীর, লম্বা লম্বা টানে। তার হাতে ধরা হাতির দাঁতের চিরুনিটাকে চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে যেন পালিশ করা হাড়ের টুকরো। পা মুড়ে বসে আছে সে, দু'পায়ের নূপুরজোড়া চকচক করছে সঙ্গমরত দুই সোনালি সাপের মত। মহিলার মুখ দেখতে না পেলেও কুট্টান জানে, চুল আঁচড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে দেখছে তাকে কাজল-কালো একজোড়া চোখ; সুগন্ধী চুলের আড়ে তাকে লক্ষ করছে মহিলা,

লাল টুকটুকে ঠোঁটে তার সাদা, স্যাঁতসেঁতে হাসি। পুজো শেষ করেছে দাদা, তেলে এখন তার দেহ চকচকে, ধুতি সিঁদুরে রক্তের মত লাল। ধীরে, নিঃশব্দে নড়ে উঠল মহিলা। কুট্টানের মনে হলো, যেন সোজা হলো একটা কুণ্ডলী পাকানো সাপ। দাদার মুখে কুট্টান দেখতে পেল হাসি। মহিলার পাশ দিয়ে যাবার সময় থেমে ঝুঁকে পড়ল দাদা, মাটি থেকে সাদা একটা ফুল তুলে নিয়ে গুঁজে দিল তার কালো চুলে। দাদার করতলে গাল রাখল মহিলা, চুলের রাশি তার দাদার বাহুর ওপর দিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কুট্টান অনুভব করল, দু'জনেই তাকে দেখছে। দাদা দেখছে ঠোঁটে গূঢ় মুচকি হাসি নিয়ে, আর মহিলা আড়চোখে চুলের ফাঁকে। তাদের জটিল দৃষ্টির অর্থ কুট্টান পুরোপুরি বুঝতে পারে না।

দাদা শুতে এলে মহিলার সম্বন্ধে প্রশ্ন করল কুট্টান। এই প্রশ্ন সে তার দাদাকে আগেও অনেকবার করেছে।

'আচ্ছা, দাদা, ও কি একটা যক্ষিণী?'

'যক্ষিণীদের সম্বন্ধে কি জানিস রে তুই?'

'চাকর-বাকরেরা বলে, ওই গাছে নাকি যক্ষিণী বাস করে। বলে, রাতে বাইরে বের হলে যক্ষিণী তাদের খেয়ে ফেলবে। যক্ষিণী ওই গাছের নিচে থাকে, দাদা?'

দাদা তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে। আঙুলে তার ফুল আর চুলের সুগন্ধ। চঞ্চল হয়ে উঠল কুট্টানের রক্ত। বাইরে রাতের বাতাসে ঘুম ভেঙে চেঁচামেচি করছে দাঁড়কাকের দল, গ্রামের পুকুরগুলোতে ফেলছে তারা মরা পাতা, গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে উড়ছে পাহাড়ের পাশের তালগাছ আর ধানখেতগুলোর ওপর।

'বুঝলি, কুট্টান, যক্ষিণীরা ঘুমায় তালগাছের মাথায়,' ফিসফিস করে বলতে লাগল দাদা, 'আর পূর্ণিমার রাতে যখন আলোয় ঝলমল করে চারপাশ, রাস্তার মোড়ে তারা থাকে পথিকের অপেক্ষায়।

'চোখ তাদের রাতের মত কালো, চামড়ায় খেলা করে চাঁদের আলো, লাল টুকটুকে ঠোঁট যেন তাজা রক্তে ভেজা। রাতে জলপ্রপাত যেমন দেখায়, ঠিক তেমনই তাদের চুল।

'তাদের পায়ের দিকে তাকালে দেখবি, কুট্টান,' বলল দাদা, 'সেগুলো কখনোই মাটি স্পর্শ করে না। আর, কোন পথিকের দেখা পেলে যক্ষিণীরা তার কাছে পান-সুপারি চায়। যে দিল সে মরল।'

'তাদের কী হয়, দাদা?'

'তাকে তুলে নিয়ে যায় সে তার তালগাছের বাসায়। পরদিন সকালে সেই পথিকের পাওয়া যায় কেবল চুল আর হাড়গোড়।'

'ওরা আমাকেও খেয়ে ফেলবে, দাদা?'

আবার দাদার মুখে কুট্টান দেখতে পেল গূঢ় সেই মুচকি হাসি, রাতে মন্দির থেকে ফেরার পর দাদার মুখে এই বিশেষ হাসিটা দেখা যায় সবসময়।

'আমার রক্ত মিশে আছে তোর রক্তে, কুট্টান,' বলল দাদা, 'তুই তো আমাদেরই একজন।'

নিরাপত্তার আনন্দে দাদার বুকে মুখ লুকাল কুট্টান, তার পুরুষালী তীব্র গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে চন্দনের সুগন্ধ। রাতের বাতাসে ভর করে তার কাছে উড়ে এল ঘুর্ঘুরে পোকা আর রাতপাখি। কুট্টান জানে, বেশির ভাগ রাতের মত আজ রাতেও যক্ষিণীকে স্বপ্নে দেখবে সে। দেখবে, বসে আছে সে ওই গাছের নিচে, চুল আঁচড়াচ্ছে ধীরে ধীরে, আর গোপন দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করে বাড়িয়ে তুলছে অস্বস্তি। দাদাকে অবশ্য কখনোই বলেনি সে তার এই স্বপ্নের কথা, কিন্তু দাদার মুখের গূঢ় হাসি দেখে সে বুঝতে পারে যে স্বপ্নের ব্যাপারটা তার অজানা নয়।

দাদা খুব লম্বা, বুকের চুলগুলো এখনও কাঁচাই রয়েছে তার। প্রতিদিন বিকেলে দাদা তাকে গোসল করাতে নিয়ে যায় মন্দিরের পাশের পুকুরে। হাঁটে তারা তাদের জমির পাশের পথ ধরে, যার

সঙ্গেই দেখা হোক, সে সরে দাঁড়ায় পথ ছেড়ে, মাথা নিচু করে মুখ ঢাকে গামছায়। দাদার সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানো যেন নিষিদ্ধ। কুট্টানের সন্দেহ, দাদা উঁচু জাতের বলেই কেবল মাথা নামায় না মানুষ, মাথা নামায় তারা তীব্র আতঙ্কে।

হাঁটে তারা পান্না-সবুজ ধানখেতের মাঝ দিয়ে। সূর্যাস্তের সময় দেখা যায় গরুর গাড়ির সারি, লণ্ঠন দোল খায় গাড়িগুলোর তলে। রাত নামে ধীর পায়ে, মন্দির থেকে পানির প্রান্তে নেমে আসা সিঁড়িগুলো ছেয়ে যায় আঁধারে, পুকুরের কালো আর ঠাণ্ডা পানিতে পড়ে তীরের বটগাছটার ছায়া। গ্রামবাসীদের মতে এই সময়টা অভিশপ্ত, এই সময়ে গোসল করতে কেউই নামে না পুকুরে।

'এই সময়টা ব্রহ্মরাক্ষসের,' গোসল করার জন্যে মন্দিরের পথে এগোতে এগোতে বলল দাদা একদিন। হঠাৎ বইতে লাগল তীব্র বাতাস, থরথর করে কেঁপে উঠল কুট্টানের সারা শরীর। বাতাসটা ধেয়ে এসেছে বটগাছ থেকে, সে-গাছেই নাকি ব্রহ্মরাক্ষসের বাস। মৃতের মত ঠাণ্ডা বাতাসে যখন হাড় জমে যাবার জোগাড়, ভ্রূ কোঁচকাল কুট্টানের দাদা, হাত তুলে বাতাসকে থামার নির্দেশ দিল। কুট্টান অনুভব করল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিক পরিবর্তন করল বাতাস। আর তার ওপরে আক্রোশ মেটাতে না পেরে গিয়ে হামলে পড়ল ধানখেত, বাঁশঝাড় আর তালগাছের ওপর। তারপর সেই বাতাস ছুটে গিয়ে নেভাল কুটিরের বাতি, উসকে দিল বনের দাবানল। শেষরাতের দিকে সেই বাতাস আবার কুট্টানের স্বপ্নে এল ফ্যাকাসে, অন্ধ এক মহিলার রূপ ধরে।

স্বপ্নে আরও অনেককে দেখে অস্থির হয়ে ওঠে কুট্টান: অপরিচিত কে যেন একজন এসে দাঁড়িয়ে থাকে পাতায় ভরা গলির ছায়ায়, আরেকজন নিকষ অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে কীসের প্রতীক্ষায় যেন দাঁড়িয়ে থাকে বহু দূরের জনশূন্য এক

বাড়ির বারান্দায়। তবে সবচেয়ে অস্থির হয় সে, যখন স্বপ্নে তার ওপর লুটিয়ে পড়ে একরাশ সুগন্ধী চুল, আর সে চুষে চলে নীল শিরাঅলা একটা ভরাট স্তন। আঁতকে ঘুম থেকে জেগে যায় সে, সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে দাদা বলে, 'শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, ওঠার সময় হয়নি এখনও।'

সে-ও জানে, এখনও হয়নি ওঠার সময়। আর এভাবেই কেটে যায় কুট্টানের দিন-রাত। নারিকেলগাছের সারি আর ধানখেতের ভেতর দিয়ে দৌড়ে চলে সে দাদার আগে আগে, গ্রামের পথে হেঁটে চলে দাদার পাশে পাশে, তাদের চোখে পড়ামাত্র গ্রামবাসীরা নিজ নিজ সন্তানকে জড়িয়ে ধরে বুকে। কুট্টান অসুখী নয়, তবে মাঝে মাঝে অন্যান্য ছেলেপেলেদের সঙ্গে খেলার খুব ইচ্ছে হয় তার।

সে ভেবে পায় না, কোন বাবা-মা তাদের সন্তানকে তার সঙ্গে খেলতে দেয় না কেন। অন্যান্য ছেলেপেলেদের সঙ্গে তার কী-ই বা এমন পার্থক্য? কেবল হাঁটার সময় তার পা মাটি স্পর্শ করে না, তাতে কার কী-ই বা এমন ক্ষতি!

মূলঃ রবি শঙ্করের 'মিক্সড ব্লাড'
রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

সেই মেয়েটি

বি.এ. পরীক্ষার পর ঢাকায় খালার বাসায় বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা পাকাপাকি হয়ে গেল। ঠিক হলো, সপ্তাহ তিনেক ঢাকা থেকে বেড়িয়ে এসে বাবার চালের আড়তে নিয়মিত বসবে।

যাকে নিয়ে এ ঘটনার অবতারণা, তার নাম জহির–জহির মোল্লা। এস.এস.সি আর এইচ.এস.সি-তে কয়েকবার ডিগবাজি খাওয়া এই জহিরকে দিনাজপুরের বেশিরভাগ লোকই এক নামে চেনে। নব্য মাস্তান হিসাবে ইতিমধ্যেই পুলিশের খাতায় নাম উঠেছে। ওর বাবা মজিদ মোল্লা চালের ব্যবসায়ী। পড়ালেখা জানা লোক না হলেও ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে দারুণ পাকা। আর এ জন্যই মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে সাধারণ চাল ব্যবসায়ী থেকে মালিক হয়েছে তিনটে আড়তের। নিজে লেখাপড়া জানা লোক না হলেও ছেলের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না তার। কিন্তু গুণধর ছেলে এদিক দিয়ে রীতিমত হতাশ করেছে তাকে। তবে শেষ পর্যন্ত আড়তের ব্যবসা দেখা শোনায় যে রাজি হয়েছে এতেই বেশ খুশি মজিদ মোল্লা।

'দেখিস বাবা, তোর খালু কিন্তু ভীষণ কড়া মেজাজের মানুষ, এমন কিছু করে বসিস না যার জন্যে আমাদের আবার কথা শুনতে হয়।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো মা, ঢাকায় গিয়ে তোমার ছেলে একদম গুড বয় হয়ে থাকবে।' ঢাকায় রওনা হবার আগে মায়ের সঙ্গে জহিরের এই-ই ছিল শেষ কথা।

একতা এক্সপ্রেস আধঘণ্টা লেট। জহির কমলাপুর রেল স্টেশনের পার্কিং স্পেসে খালার গাড়িটা দেখতে পেল। দেরি দেখে ড্রাইভার দু'চোখের পাতা এক করার চেষ্টা করছিল বোধহয়, ওর ডাকে আচমকা নড়েচড়ে উঠল।

খালার বনানীর বিশাল বাড়িটা ছাড়াও ঢাকাতে আরও তিনটে বাড়ি আছে। ওগুলো ভাড়া দেওয়া। খালু সুপ্রিম কোর্টের নামকরা অ্যাডভোকেট। ছিমছাম সংসার। বড় মেয়ে সাবরিনা নর্থ সাউথ ইউনিভারসিটিতে বি.বি.এ. সেকেন্ড ইয়ারে আর ছোট মেয়ে আইরিন ঢাকা ভার্সিটিতে ফিনান্সে অনার্স নিয়ে পড়ছে।

গাড়িতে উঠে পড়ল জহির। কিছু পুরানো কথা মনে পড়ে গেল। খালাতো বোন সাবরিনার সঙ্গে একসময় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বছর দুয়েক আগে কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এক চিঠি দিয়ে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিল মেয়েটি। প্রায় ৭/৮ মাস 'তোমাকে ছাড়া বাঁচব না' গোছের অসংখ্য চিঠির পর শেষ চিঠিটায় সাবরিনা লিখেছিল—ওদের দুজনের সম্পর্ক খালাতো ভাইবোনের, আর এই সম্পর্ক যেন খালাতো ভাইবোন হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ ব্যাপারে পরপরই ওর কানে এসেছিল, মেয়েটি বনানীর এক কোটিপতির ছেলের প্রেমে পড়েছে। অবশ্য ওই সম্পর্কও বেশিদিন টেকেনি। ওর জানামতে সাবরিনার এখনকার প্রেমিক এক উঠতি গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। ছোট বোন আইরিন স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়ে হয়েছে বড় বোনের একেবারে উল্টো। সারাদিন কেবল নট আর বই। বাইরে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে ওকে তেমন একটা দেখা যায় না। আইরিন যখন এইট থেকে নাইনে উঠল ফার্স্ট হয়ে, সে সময় দিনাজপুরের বেশ কয়েকটা বইয়ের দোকান খুঁজে রিপ্লি'স বিলিভ ইট অর নট কিনে এনেছিল ওর জন্য। বইটা হাতে পেয়ে ওর খুশি আর দেখে কে! অসংখ্য উপহারের মধ্যে জহিরের দেওয়া বইটাই সবচেয়ে প্রিয় উপহার

হিসাবে অবসর সময়ে প্রায় সারাক্ষণই দেখা যেত ওর হাতে...। ভাবনায় ছেদ পড়ল জহিরের, ড্রাইভার গেট খোলার জন্য হর্ন দিচ্ছে।

খালার বাড়িতে প্রথম কয়েকদিন সময়টা বেশ কেটে গেল। কিন্তু পাঁচ দিনের মাথায় শুরু হলো বিপত্তি। সাবরিনা আর আইরিনের ক্লাস এতদিন বন্ধ ছিল, এখন দুজনেরই একই সাথে ক্লাস শুরু হয়েছে। দু'বোন সকালবেলা একসঙ্গে বেরোয়। সন্ধ্যার পর ছাড়া কেউই বাড়ি ফেরে না আইরিনই আগে ফিরে আসে। এসেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর বইপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাবরিনার কথা অবশ্য আলাদা; ও যে কখন বাড়ি ফেরে তা খালাও সম্ভবত জানেন না। চাল-চলন দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, ভুল রাস্তার প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে মেয়েটি। এ ছাড়া খালা যেটুকু সময় বাড়িতে থাকেন সে সময়টাতে ওকে সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করেন–কিন্তু তিনিও নানান সংগঠনের সাথে জড়িত; তাই বেশিক্ষণ সময় দেওয়া সম্ভব হয় না তাঁর পক্ষে। আর জহিরের খালু তো হিসাবের মধ্যেই পড়েন না–একমাত্র ছুটির দিন ছাড়া দুই মেয়ের সঙ্গেও ঠিকমত কথা বলার ফুরসত পান না তিনি।

এই বিপদ থেকে খালাই উদ্ধারের পথ বাতলে দিলেন। 'এক কাজ কর। ঢাকায় যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন আছে তাদের সকলের বাড়িতে বেড়াতে শুরু কর, দেখবি সময়টা কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে টেরও পাবি না,' বলে ড্রাইভারসমেত তাঁদের তিন নম্বর গাড়িটা জহিরের কাছে হাওলা করে দিলেন।

খালার পরামর্শে ভালই কেটে গেল পরের তিন-চারদিন। কিন্তু সকাল-বিকাল গাড়ি দাবড়িয়ে চার দিনেই যখন সমস্ত আত্মীয়ের বাড়ি ঢুঁ মারা সারা হয়ে গেল, তখন আবার একাকীত্বে পেয়ে বসল ওকে। এদিকে খালাতো বোন দুজনের দৈনন্দিন রুটিনের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। হঠাৎ মেজাজ খিঁচড়ে উঠল ওর।

নিজের উপরই রাগ হলো। মা'র কাছে কেন যে তিন সপ্তাহের কথা বলে এসেছিল। এখন আগেভাগে ফিরে গেলে জবাবদিহি করতে করতে জান বেরিয়ে যাবে। মা হয়তো ভেবেও বসতে পারে, না জানি কোন অঘটন ঘটিয়ে এসেছে ঢাকায়! সাত-পাঁচ ভেবে আরও কিছুদিন থেকে যাওয়াই ঠিক করল। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, যে কদিন ঢাকায় থাকবে, কাউকে আর বিরক্ত করবে না। একা একাই নিজের মত করে কাটাবে সময়টা।

পরদিন ভোরবেলা মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে পড়ল জহির। একা। বনানীর এদিকটা বেশ নিরিবিলি আর প্রচুর গাছ-গাছালির সমাহার। রাস্তায় বের হয়ে দেখল, ও একা নয় বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে। এই দলে ষাটোর্ধ্ব বয়সের বুড়ো-বুড়িও শামিল হয়েছে। কয়েকজন যুবতী একাধিকবার আড়চোখে জহিরকে লক্ষ করল। ওর পেশীবহুল শরীরটা চোখে পড়ার মত, এ ছাড়া লম্বাও নেহাত কম নয়, প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। অনেকটা সময় হাঁটাহাঁটি করার পর বাড়ির পথ ধরল। ফিরে আসার সময় খালার বাড়ি থেকে কয়েকটা বাড়ি আগে [illegible] তলা বাড়ির দিকে দৃষ্টি আটকে গেল ওর। দোতলার ব্যালকনিতে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে। বাড়িটা অতিক্রম করার সময় হঠাৎ মনে হলো, মেয়েটা চোখ দিয়ে ইশারায় ডাকল ওকে। দেখার ভুল নয়তো? ওকে দেখতে পেয়ে খালার বাড়ির দারোয়ান গেট খুলে দিল।

গেস্ট রুমে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিল চটপট। নাস্তার টেবিলে দুই বোনের সঙ্গে দেখা হলে কৌশলে মেয়েটার ব্যাপারে জেনে নিতে হবে—মনে মনে ভাবল ও।

নাস্তার টেবিলে সাবরিনা আর আইরিন—দুজনকেই পাওয়া গেল। এ কথা সে কথার পর আসল কথাটা এবারে পাড়ল জহির, 'আচ্ছা, তোমাদের বাড়ির দক্ষিণে কয়েকটা বাড়ির পর সিরামিক টাইলের ওই বাড়িটায় কে থাকে বলো তো?'

এতক্ষণ আলাপ ভালই চলছিল, কিন্তু জহিরের এ কথায় দু'বোন হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গেল। কিছু একটা বলার জন্য আইরিন মুখ খুলতে গিয়েছিল, কিন্তু হাতের ইশারায় ওকে থামিয়ে দিয়ে সাবরিনাই বলতে শুরু করল, 'ওই বাড়ি নিয়ে এলাকায় নানান কাহিনী প্রচলিত আছে; কিন্তু তার আগে বলো, তুমি হঠাৎ করে বাড়িটার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলে কেন?'

সত্যি কথাটা না বললে ওদের মুখ থেকে আর কোন কথা বের করা যাবে না—দু'বোনকে ও ভাল করেই চেনে। তাই কিছুক্ষণ আগে ওই বাড়ির ব্যালকনিতে দেখা মেয়েটার কথা বলল ওদের—চোখ দিয়ে ইশারা করার ব্যাপারটা শুধু বাদ দিয়ে গেল। ওর কথা শুনে আরও গম্ভীর হয়ে গেল সাবরিনা। 'শুনেছি বাড়িটায় এক ভদ্রমহিলা থাকেন। স্বামী আমেরিকায় ইমিগ্র্যান্ট। কিন্তু লোকটিকে এলাকার কেউ আজ অবধি দেখেনি। নানারকম অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগও উঠেছিল বেশ কয়েকবার। কিন্তু পুলিস কোনবারই সন্দেহজনক কোন কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। মহিলা কদাচিৎ বাইরে বের হন। এলাকার কারও সঙ্গে তার কোনরকম ওঠাবসাও নেই।'

'বাড়িটা নিয়ে আরও মজার কথা প্রচলিত আছে,' এবারে মুখ খুলল আইরিন। 'গভীর রাতে ভূত-প্রেত ঘুরে বেড়ায় বাড়ির ছাদে। আমাদের নজু মিয়া এর প্রত্যক্ষদর্শী—একদিন রাত একটার দিকে ছাদে উঠে দেখে, কালো আলখাল্লা পরা, মানুষের মত দেখতে, কী যেন একটা ছাদ থেকে উড়ে গেল আকাশের দিকে...।'

'তা হলে বোঝা যাচ্ছে ওই বাড়িতে অসামাজিক কার্যকলাপ তো হয়ই, সেগুলোতে আবার অংশগ্রহণ করে ভূত-প্রেতরা!'

জহিরের বিদ্রূপ গায়ে মাখল না আইরিন। 'বছর পাঁচেক আগে এলাকার এক প্রভাবশালী লোকের ছেলের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মহিলার। এভাবে কয়েকমাস চলার পর হঠাৎ

একদিন গায়েব হয়ে গেল ছেলেটা। থানা-পুলিস করেও কোন রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায়নি।'

'ওই মহিলার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সঙ্গে ছেলেটার গায়েব হয়ে যাওয়ার কী যোগসূত্র থাকতে পারে, তা কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'ব্যাপারটা তো সিম্পল; সম্ভবত মহিলাই তাকে পাচার করে দিয়েছে কোনখানে, কিংবা এমনও হতে পারে যে তার কীর্তিকলাপ ছেলেটা জেনে যাওয়ায় প্রফেশনাল কাউকে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে জন্মের মত।'

আইরিনের কথায় খানিকটা বিরক্ত হলো জহির। 'একজন ভদ্রমহিলা, যিনি তোমাদের প্রতিবেশী, তাঁর সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়াই এসব কুৎসা রটানো মোটেই উচিত হচ্ছে না।'

'তুমি যাই ভাবো না কেন, এসব কথা এই এলাকার সবাই বলাবলি করে। আর একটা কথা, জহির ভাই, তুমি কিন্তু ভুলেও ওই বাড়ির ত্রি-সীমানায় ঘেঁষবে না।'

নাস্তার পালা চুকিয়ে উঠে পড়ল জহির। ওরাও ভার্সিটির উদ্দেশে গাড়িতে চাপল।

গেস্টরুমে একটা ইজি চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল জহির। আসলে মেয়েরা মেয়েদের ব্যাপারে হিংসুকই হয়ে থাকে। এই দুই বোনের কথাই ধরা যাক, যার সঙ্গে মৌখিক আলাপ পরিচয় পর্যন্ত নেই তার নামে কী সব যা-তা কথা বলে গেল অবলীলায়। মেয়ে কিংবা যুবতী বলতে মুখে বাধে বোধ হয়, তাই ২২/২৩ বছরের যুবতীকে 'মহিলা' বলে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করতেও ছাড়েনি ওরা। এর একমাত্র কারণ, মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী।

পরদিন সকাল বেলা আবার মর্নিং ওয়াকে বের হলো জহির। কোনার সাদা ওই বাড়িটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ও। আজও একই ভঙ্গিমায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মেয়েটি; ঠোঁটের কোণে সেই [illegible]

মুচকি হাসি, চোখে-মুখে কীসের যেন আহ্বান। মেয়েটির উত্তেজক আহ্বান সাহসী করে তুলল ওকে–প্রত্যুত্তরে ও-ও মুচকি হাসি হাসল। এমন সময় তর্জনী তুলে রাস্তার একটা ঝাউ গাছের দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটি, ইশারায় কী যেন বোঝাতে চাইছে। এগিয়ে গেল ও। ঝাউ গাছের নীচে ছোট একটা খাম পড়ে রয়েছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল–না, কেউ লক্ষ করছে না ওকে। খামটা তুলে নিয়ে পকেটে চালান করে দিল ও। এবার দ্রুত পায়ে হাঁটা ধরল বাড়ির দিকে। একবার শুধু পেছন ফিরে চাইল–ওর দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে মেয়েটা...। বাড়িতে ঢোকার আগে গেটের কাছে দেখা হয়ে গেল পুরানো কাজের লোক নজু মিয়ার সঙ্গে। ওকে দেখতে পেয়ে লম্বা সালাম ঠুকল লোকটা।

গেস্টরূমে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল জহির। এবারে খামটা খুলল সে। ছোট একটা কাগজে স্রেফ এই কয়টি কথা লেখা–'আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় চলে এসো।'

একটু দ্বিধায় পড়ে গেল ও। ওকে কি তবে মেয়েটি ওর বাড়িতে যেতে বলেছে? ধরা যাক বাড়িতেই যেতে বলেছে, কিন্তু ওখানে গিয়ে কাকে চাইবে ও? দারোয়ানকে যদি বলে–এ বাড়ির সুন্দরী মেয়েটাকে একটু ডেকে দিন তো–তা হলে গলাধাক্কা যে খেতে হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়! একবার ভাবল, খালাতো বোনদের সঙ্গে পরামর্শ করবে, কিন্তু পর মুহূর্তেই বাতিল করে দিল আইডিয়াটা। ওদের বললে নির্ঘাত খালার কানে পৌঁছবে কথাটা। শেষে পুরো ব্যাপারটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সাত-পাঁচ ভেবে শেষে সিদ্ধান্ত নিল, এ ব্যাপারে এখনই কাউকে কিছু জানাবে না। মেয়েটির সঙ্গে সাক্ষাতের পর সবকিছু খুলে বলবে ওদেরকে।

প্রিয় ফয়সল,

শুভেচ্ছা নিস। ঢাকায় একরকম ভালই কেটে যাচ্ছে দিন। খালা খুবই আদর-যত্ন করছেন। এখানে আসার

কদিন পর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এই এলাকার এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে পর পর দু'দিন চোখাচোখি হয়েছে। আজ বিকেল পাঁচটায় ওর সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। বনানীর অতি আধুনিকা এক মেয়ের কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব পেয়ে খুব একটা অবাক হইনি। ঠিক করেছি দেখা করব। দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়! আজ আর না। তোরা সবাই ভাল থাকিস।

–ইতি।

বেস্ট ফ্রেন্ড ফয়সলকে চিঠি লেখা শেষ করে নজু মিয়াকে ডেকে পাঠাল জহির। চিঠিটা খামে ভরে ওর হাতে দিল পোস্ট করার জন্য। খামটা নিয়ে চলে যেতে গিয়েও ইতস্তত করতে লাগল নজু মিয়া। 'ভাইজান, আফনেরে একটা কথা কমু ভাবছিলাম, আফনে যদি রাগ না হন তয় কইতে পারি...।'

'কী বলবে, বলেই ফেলো না,' তাড়া লাগাল জহির।

'ভাইজান, আমগো বাড়ির দক্ষিণের ওই দোতলা বাড়িতে এক মহিলারে দেখছেন না, উনি কিন্তু মানুষ না–মানুষের আদলে জ্বিন। একদিন রাতে ছাদে উঠছিলাম, দেখি কী...।'

'ঠিক আছে, এখন তুমি যাও আর চিঠিটা আজই পোস্ট করে দিও,' কড়া ধমক দিতে গিয়েও চেপে গেল জহির।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল জহির; কিন্তু ঘুম এল না। মেয়েটির ব্যাপারে চাপা উত্তেজনায় ভুগছে সে। বেলা সাড়ে চারটার দিকে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল ও। জিনস্ ট্রাউজার, স্পোর্টস গেঞ্জি, সেই সঙ্গে বিদেশী দামী কেডস। আয়নায় নিজের সাজ পোশাক দেখে নিজেকে তারিফ করতে ইচ্ছে করল ওর। হালকা পারফিউম ছড়িয়ে দিল গায়ে। দেয়াল ঘড়িতে দেখল, পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। গেট দিয়ে বেরোনোর সময় দেখা হয়ে গেল খালার

সঙ্গে। দেখে মনে হচ্ছে উনি এইমাত্র কোন সভা-সমিতি থেকে ফিরছেন। ওকে এ সময় বেরোতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, বেলা না পড়তেই কোথায় চললি?'

'তেমন কোথাও না, খালা। সামনে থেকে একটু হাঁটাহাঁটি করে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।'

'সন্ধ্যার আগেই চলে আসিস কিন্তু। এক সঙ্গে চা খাব।'

খুব সহজেই ম্যানেজ করা গেল খালাকে। আর দেরি না করে ও দ্রুত পায়ে হাঁটা ধরল সামনের দিকে। বাড়িটার কাছাকাছি এসে দেখতে পেল, যে সমস্যা নিয়ে ও ভাবছিল, সেটার সমাধান করে রেখেছে মেয়েটি নিজেই। ব্যালকনিতেই দাঁড়িয়েছিল ওর প্রতীক্ষায়। ওকে আসতে দেখে হাত দিয়ে ইশারা করল–নিজেই নেমে আসছে নীচে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল জহির। কলিং বেল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মেয়েটি হয়তো নিজেই এসে ভিতরে নিয়ে যাবে ওকে। কিন্তু ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দারোয়ান। ওকে ভিতরে ঢোকার জন্য বলল। ড্রইংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি। পরনে ডেনিমের ট্রাউজার্স সঙ্গে ম্যাচিং টপস্। আপাদমস্তক ভাল করে দেখল মেয়েটিকে। চেহারা এবং ফিগারে একেবারে নিখুঁত। বয়সটা ঠিক বোঝা যায় না। ২২/২৩ ও হতে পারে, আবার ত্রিশও হতে পারে। মেয়েটি এবারে ড্রইংরুমে আহ্বান করল ওকে।

ইতিমধ্যে দুজন দুজনার নাম জেনেছে। মেয়েটির নাম অনামিকা হক। স্বামী আমেরিকায় চাকরি করছে। ওখানকার নাম করা এক কোম্পানির কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সে। অনামিকা এপ্লাইড কেমিস্ট্রিতে অনার্স। আমেরিকা থেকে বুটিকের কাজ শিখে এসেছে। এখন বাড়িতে বসেই বুটিক ডিজাইন করে গুলশান-বনানীর অভিজাত দোকানগুলোতে কাপড় সাপ্লাই দেয়। বাড়িতে দারোয়ান, মালী ও বয়-বাবুর্চি বাদ দিলে ও একাই থাকে।

'স্বামী ছাড়া এভাবে একা থাকতে খারাপ লাগে না?'

'তা হয়তো একটু লাগে। আর সে জন্যেই তো তোমাদের মত ভাল ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে করে। এতে একাকীত্ব যেমন ঘোঁচে, তেমনি সময়টাও কেটে যায় চমৎকার। আর যাকে বেশি ভাল লেগে যায় তাকে সারাজীবনের জন্যে হৃদয়ের মণিকোঠায় ঠাঁই দিই,' জহিরের প্রশ্নের জবাবে হেঁয়ালি মিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটি।

ড্রইংরুমের সাজ-সজ্জা ও আসবাবপত্র দেখে মেয়েটির রুচির প্রশংসা না করে পারল না জহির। দেয়ালে টানানো দুর্লভ সব অয়েল পেইন্টিং। শো-কেসে অসংখ্য অ্যান্টিকস শোভা পাচ্ছে। যে দুটো ঝাড়বাতি মাথার উপর থেকে আলো ছড়াচ্ছে সেগুলোর একেকটার দাম কম করে হলেও দু'লাখ টাকা তো হবেই। এ ছাড়াও সাইড টেবিলগুলোতে বেশ কিছু বিদেশী ডেকোরেশন পিস রুমের শোভা বর্ধন করছে।

ট্রলিতে করে নাস্তা নিয়ে রুমে ঢুকল বেয়ারা। জমজমাট আয়োজন। কেক, পুডিং, কাস্টার্ড আর চিকেন ঝাল ফ্রাই। সঙ্গে ড্রিঙ্কস হিসাবে কয়েক ক্যান বিয়ার।

'বিয়ারে কোন আপত্তি নেই তো?'

'না, আপত্তি থাকবে কেন—মাঝে মধ্যে বিয়ার খেতে ভালই লাগে। আর আমাদের নতুন বন্ধুত্বের সেলিব্রেশনটা বিয়ারেই জমবে ভাল।'

জহিরের কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে দুটো ক্যান খুলে গ্লাসে ঢালল মেয়েটি।

নাস্তা পর্ব শেষ হওয়ার পর হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর গেল জহিরের। 'সর্বনাশ! সাড়ে সাতটা বাজে। খালাকে বলেছিলাম একসঙ্গে চা খাব বিকেলে, তা তো আর হলো না। যাক, আজ, কাল কিংবা পরশু আবার দেখা হতে পারে আমাদের...'

জহিরের কথায় খিলখিল করে হেসে উঠল অনামিকা। 'আজই

প্রথম এলে, এত তাড়া কীসের! তা ছাড়া এখন তো মাত্র সন্ধ্যা, আর একটু থেকেই না হয় যাও।'

জহির এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটির সঙ্গ ওকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এরই মধ্যে মেয়েটির চাপাচাপিতে তৃতীয় গ্লাস বিয়ারও শেষ করেছে। একটু যেন নেশা নেশা বোধ হচ্ছে ওর। 'চলো, দোতলায় আমার বেডরুমে যাই।' ওর হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে আহ্বান জানাল মেয়েটি। 'বেডরুমে শুয়ে শুয়ে রিল্যাক্সড মুডে আলাপ করা যাবে।'

উচিত হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা বোঝার ক্ষমতা ততক্ষণে লোপ পেয়েছে। কী এক অদম্য আকর্ষণে মেয়েটির পেছন পেছন দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে লাগল জহির। দোতলায় লম্বা করিডর। করিডরের শেষ প্রান্তে মেয়েটির বেডরুম। ওর হাত ধরে বেডরুমে ঢুকল মেয়েটি। ওকে খাটে বসিয়ে বাথরুমে ঢুকল কাপড় পাল্টানোর জন্য। একটু পর বেরিয়ে এল–মেয়েটির পরনে এখন কালো নাইটি। দু'চোখে কামনার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। হঠাৎ দেয়ালের দিকে দৃষ্টি গেল জহিরের। চারজন যুবকের ফটোগ্রাফ–চারটে ফ্রেমে বাঁধানো। ফ্রেমের নীচে সন দেখা যাচ্ছে: ১৯৮২, ১৯৮৭, ১৯৯২, ১৯৯৫। ওগুলোর পাশে পঞ্চম একটা ফ্রেম দেখা যাচ্ছে–ফ্রেমটা খালি। নীচে সন লেখা: ১৯৯৯। ফটোগ্রাফগুলোর কোথায় যেন একটা অস্বাভাবিকত্ব আছে, কিন্তু সেটা যে কী তা বুঝে উঠতে পারল না ও। ফটোগ্রাফগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই সর্বাঙ্গে ঢেউ খেলে গেল মেয়েটির। 'ওরা সবাই আমার বয়ফ্রেন্ড। ওদেরকে খুবই ভালবাসি, তাই বেডরুমে ঠাঁই দিয়েছি সবাইকে।' এ ব্যাপারে আলাপ আর বেশিদূর এগোল না। ততক্ষণে দুজনেই একে অন্যের ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করেছে। বেড সুইচ টিপে রুমের বাতিটা নিভিয়ে দিল মেয়েটি। তবু পুরোপুরি অন্ধকার হলো না রুমটা। কোত্থেকে যেন

একফালি উজ্জ্বল আলো এসে পড়ছে খাটের মাঝখানটায়। বোঝা গেল। করিডরের বাতিটাই ঝামেলা পাকাচ্ছে যত। উঠে বাতিটা নিভিয়ে দিতে যাবে জহির, এমন সময় সুডৌল বাহু দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল মেয়েটি, 'ওহ্, ডার্লিং, তোমাকে আর কষ্ট করে উঠতে হবে না। আমিই অফ করে দিচ্ছি বাতিটা।' কথা শেষ হতে না হতেই চোখের পলকে লম্বা হতে শুরু করল মেয়েটির হাত। খোলা জানালা দিয়ে সেটা পৌঁছে গেল করিডরের সুইচের কাছে। বাতিটা নিভে যাওয়ার আগে ঝিক্ করে উঠল মেয়েটির একজোড়া সূচাল দাঁত। অন্য হাতটা ততক্ষণে অজগর সাপের মত পেঁচিয়ে ধরেছে জহিরের সর্বাঙ্গ—এবং বলাই বাহুল্য, ধীরে ধীরে চাপ দিতে শুরু করেছে হাতটা।

মানুষের জীবনের চরমতম সময়ে অসংখ্য বিষয়বস্তু মনের পর্দায় ভেসে ওঠে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। প্রথমেই বাবা-মাকে দেখতে পেল জহির, দৃশ্যপটে এল সাবরিনা, প্রিয় বন্ধু ফয়সালের চেহারাও ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে একটা রহস্যের সমাধান পেয়ে গেল—ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলো তোলা হয়েছে ওদের মৃত্যুর পর, এজন্যই চোখের তারায় কোন অভিব্যক্তি নেই ওদের।

সবকিছু অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে আরও একটা ব্যাপার বুঝে ফেলল জহির—খালি ফ্রেমে ওর ছবিটাই স্থান পেতে যাচ্ছে।

কাজী সারওয়ার হোসেন

রুমমেট

পাইন ভ্যালি অ্যাকাডেমি ফর ইয়ং লেডিস থেকে আলথিয়া বেনেডিক্টের চিঠি নিউ ইয়র্কের মিসেস ওয়ার্ডসওয়ার্থ বেনেডিক্টের কাছে:

আমার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলে তুমি। তবে গতকাল মিস অ্যানেটলী তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন নতুন একটি মেয়ের সঙ্গে নাকি থাকতে হবে আমাকে।

আমার রুমমেট ভিডা সম্ভবত মিস লীর পুরানো বন্ধু, লুইজিয়ানার ধনী জমিদার ফেলিক্স ডি মনসেরির একমাত্র মেয়ে। মিস লীর বিশ্বাস আমি আমার নতুন রুমমেটের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারব, তবে ভিডার খুঁত বা দোষ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন ব্যাপারটি। তাঁকে খুব বিরক্ত মনে হলো। বললেন আমার ব্যবহারে তিনি বেশ সন্তুষ্ট; আমার সঙ্গী যদি আমাকে কোন কারণে জ্বালাতন করে তা হলে যেন সাথে সাথে তাঁকে জানাই। তাঁকে এমন অস্থির লাগছিল, আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারছিলেন না। বুঝলাম না ভিডাকে নিয়ে তিনি কোন সমস্যায় আছেন কিনা।

তবে এখন পর্যন্ত আমার নতুন রুমমেটকে ভালই মনে হচ্ছে। ওর বাবা খুব ভাল মানুষ আর আমাদের ঘরটিকে প্রতিটি মেয়ে ঈর্ষার চোখে দেখছে। তোমাকে আরও আগে লিখতাম, মা, কিন্তু ঘর গোছাতে সময় লেগে গেল।

ভিডা নিজের পছন্দ আর রুচি অনুযায়ী ঘর সাজাতে চাইছিল। নিজের মত করে ঘর সাজাতে না পারলে ওর নাকি খুব অশান্তি লাগবে, এতে অবশ্য আমার কিছু মনে করার নেই– কারণ ডেকোরেশনের সমস্ত খরচাই ও বহন করছে। আমি বাধা দিইনি। ভিডা নিজের মত করে অদ্ভুতভাবে সাজিয়েছে ঘর; কমলা আর গ্রাস সবুজ রঙের শেড আর রাশি রাশি কুশন দিয়ে। ওর নাকি কুশনের স্তূপের মধ্যে শুয়ে থাকতে ভাল লাগে, বেড়ালের মত।

ওকে যদি তুমি দেখতে! ওকে যে দেখবে সে-ই তাকিয়ে থাকবে। ওর চামড়ার রঙ ফ্যাকাসে সাদা। লিপস্টিক মাখা টকটকে লাল ঠোঁট, কালো চুল আর চোখ–এমন অদ্ভুত চোখ জীবনেও দেখিনি। সরু, লম্বা, ঝুলে পড়া চোখের পাতা, ঘুম ঘুম একটা ভাব–এমন অদ্ভুতভাবে তাকায় আমার দিকে। চোখের মণি গ্লাশ সোনালি-বাদামী, আমার কাছে মাঝে মাঝে হলুদ লাগে। সাঁঝ বেলায় ওর চোখের পাতা ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে লক্ষ করেছি, চোখের মণিতে ফুটে ওঠে সরু, হলুদ একটা বৃত্ত; মনে হয় মানুষ নয়, বেড়ালের চোখ দেখছি।

এডগার ভাইয়া মিশর থেকে আনা নেকলেসটা আমাকে পাঠিয়ে দেবে বলেছিল। কথাটা ওকে মনে করিয়ে দিও। আমার বান্ধবীদেরকে নেকলেসটার কথা বলেছি। ওরা ওটা দেখার জন্য মরে যাচ্ছে।

তোমার আলথিয়া

প্রথম জনকে দ্বিতীয় জনের চিঠি

...পড়াশোনা চলছে বেশ ভালই। নতুন কিছু ঘটেনি, শুধু আমার রুমমেটের দু'একটি অদ্ভুত ব্যাপার ছাড়া। মিস লীকে ঘটনাটা জানাবার আগে তোমাকে লেখা সমীচীন মনে করছি। তবে এসব আমার কল্পনাও হতে পারে।

ভিডা সত্যি খুব আজব প্রকৃতির মেয়ে, মা। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি ওই অদ্ভুত চোখ জোড়া দিয়ে সে অন্ধকারে দেখতে পায়। এমনটি ভাবার কারণ–তুমি জানো আমি আসবাবপত্র একটু এদিক সেদিক ঘুরিয়ে রাখতে পছন্দ করি। সেদিন ঘরের সবগুলো আসবাব একটু এদিক-ওদিক করে রাখলাম। ভিডা তখন ঘরে ছিল না। ফিরল হোস্টেলের বাতি নেভানোর ঘণ্টা পড়ার কিছুক্ষণ পরে। আমার তখন ঘুমে দু'চোখ ভার, ওকে সাবধানে ঘরে ঢোকার কথা বলার সময়ও পাইনি।

মা, কী বলব, ভিডা এমনভাবে ঘরে ঢুকল যেন আঁধারেও সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা চেয়ার-টেবিলগুলোতে সামান্য ধাক্কাও লাগল না। দিব্যি হেঁটে এল ওগুলোর মাঝখান দিয়ে। আমার গা কেমন ছমছম করে উঠল। আমি বালিশের কাভারে মুখ লুকিয়ে ওকে লক্ষ করছিলাম। মনে হচ্ছিল অন্ধকারে ও আমাকে দেখছে। তুমি হয়তো এ জায়গাটা পড়ে হাসছ, কিন্তু আমার তখন হাসি পাচ্ছিল না। বরং এখনও ভাবতেই শিরশির করে উঠছে গা, ভিডা তো জানত না ঘরের আসবাব ওলোট পালোট করে রাখা হয়েছে, অন্ধকারে দেখতে পেয়েছে বলেই কোন কিছুর সাথে সে ধাক্কা খায়নি বা আছাড় খেয়ে পড়েনি।

কাল রাতে আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ময়লা ফেলার ঝুড়িতে বোধহয় রুটি-টুটি ফেলা হয়েছিল, ইঁদুর ঢুকেছিল ওতে, টের পেয়েছি। আলো জ্বালব, শুনতে পেলাম বিছানা থেকে নামছে ভিডা, এগোচ্ছে ঘরের কোণে। আলো জ্বেলে দেখি ময়লা ফেলার ঝুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতে একটা ইঁদুর। ইঁদুরটা মরা! ওকে এমন অস্বাভাবিক লাগছিল আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ভিডা'। লাফিয়ে উঠল সে, ফেলে দিল হাতের জিনিসটা, এক ছুটে বিছানায়। আলো জ্বালায় ও বোধ হয় বিরক্ত হয়েছিল। পরে, অন্ধকারে ওর কান্নার আওয়াজও শুনেছি, তবে আমি ঠিক নিশ্চিত নই।

মা, ব্যাপারটা তোমার কাছে ভুতুড়ে মনে হচ্ছে না? মিস অ্যানেট ঘটনাটি শুনলে কী বলবেন বুঝতে পারছি না। আমার বলতেও ইচ্ছে করছে না। কারণ এর মধ্যে নালিশ করার মত কিছু আছে কী?

...এস্তগার ভাইয়া কবে নেকলেস পাঠাবে?

প্রথমজনকে দ্বিতীয়জনের চিঠি

...একটি ঘটনা ঘটেছে যার সঙ্গে ভিডার সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে। তবে মিস অ্যানেটকে ঘটনাটি জানাতে চাই না আমি। আমার ধারণা শুনলে উনি হাসবেন, বলবেন কল্পনার জগতে বাস করছি আমি।

সেদিন কী যেন নিয়ে ভিডার সঙ্গে নাটালি কানিংহামের কথা কাটাকাটি হয়। ভিডার যুক্তিই সম্ভবত ঠিক ছিল বুঝতে পারার পরেও নাটালি তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে। ভিডা তার দিকে সেই অদ্ভুত, সোনালি জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়েছিল, ঠোঁট কামড়াচ্ছিল শুধু, বলেনি কিছু।

পরে আমাকে ভিডা বলল, 'তুমি জানো আলথিয়া, নাটালির কপালে খারাবী আছে?' এ কথা শুনে আমি অবাক। ভিডা তখন ফের বলতে লাগল, 'অদৃশ্য কোন অভিভাবক সব সময় আমার উপর নজর রাখে, আলথিয়া, কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে [illegible] পায়। আমি লক্ষ করেছি কেউ আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে উল্টো সেই বিপদে পড়ে যায়। তাই কারও সাথে ঝগড়া বিবাদ হলে ভয় লাগে আমার। কারণ আমি যদি নিজেকে সামলে আমার ভেতরের মানুষটা যদি ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠে, যে আমার পিছে লাগতে আসে, ঝামেলায় পড়ে যায়।'

আমি এর কথা বিশ্বাস করিনি। বলেছি ও আসলে বোকা আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ওর মন। কিন্তু মা, ওই রাতেই নাটালি কানিংহামের পোখরাজের সুন্দর আংটিটি হারিয়ে গেল। নাটালি ঘরের বাতি

নেভানোর পাঁচ মিনিট পরেই ড্রেসিং-টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় ওটা। নাটালি রুমমেটকে দরজা খুলে দিতে উঠেছিল। আলো জ্বালিয়ে দেখে আংটি নেই।

অথচ দরজা বন্ধ ছিল; জানালা খোলা থাকলেও ওটা তিন তলার জানালা, আমাদের বেশির ভাগ ডরমিটরির জানালার নীচে কোন ব্যালকনিও নেই।

রহস্যময়, তাই না? আমাদের ফ্লোর মনিটর মিস পুরির ধারণা নাটালির আংটি নিশ্চয় মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু নাটালি অনেক খুঁজেছে। পায়নি। ওর আংটি কে নিল? কীভাবে? নাটালি এমন ভয় পেয়েছে বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে পারে না।

আমার কাছে একটা ব্যাপার খুব আশ্চর্যের মনে হয়েছে–মেয়েরা যখন আংটি হারানোর গল্প করছে, ভিডা আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে ছিল, যেন আমাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে ওর সেই 'অদৃশ অভিভাবক'-ই আংটি চুরি করেছে নাটালিকে শাস্তি দিতে। নাটালি যে ভিডাকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছে! তোমার ব্যাপারটা বিশ্বাস হয়? ভিডাকে তোমার কল্পনাপ্রবণ মনে হয় না? আমার নেকলেসের কি হলো?

প্রথম জনকে দ্বিতীয়জনের চিঠি

...আমি এমন উত্তেজিত হয়ে আছি যে গুছিয়ে লিখতেও পারছি না। কাল রাতের ঘটনা নিয়ে গোটা স্কুলে হুলস্থূল কাণ্ড চলছে। অন্যদের চেয়ে ঘটনাটা আমাকে বেশি প্রভাবিত করছে কারণ ভিডা নিজের সম্পর্কে যা বলেছিল তা বোধহয় সত্যি। ওর সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তার কপালে খারাবী থাকে। আমি নার্ভাস বোধ করছি, ভয় লাগছে কোন কারণে ভিডা যদি আমার উপরে রেগে যায়। বুঝতে পারছি না মিস অ্যানেটকে সব কথা খুলে বলব কিনা; উনি হয়তো ব্যাপারটা আমার কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। তুমিই বলো এখন আমার কী করা

উচিত?

গতকাল সকালে ভিড়ার নিগ্রো দাইমা জিনি, একে পাইন ভ্যালিতে পাঠানো হয়েছে ভিডার দেখাশোনার জন্য, এসেছিল ওর জামাকাপড় নিতে। মিস পুরিও ওইসময় ঢুকেছে আমাদের ঘরে। ভিডা তখন ওর নোংরা জামাকাপড়গুলো বাছাই করছে, মিস পুরি ওকে সাহায্য করতে চাইল।

জিনিকে দেখলাম হঠাৎ কেঁপে উঠল। ভিডার দিকে এক মুহূর্ত তাকাল কটমট করে। ভিডাও তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার চোখে দপ্ করে জ্বলে উঠেছে হলুদ আগুন। মিস পুরিকে সে ক্রুদ্ধ গলায় নিজের কাজে যেতে বলল, অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে নিষেধ করল।

মিস পুরি তো রেগে আগুন। (এ জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ভিডা খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে।) মহিলা ভিডার কাঁধ খামচে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল। ভিডা কিছু বলল না বটে, তবে এমন ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফ্লোর মনিটরের দিকে, সভয়ে পিছিয়ে গেল সে দু'কদম।

'তোমার জন্যে আমার করুণা হচ্ছে, মিস পুরি,' বলল ভিডা তাকে।

'আমার গায়ে হাত তোলার পরিণাম তোমাকে ভোগ করতে হবে। সম্ভব হলে তোমাকে বাঁচাতাম—কিন্তু পারব না।'

মিস পুরি কিছু না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ভিডা জামা-কাপড়গুলো তুলে দিল জিনির হাতে। নিগ্রো মহিলা চলে যাবার পরে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিডা, ঘণ্টাখানেক কাঁদল অঝোরে। বলল মিস পুরির জন্য তার কষ্ট হচ্ছে। ওর কথার অর্থ তখন বুঝতে না পারলেও গত রাতে—

রাত দুটোর দিকে গোটা ফ্লোর জেগে গেল ভয়াবহ এক আর্তনাদে। চিৎকার করছে মিস পুরি। আমি লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম বিছানা থেকে, দৌড়ে গেলাম হলঘরে। ওখানে অনেক

মেয়েকে দেখলাম, ছুটে এসেছে যে যার ঘর থেকে। দৌড়ালাম মিস পুরির ঘরে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পরে দরজা খুলে দিল সে।

মা, সে যে কী ভয়াবহ দৃশ্য! মিস পুরির মুখ, হাত ফালাফালা হয়ে গেছে কামড় আর আঁচড়ে, ভেসে যাচ্ছে রক্তে। থরথর করে কাঁপছিল মহিলা। বলল কী একটা বুনো জানোয়ার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে, হামলা চালায় তার উপর। অবাক ব্যাপার হলো, জানোয়ারটা–যদি সত্যি ওটা জানোয়ার হয়ে থাকে–আমরা হলঘরের দরজা খোলার আগে কী করে তার ঘরে ঢুকল এবং বেরিয়ে গেল? মিস পুরির ঘরের জানালা খোলা ছিল, কিন্তু এটা তিনতলা দালান আর আশপাশে কোন গাছও নেই যে কোন প্রাণী গাছ বেয়ে উঠে তার ঘরে লাফিয়ে ঢুকবে।

মিস পুরির এমন দশা হয়েছে, আজ সকালে মিস অ্যানেট আমাদেরকে চ্যাপেলে ডেকে নিয়ে বলেছেন সে কয়েকদিন স্কুলে আসবে না, নার্ভাস শকটা কাটাতে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নেবে। আজ সবার আলোচনার বিষয় ছিল এই রহস্যময় ঘটনা, বুঝতেই পারছ। এখন ঘটনার অদ্ভুত অংশটা বলছি তোমাকে।

ঘরে ফিরে দেখি ভিডা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। এত হৈ হট্টগোলেও তার ঘুম ভাঙেনি। ঘুমাতেও পারে বটে মেয়েটা! আমি ওকে জাগিয়ে তুললাম। বললাম ঘটনা।

মা, বাকি রাতটা সে জেগে রইল আর ভয়ানক কান্নাকাটি করল। বলল সব নাকি তার দোষ, যদিও এতে তার কোন হাত ছিল না। ওর কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বলল ওর 'অদৃশ্য অভিভাবক' হামলা চালিয়েছে মিস পুরিকে, অনুরোধ করল আমি যেন কাউকে এ কথা না বলি। অবশ্য মিস অ্যানেটের কাছে এ কথা বললে হয় তিনি ভিডাকে পাগল ঠাওরাবেন অথবা আমাকে বোকা ভাববেন।

আমি ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। তবে ঘরের বাতি জ্বালানোই

থাকল। শুধু আমি নই; বাকি রাতটা মেয়েরা সবাই তাদের ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখল।

কাকতালীয় ঘটনাগুলো অদ্ভুত, না, মা? নাটালি ভিডার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার পরে রহস্যময়ভাবে তার আংটি গায়েব হয়ে গেছে। মিস পুরি ভিডাকে খেপিয়ে তোলার পরে শারীরিকভাবে হামলার শিকার হয়েছে। কিন্তু যতই কাকতালীয় হোক ঘটনা, এর কোন ব্যাখ্যা নেই যে কেন একটা বন বেড়াল ভিডার পক্ষ নিয়ে মিস পুরিকে কামড়ে দেবে! আছে কী? মিস অ্যানেটকে ঘটনাটা বলব কিনা সে ব্যাপারে তোমার পরামর্শ চাইছি। তাড়াতাড়ি লিখো।

দ্বিতীয়জনকে প্রথমজনের চিঠি

তোমার কথা মত ঘটনাটা বলেছি মিস অ্যানেটকে। উনি এ ব্যাপারে অন্য মেয়েদেরকে কিছু বলতে নিষেধ করেছেন। জানিয়েছেন ভিডাকে নিয়ে নাকি আরও কয়েকটি স্কুলে এরকম ঘটনা ঘটেছে। শেষে কোন স্কুলেই ভিডাকে ভর্তি করতে পারছিলেন না ওর বাবা। ভিডা ডি মনসেরো যার উপরেই অসন্তুষ্ট হয়েছে তার জীবনেই অশুভ ঘটনাটা ঘটেছে। যদিও ভিডা বলে সে কিছু করেনি কিন্তু তার কারণেই ঘটনাগুলো ঘটেছে বলে স্বীকারও যায় না।

মিস অ্যানেট জিজ্ঞেস করেছেন আমি একা থাকতে চাই কিনা। ভিডা আমার কোন ক্ষতি করেনি, তা ছাড়া ঘরটিকে এত সুন্দর ভাবে সাজিয়েছে ও! আমি ওর সঙ্গেই থাকব বলে দিয়েছি। মিস অ্যানেট খুশি হয়েছেন।...তুমি বলোনি কেন এডগার ভাইয়া আসছে? আমার সঙ্গে রিসেপশন রুমে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন শুনে নীচে গিয়ে দারুণ অবাক হয়েছি!

ভাইয়া চেইনটা আমাকে দিয়েছে। মা, খুবই সুন্দর আর দামী জিনিসটা। তুমি দেখেছ? ছোট ছোট অনেকগুলো বেড়াল খোদাই

করা চেইনে, মুখে লেজ গুঁজে রেখেছে, লকেটটা জেড পাথরের, বড় একটা বেড়ালের মূর্তি ওতে, চোখ জোড়া পোখরাজ পাথরের। মেয়েরা নেকলেস দেখে তো পাগল, বিশেষ করে ভিডা। আমাকে ধরে বসেছে এডগার ভাইয়াকে বলে যেন ওর জন্যও একটা আনিয়ে দিই।

এডগার ভাইয়া একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছে। চেইনটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছে আমাকে কসম খেতে হবে তার অনুমতি ছাড়া এটা আমি কখনোই খুলব না। এরকম কথা বলার কারণ কী? জিজ্ঞেস করলে শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়েছে ভাইয়া, বলেছে তোমাকে লেখা কয়েকটি চিঠি পড়েছে সে। আমার চিঠির সাথে বেড়াল-মার্কা চেইন গলা থেকে না খোলার কসম খাওয়ার সম্পর্ক কী?

কাল এসেছিল সে আমাকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাবার জন্য। রিসেপশন রুমে ঢুকেই সেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝট্ করে থুতনি উপরের দিকে তুলে বলল, 'এ ঘরে বেড়াল আছে। অথচ শুনেছি মিস অ্যানেট বেড়াল-টেড়াল পোষা পছন্দ করেন না।'

আমি জানি কোন বেড়াল নেই, কিন্তু সে একই কথা বলতে লাগল বারবার আর ঘরের চারদিকে চোখ বুলাতে থাকল। আর তারপর—সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল, মা! আমরা আমাদের ঘরে ঢুকলাম। ভিডা ডি মনসেরো তখন ফায়ারপ্লেসের ধারে বড় একটি আর্মচেয়ারে ঘুমাচ্ছে। হাঁটু মুড়ে রেখেছিল সে, হাত জোড়া চেয়ারের দুই হাতলের উপরে ঝুলছে, থুতনি বাহুর উপরে ভর দেওয়া। যেন একটা বেড়াল ঘুমাচ্ছে আরামের ঘুম।

আমি এডগার ভাইয়াকে বললাম, 'এই যে তোমার বেড়াল।' তারপর হেসে উঠলাম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল সে ভিডাকে। তারপর মৃদু গলায় আমাকে বলল, 'আলথিয়া, তুমি একটু বেশি কথা বলো। (তুমি তো জানো, মা, ভাইয়া সুযোগ পেলেই আমাকে ফোড়ন কাটে।)

পুসির সাথে আলাপ করিয়ে দাও।

আমি ঘুম থেকে জাগালাম ভিডাকে। বেড়ালের মত গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে দেখে লজ্জাই পেল ভিডা। পরে আমাকে বলেছে এডগার ভাইয়াকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। এমন সুদর্শন পুরুষ নাকি সে কোনদিন দেখেনি। ভাইয়াও মনে হয় ভিডাকে পছন্দ করে ফেলেছে। যদিও এ নিয়ে কোন কথা বলেনি।

ভিড়া ভাইয়ার কাছে জানতে চেয়েছে আমার মত চেইন ভাইয়া তাকে জোগাড় করে দিতে পারবে কিনা। চেইনটা তার খুবই পছন্দ হয়েছে।

'আলথিয়াকে পটিয়ে চেইনটা নিতে পারো কিনা দেখো। পারলে ওর জন্য আরেকটা চেইন এনে দেব।' ভিডা তখন এমন মিনতিভরা চোখে আমার দিকে তাকাল, আমার কেমন অস্বস্তি লাগল। নাটালি আর মিস পুরির কথা মনে পড়ে গেল। ভিডাকে চেইন না দিলে আমার জীবনেও কোন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে কিনা কে জানে।

আমি সরাসরিই জানতে চাইলাম, 'তোমাকে চেইন না দিলে আমার কী হবে, ভিডা?'

'কিছুই হবে না, আলথিয়া, ডার্লিং। কারণ তোমার উপরে আমি কখনোই রাগ করতে পারব না।' ফিসফিস করে জবাব দিল সে।

'তা হলে আর চেইনটা চেয়ো না দয়া করে,' অনুরোধ করলাম আমি। আমি এডগার ভাইয়াকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুবার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। ভিডা করুণ চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। বেচারী ভিডা!

...বুঝতে পারছি না আকর্ষণটা কিসের? এডগার ভাইয়া বলল এদিকে বেশ কিছুদিন থাকবে সে। আশা করি আলমা হেনিং-এর প্রেমে পড়েনি সেঃ মেয়েটাকে একদম সহ্য করতে পারি না আমি। তবে কোন মেয়ের প্রেমে পড়লেও সে নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞেস করে প্রেম করবে না। বেল ব্রাগ ভাইয়ার প্রেমে পাগল আর

নাটালির চোখে ভাইয়া অত্যন্ত রোমান্টিক পুরুষ।

ভাইয়া বুড়ো পিটারকে নিয়ে পাইন ভ্যালির ছোট হোটেলটিতে উঠেছে।

প্রথম জনকে দ্বিতীয় জনের চিঠি

...তোমাকে আগে এ ঘটনাগুলো লেখার সাহস করিনি কারণ–কারণ এমনই অবিশ্বাস্য সব ঘটনা! তুমি হয়তো ভাববে খুব বেশি পড়ার চাপে আমার মাথার গিটঠু পাকিয়ে গেছে। কিন্তু এডগার ভাইয়া তা মনে করে না, এবং মাথাটা আমার কাঁধের উপরে ঠিক জায়গাতেই আছে। আর আমি যা ভেবেছি তা পুঙ্খানুপুঙ্খনভাবে তোমাকে লিখছি।

মা, ভিডা ডি মনসেরোর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে। তোমাকে আমি বলেছি মাঝে মাঝে ওকে কেমন বেড়ালের মত লাগে, সে অন্ধকারে বসে থাকতে ভালবাসে, আঁধারে ঘরে হাঁটতে ফিরতেও তার অসুবিধে হয় না।

সেদিন বাতি নিভে যাবার দশ মিনিট আগে আমি ঘরে ফিরেছি। আলো জ্বালার সময় ঘরে কাউকে দেখিনি। কিন্তু আমার ডেস্কে গিয়ে দেখি একটা বড়সড় কচ্ছপ-খোলা বেড়াল জানালার ধারে, ভিডার আর্মচেয়ারে বসে অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙছে।

বিদ্যুৎ চমকের মত মিস পুরির কথা মনে পড়ে গেল, আমি সভয়ে এগোলাম দরজার দিকে। হলঘরে পা দিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়েছি, আর–মা, বিশ্বাস করো বা না-ই করো–বেড়ালের কোন চিহ্নও দেখতে পাইনি। আর্মচেয়ারে বসে, হলুদ চোখ মেলে, অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ভিডা ডি মনসেরো।

দরজার কাছে একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়লাম, জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলাম। তারপর বললাম, 'মাই গড, ভিডা,

তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ। দেখতেই পাইনি কখন ঘরে ঢুকলে। বেড়ালটা কই?'

'বেড়াল?' হাই তুলল ভিডা। 'কীসের বেড়াল?' হাত উপরের দিকে তুলে অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল সে, তারপর নড়েচড়ে আরাম করে বসল কুশনে।

আমার খুব অবাক লাগছিল। তবে কি চোখে ভুল দেখলাম? ভিডা যেখানে বসে আছে ওখানটাতেই একটু আগে কালো-হলদে ছোপঅলা একটা বেড়াল বসে ছিল। বেড়াল নিয়ে আর কিছু বললাম না ভিডাকে আমাকে ঠাট্টা করবে ভেবে। কিন্তু যতবার বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছি, ততই মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে অবশ্যই ওখানে একটা বেড়াল ছিল।

তবে আর্মচেয়ারে বসে বেড়ালটা যখন আড়মোড়া ভাঙছে, ওই সময় ভিডা কোথায় ছিল? তা ছাড়া জানোয়ারটা ঘরে ঢুকলই বা কী করে? সে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে আমি ঘরের চারপাশে ভাল করে চোখ বুলিয়েছি, যদিও ভিডাকে কারণটা বলিনি। ভান করেছি জিমনাশিয়ামে যাবার চপ্পল জোড়া খুঁজে পাচ্ছি না। যদিও চপ্পল সবসময় আমার লকারে থাকে। বিছানার নীচে এবং চারদিকে চোখ বুলানোর সময় মনে হয়েছে ভিডা হলুদ চোখ মেলে আমাকে লক্ষ করছে।

ঘটনাটা এডগার ভাইয়াকে বললাম। সে আবারও সাবধান করে দিল গলার চেইনটা যেন কখনোই না খুলি। এটা নাকি এক ধরনের তাবিজ, মন্দ শক্তিকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

তো, মা, এখন আবার আমাকে কম পড়াশোনা করতে বোলো না যেন। এডগার ভাইয়া কিন্তু আমাকে পাগল ভাবে না কিংবা বিকারগ্রস্ত মনে করে না। তুমিও মনে কোরো না!

প্রথম জনকে দ্বিতীয় জনের চিঠি

আজ সকালে এডগার ভাইয়া ফোনে জিজ্ঞেস করল গত রাতে

কোন মেয়ের কোন কিছু হারিয়েছে কিনা। হারিয়েছে। গ্রেস ড্রিন তার লকেটসহ চেইনটি পাচ্ছে না। ভাইয়া জানতে চাইল লকেটে ঝুটো হিরে দিয়ে তার নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা ছিল কিনা! এ কথা সে জানল কী করে? বলছি।

গত রাতে ঘুম আসছিল না বলে হাঁটাহাঁটি করতে বেরিয়েছিল এডগার ভাইয়া। আমার ডরমেটরির পাশটা চাঁদের আলোয় তখন আলোকিত। ভাইয়া দেখল একটা বিরাট কচ্ছপ-খোলা বেড়াল বেরিয়ে এসেছে আমার ঘর থেকে। দালানটাতে খুবই সরু কার্নিশ আছে, জানালার নীচে, ইঞ্চি তিনেক হবে চওড়ায়। বেড়ালটা কার্নিশ ধরে হেঁটে এগোল, থামল গ্রেসের ঘরের জানালার নীচে, তারপর লাফ মেরে ঢুকে গেল ভিতরে। একটু পরে বেরিয়ে এল সে মুখে চকচকে কী একটা জিনিস নিয়ে!

এডগার ভাইয়া হিসহিস করে উঠল, 'ভাগ!' এক মুহূর্ত দ্বিধায় যেন ভুগল বেড়ালটা, চমকে উঠল, মুখ থেকে জিনিসটা পড়ে গেল মাটিতে। ভাইয়া দেখল বেড়ালটা আমার ঘরের জানালার নীচে ফিরে গেছে, সে মাটি থেকে তুলে নিল জিনিসটা। ওটাই ছিল গ্রেসের লকেটসহ চেইন। বেড়ালটা গ্রেসের ঘর থেকে ওটা চুরি করেছে! এমন অবাক ঘটনা কখনও শুনেছ, মা? আমি বানরের কথা শুনেছি তারা লোকের জিনিস চুরি করে–কিন্তু বেড়াল!

এডগার ভাইয়া চেইনটা চিঠির খামে ভরে পাঠিয়ে দিয়েছে গ্রেসকে। খামের মধ্যে চুরি যাওয়া জিনিস ফিরে পেয়ে মেয়েরা যে কী অবাক!

তুমি এ ঘটনা থেকে কিছু আঁচ করতে পারলে? বেড়ালটা আমার ঘর থেকে বেরিয়েছে, আবার আমার ঘরেই ফিরে এসেছে! এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে সত্যি কোন তাল খুঁজে পাচ্ছি না।

ক্যাপ্টেন এডগার বেনেডিক্টের নোট বই থেকে

এই আশ্চর্য ব্যাপারটি নিয়ে আলথিয়ার কাছ থেকে নানা

অদ্ভুত তথ্য সংগ্রহ করার পরে আমি একটাই ক্লু খুঁজে পাই; এর পেছনে নিশ্চয়ই ভিডার নিগ্রো দাই মা জিনির হাত আছে। প্রতি মঙ্গলবার ভিডার কাছে যায় সে, তাই এক মঙ্গলবার সকালে অ্যাকাডেমির কাছে একটা জায়গায় লুকিয়ে থেকে দেখলাম বুড়ি তার কিশোরী মনিবনীর জামাকাপড় ধোলাই করার জন্য বেশ তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। চেহারাটাও বেশ হাসি খুশি।

মহিলা বেশ লম্বা, দেখতে মন্দ নয়, সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার চোখ। ঝকমকে চোখ জোড়া যেন চুম্বকের মত, দারুণ সম্মোহক। মুখে অসংখ্য ভাঁজ, তবে সেটা বয়সের কারণে নয়। খুব বেশি চিন্তা করে বলেও চেহারায় বুড়োটে ছাপ পড়তে পারে। হাই স্কুলের লোকজনের সামনে সে বিনয়ের অবতার, তবে লক্ষ করেছি স্কুল প্রাঙ্গণের বাইরে আসার পরেই মুখোশ খুলে গেছে তার, বিরাট দেহ নিয়ে, মাথা সোজা করে লম্বা লম্বা কদমে হন হন করে হাঁটতে লেগেছে।

ভিডার জন্য পরিষ্কার জামাকাপড় নিয়ে এসেছিল মহিলা, আধ ঘণ্টা পরে বেরিয়ে এল ময়লা কাপড়ের ঝুড়ি হাতে। স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে আসার পরেই তার পায়ে যেন পাখা গজাল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে গেলাম আমি। মহিলা পাইন ভ্যালিতে এসে নিগ্রো কোয়ার্টার্সের দিকে এগোল, ঢুকল একটা বাড়িতে।

আমিও হাজির হলাম বাড়িটির সামনে। দরজায় কড়া নেড়ে বললাম জামা-কাপড় ধোলাইতে দিতে চাই। মহিলা কাজটা করবে কিনা। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর নীরস গলায়, অত্যন্ত সংক্ষেপে বলল সে মাত্র একজনের জামা কাপড়ই ধোলাই করে। তারপর আমার মুখের উপরে বন্ধ করে দিল দরজা। এই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার মধ্যে ভয়ঙ্কর, অশুভ কী যেন একটা আছে। এর ঘৃণার পাত্র কখনোই হতে চাইব না আমি।

…দাইমা জিনির কুটির থেকে নৈশ-অভিযান শেষ করে মাত্র ফিরেছি। তার জানালার চৌকাঠ বা শার্সি ইঞ্চিখানেক ফাঁক ছিল। ওই ফাঁক দিয়ে বুড়ি ডাইনির কাণ্ড কারখানা সবই দেখতে পেয়েছি। কোন সন্দেহ নেই স্কুলের রহস্যময় ঘটনার সাথে সে জড়িত।

ডাইনিদের জাদুমন্ত্র পড়ার দৃশ্য এর আগেও দেখেছি তবে এরকম দৃশ্য দেখিনি।

বুড়ি নিগ্রো ব্যাগ থেকে একটা জামা বের করল, সেই সাথে মাটিতে খসে পড়ল একটা এমারেল্ড রিং! আংটিটি নিশ্চয় নাটালি কানিংহামের। ভিডার ময়লা কাপড়ের মধ্যে ওটা গেল কী করে যদি সে নিজে আংটিটি লুকিয়ে না রাখে? ভিডা কি শয়তানী নাকি কারও হাতের নিষ্পাপ খেলার পুতুল? জিনি এবার বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটি মোজা, ওটা ধরে ঝাঁকি দিতেই গড়িয়ে পড়ল অনেকগুলো আংটি, ব্রুচ, ব্রেসলেট, চেইন। আমি জুয়েলারির দোকান ছাড়া এত গহনা এক সাথে অন্য কোথাও দেখিনি। গহনাগুলোর মধ্যে আংটিটি রাখল সে এবং ওটার দিকে তাকিয়ে রইল স্থির চোখে। কিছুক্ষণ বাদে ওটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল। তারপর বিবর্ণ কুটিরের নোংরা মেঝেতে পায়চারি শুরু করল।

পায়চারি করার সময় বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল সে। মাঝে মাঝে হাত মোচড়াল। তার দু'একটা কথা শুনতে পেলাম আমি।

'আমার সোনা ভিডা—আমার ছোট্ট মিসি! আমাকে ক্ষমা করো, মিসি। তোমার বাবার অপরাধের দায় তোমাকে বইতেই হবে। আমি তাকে মাফ করব না!'

হঠাৎ উনানের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, প্রকাণ্ড একটা বেড়ালের মত লাগল তাকে, জ্বলন্ত কাঠ-কয়লার দিকে তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে। টানা দুটো ঘণ্টা ওভাবেই থাকল মহিলা,

আমার মন চাইছিল ওখান থেকে কেটে পড়ি। তার সত্তার মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটার ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম আমি। বুঝতে পারছিলাম মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মানসিক শক্তি সৃষ্টি করছে সে, যেন সত্যিকারের একটা ডাইনি। খুবই অস্বস্তিকর একটা অবস্থার মধ্যে ছিলাম আমি, তবু নড়াচড়ার সাহস পাচ্ছিলাম না।

ওই বুড়ি, কচ্ছপ-খোলা বেড়াল আর ভিডার মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে বলে যে সন্দেহ আমার ছিল তা ক্রমে ঘনীভূত হচ্ছে। আলথিয়াকে আমার সন্দেহের কথা বলতে হবে। ওর সাহায্য দরকার।

...আমার পরিকল্পনায় চমৎকার কাজ হয়েছে। ভিডা বেড়াল-চেইন পেয়ে খুবই খুশি, বলল সে এটা কখনও গলা থেকে খুলবে না। আমি কাল রাতে নিগ্রো বুড়ির উপরে নজর রেখেছি আর আলথিয়া-আমার অনুরোধে লক্ষ রেখেছে ভিডাকে। বুড়ি জাদুমন্ত্র পড়ে যেমে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। ভিডা ওই সময়টাতে শান্তিতে ঘুমাচ্ছিল।

...আমি ঠিক সন্দেহই করেছি। আলথিয়া বলল জিনি বুড়ি আাকাডেমিতে এসে ভিডাকে হুকুম করে বলল বেড়াল-চেইন খুলে ফেলতে। রাজি হয়নি ভিডা। জিনি বলেছে চেইনটাতে নাকি 'খারাপ জাদু' আছে। কিন্তু বুড়ির কথায় কান দেয়নি ভিডা। বুড়ি এমন রেগে গেছে দুপদাপ পা ফেলে চলে যাবার সময় মাথা নুইয়ে 'বো' পর্যন্ত করেনি ভিডাকে। ভিডা তার চাকরানির এহেন আচরণে স্বভাবতই বিস্মিত।

...আলথিয়া সতর্কতার সাথে আমার নির্দেশ মেনে চলছে। সে ভিডার চোখ এড়িয়ে চেইনের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছে। ভিডা আমাকে চেইনটা মেরামত করে দিতে বলেছে। আলথিয়াই ওকে নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। আজ রাতে চেইনের নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকবে না ভিডাকে ঘিরে। আমি আলথিয়াকে বলে দিয়েছি আগের মতই ভিডার উপর নজর রাখতে। আর আমি ডাইনি

বুড়িকে চোখে চোখে রাখব। বুড়িটা যে সত্যি ডাইনি এ ব্যাপারে আমার আর সন্দেহ নেই।

...কাল সারারাত মন্ত্র নিয়ে মেতে থেকেছে জিনি। এবারে সফল হয়েছে সে। আলথিয়া আমাকে বলেছে কী ঘটেছে।

'আলথিয়া দেখেছে বেড়ালটা ভিডার বিছানা থেকে জানালা গলে বেরিয়ে গেছে, ফিরে এসেছে মুখে একটা ব্রেসলেট নিয়ে। ভিডার লন্ড্রি-ব্যাগের মধ্যে ওটা ফেলে দিয়েছে। তারপর বেড়ালটা লাফিয়ে ওঠে ভিডার বিছানায়, আর–আলথিয়া দেখতে পায় ওখানে ঘুমিয়ে আছে ভিডা। বাকি রাত যে আর দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি মেয়েটা, বলাবাহুল্য।

এক মেয়ে বলল তার ব্রেসলেট হারিয়েছে। আলথিয়া ওটা আগেই ব্যাগ থেকে তুলে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। জানাল ব্রেসলেটটি সে হলঘরে পেয়েছে।

এসবের একটা সমাপ্তি ঘটানো দরকার। এ অবশ্যই জাদু। বুড়ি নিগ্রোর যা-ই উদ্দেশ্য থাকুক, সে নিষ্পাপ মেয়েগুলোকে এভাবে ঝামেলায় ফেলতে পারে না। আমি এ ঘটনার সমাপ্তি না টানতে পারলে ভিডাকে আসল ঘটনা বলে দেব। ওর কাকে এড়িয়ে চলতে হবে জানাব। ভয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য কবজ পরিয়ে দেব হাতে।

কাল রাতে দারুণ রোমাঞ্চকর একটা ঘটনা ঘটেছে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আমি বুড়ো পিটারকে জিনির কুটিরে পাঠিয়েছিলাম গোয়েন্দাগিরি করার জন্য। বুড়ি কী করছে তার পূর্ণ বৃত্তান্ত চাই। আমি, মিস অ্যানেটের সাহায্যে একটি শক্ত দড়ির মই ঝুলিয়ে দিই আলথিয়ার জানালায়। ওই সময় দুই রুমমেটই ব্যস্ত ছিল ব্যায়ামাগারে। মই যাতে কারও চোখে না পড়ে সে জন্য উপরের অংশটা ঢেকে দিই বালিশ দিয়ে।

রাত দেড়টার দিকে প্রকাণ্ড একটা বেড়াল বেরিয়ে এল আলথিয়ার জানালা দিয়ে, সরু কার্নিশ বেয়ে হাঁটতে লাগল। (ওটা

যদি পা ফস্কে পড়ে যায়? ভয়ে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। ভাবতে এখনও কেমন কাঁটা দিয়ে উঠছে গা)। আরেকটা খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল জানোয়ার। আমি চট করে চলে এলাম জানালার নীচে, আলথিয়াকে ডেকে বললাম বেড়ালটা পাঁচ নম্বর জানালায় গেছে। আলথিয়া তক্ষুণি ওর ঘরের জানালা বন্ধ করে দিল, চলল বেল ব্রাগের ঘরে। ওই ঘরেই ঢুকেছে বেড়াল।

দুটি মেয়েই বেড়ালটাকে দেখল জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে। বেল তার ড্রেসিং টেবিলে তাকিয়ে দেখে হাতঘড়িটি অদৃশ্য, আলথিয়া বলল কোন মেয়ে হয়তো ঘড়িটি নিয়ে গেছে, কাল সকালে ফেরত পাওয়া যাবে। বেল তার জানালা বন্ধ করল আর আলথিয়া ফিরে এল নিজের ঘরে। এদিকে আমি মই বেয়ে নিঃশব্দে উঠে এসেছি আলথিয়ার জানালার নীচে। ওখানে, জানালার কার্নিশ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বেড়াল এসে দেখল জানালা বন্ধ। সে সামনের থাবা দিয়ে খামোকাই বন্ধ শার্সি খামচাল। খুলল না জানালা। আমি মেরামত করা বেড়াল চেইনটা ছুঁড়ে দিলাম বেড়ালটার গলা লক্ষ্য করে। কী ঘটবে মোটামুটি একটা ধারণা থাকলেও চোখের পলকে বেড়ালটাকে ভিডা ডি মনেসেরোতে রূপান্তরিত হতে দেখে ভয়ানক চমকে উঠেছিলাম আমি। অচেতন ভিডাকে চট করে ধরে ফেললাম হাত বাড়িয়ে।

জানালা খুলল আলথিয়া। দু'জনে মিলে অজ্ঞান শরীরটাকে টেনে তুললাম, শুইয়ে দিলাম বিছানায়। আলথিয়াকে কোন কথা বলতে নিষেধ করে বুড়ো পিটারের কাছে ছুটলাম খবরের আশায়।

কুটিরের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে বলেছিলাম পিটারকে। বুড়োকে নির্ধারিত জায়গায় দেখতে না পেয়ে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। জানালার খড়খড়ি দিয়ে তাকালাম ভিতরে। দেখলাম বুড়ো পিটার উনুনের সামনে, মেঝেতে উবু হয়ে বসেছে,

হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে বুড়ি ডাইনিকে, মাথা তার কাঁধের উপরে!

শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। প্রচণ্ড জোরে দরজার কড়া নাড়লাম। দরজা খুলে দিল পিটার। বুড়ো হারামজাদা আমাকে দেখে কোথায় লজ্জা পাবে আর সিঁটিয়ে যাবে ভয়ে, তা না, বরং ধবধবে সাদা দাঁত বের করে আকর্ণ হাসল। অবাক হয়ে দেখি বুড়ি জিনিও সিধে হয়েছে শিরদাঁড়া টানটান করে, পিটারের মত তারও মুখে চওড়া হাসি।

আমি রীতিমত হতভম্ব। তবু এরকম আচরণের ব্যাখ্যা চাইলাম। ওরা কতটুকু সত্যি বলেছে তা বোঝা মুশকিল তবে কাহিনী বেশ দীর্ঘ এবং এর সূত্রপাত বুড়ি নিগ্রোর যৌবনকালে।

বুড়ি এবং পিটার দু'জনেই ভিডার দাদার ক্রীতদাস ছিল। একটি মূল্যবান আংটি হারিয়ে গেলে বৃদ্ধ পিটারের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনেন এবং তাকে দূরের এক রাজ্যে বিক্রি করে দেন যেখান থেকে স্ত্রীর সঙ্গে আবার মিলিত হবার কোন আশাই ছিল না বেচারার। জিনি আসল ঘটনা জানত। কিন্তু বলে কী লাভ? উল্টো তাকে বেত খেতে হত। সে জানত আংটিটি তার তরুণ প্রভু এক শ্বেতাঙ্গিনীকে দিয়েছেন, যার সঙ্গে তিনি গোপনে প্রেম করেন।

জিনি তরুণ প্রভুর কাছে দয়া ভিক্ষা করে। কিন্তু তিনি দয়া দেখাননি। সে তখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। তবে মনের ঘৃণা বুকে চেপে রেখে সে ভিডার দায়িত্ব নিতে চায়। ভিডার মা সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় মারা গিয়েছিলেন।

ওই সময় থেকে জিনি তার পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে থাকে। ভুডু বা অপবিদ্যা জানত সে। এবং এটাই সে কাজে লাগায়। ভিডার ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু ছিল না। তাকে সম্পূর্ণ চালাত জিনি। তবে এই আশ্চর্য ঘটনা কীভাবে ঘটাত সে সম্পর্কে মুখ খোলেনি জিনি। সে ভিডাকে দিয়ে চুরি করাত। ভাবত এতে

'তরুণ প্রভু'র গায়ে বেশ ভাল কাদা ছিটানো যাচ্ছে। কালো জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিককে কাজে লাগিয়ে এ কাণ্ড সে কতদিন চালিয়ে যেত কে জানে। হয়তো এভাবে ভিডার ধ্বংস ডেকে আনত সে।

বুড়ো পিটারকে বহুদিন আগে আমি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করি। তারপর সে বিশ্বস্ততার সাথে আমার সেবা করে আসছিল। পিটারকে নিয়ে জ্যামাইকাতেও গিয়েছিলাম আমি। ওখান থেকে কিনে নেওয়া হয়েছিল পিটার আর জিনিকে। তবে ওখানে জিনির দেখা মেলেনি। জিনির সাথে তার সাক্ষাৎ হয় সম্ভবত এখানে এসে। তবে ওরা এখন থেকে ভিডার কাছে আর ঘেঁষতে পারবে না।

তবে এর মানে এই নয় যে ভিডা নিরাপত্তাহীন থাকবে। আমি ওর বাবার কাছে থেকে অনুমতি নিয়েছি। এখন থেকে ভিডার সকল নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। তবে আমার বিশ্বাস হয় না জিনি আর কোনদিন তার শয়তানী শক্তি ব্যবহার করে মানুষ ডিভাকে বেড়াল মানবীতে রূপান্তর ঘটাতে পারবে।

মূলঃ গ্রে লা স্পিনা'র 'দ্য টরটয়েজ-শেল ক্যাট'
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু